নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
দেবতার মানবায়ন

দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতা করে তোলার প্রয়াস বৈষ্ণব কবিদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁরাই অগ্রপথিক কিনা তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর এই গ্রন্থে অতি মনোগ্রাহী এক আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই প্রবণতার পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ এক পরম্পরা। বেদ-পুরাণ এবং কবি-মহাকবিদের নানান কাব্যকীর্তির মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে দেবতার মানবায়নের এই পরম্পরা।
শুধু দেবতারাই বা কেন, অসুর, রাক্ষস, মহাপুরুষ—সকলেই অন্তর্ভুক্ত এই পরম্পরায়। মানুষের নানা অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে আমরা যে ব্যবহার করি 'গোবর-গণেশ', 'হাঁদা গঙ্গারাম', 'কলির কেষ্ট' বা 'ন্যাকা চৈতন্য' জাতীয় বিবিধ বিশেষণ, উৎস খুঁজলে দেখা যাবে যে, এ-সবও সেই পরম্পরারই এক অঙ্গ।
সংস্কৃত শাস্ত্র, সাহিত্য ও লৌকিক প্রবাদের মধ্যে এই পরম্পরা কীভাবে গড়ে উঠেছে এবং কীভাবে ঘটেছে তার বিস্তার—তাই নিয়েই এই সুদীর্ঘ ও সারবান আলোচনা গ্রন্থ। দার্শনিক দিক থেকেও লেখকের প্রতিপাদ্যের এক পরম প্রতিষ্ঠা এখানে।
কীভাবে প্রিয় দেবতাকে সখা ও পিতার মতো পেয়েছি আমরা, নিয়ন্তার দূরত্ব ঘুচিয়ে প্রিয়ত্বের সীমারেখার বিস্তৃততর গণ্ডিতে কীভাবে ধরা পড়েছেন দেবতারা—বিশেষত বৈদিকোত্তর যুগের দেবতারা, কীভাবে তাদের দেবত্বকে ঘুলিয়ে দিয়েছি আমরা, তিরস্কৃত করেছি বিপরীত কার্য-কলাপের জন্য, চরম রঙ্গ-রসিকতার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছি তাদের স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলিকে, আবার কীভাবে স্থাপন করেছি যথাযোগ্য পূজ্য আসনে—সমূহ সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য মন্থন করে, লোকায়ত প্রবাদের ভাণ্ডার হাতড়ে তারই চমকপ্রদ বিবরণ এই বইতে শুনিয়েছেন নৃসিংহপ্রসাদ। তাঁর বলার ভঙ্গিটি আদ্যন্ত অন্তরঙ্গ, শাস্ত্র ও সাহিত্যের গল্প ও ব্যাখ্যা শোনান অতি সরস ও স্বাদু ভাষায়, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদ্যের ক্ষেত্রে কোনও লঘুতাকে প্রশ্রয় দেননি নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী।

ISBN 81-7215-156-X
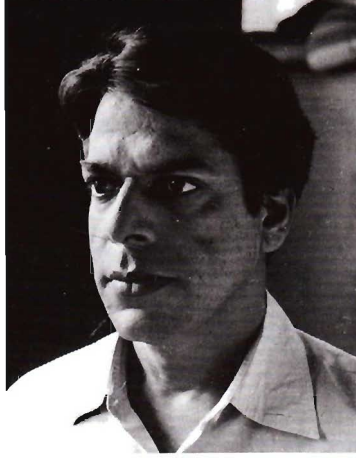
জন্ম : ২৩ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ। অধুনা বাংলাদেশের পাবনায়।
কৈশোর থেকে কলকাতায়। মেধাবী ছাত্র, সারা জীবনই স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা। অনার্স পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে পেয়েছেন গঙ্গামণি পদক এবং জাতীয় মেধাবৃত্তি।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে এম-এ। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের কাছে একান্তে পাঠ নেওয়ার সুযোগ পান।
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৮১ থেকে কলকাতার গুরুদাস কলেজে।
১৯৮৭ সালে প্রখ্যাত অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পান।
বিষয়— কৃষ্ণ-সংক্রান্ত নাটক।
দেশী-বিদেশী নানা পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত। আনন্দবাজার, দেশ ও বর্তমান পত্রিকার নিয়মিত লেখক।
প্রিয় বিষয়— বৈষ্ণবদর্শন এবং সাহিত্য। বৌদ্ধদর্শন এবং সাহিত্যও মুগ্ধ করে বিশেষভাবে।
বাল্যকাল কেটেছে ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডিতে, পরবর্তী জীবনে সংস্কৃত সাহিত্যই উন্মোচিত করেছে মুক্তচিন্তার পথ।

প্রচ্ছদ □ কৃষ্ণেন্দু চাকী

দেবতার মানবায়ন

শাস্ত্রে সাহিত্যে এবং কৌতুকে

দেবতার মানবায়ন

শাস্ত্রে সাহিত্যে এবং কৌতুকে

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫
সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৪

ISBN 81-7215-156-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

DEBATAR MANABAYAN
[Essay]
by
Nrisinghaprasad Bhaduri

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক এবং বন্ধু
শ্রীযুক্ত প্রবালকুমার সেনকে
শ্রদ্ধাসহ

এই লেখকের অন্যান্য বই

কৃষ্ণা কুন্তী ও কৌন্তেয়
বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ
মহাভারতের অষ্টাদশী
মহাভারতের ছয় প্রবীণ
মহাভারতের প্রতিনায়ক
মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ
শুকসপ্ততি

প্রবন্ধ-সূত্র

দেবতাদের নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই। বলাটা আমার দায়িত্ব মানা-না-মানা আপনাদের ইচ্ছে। তবে কথাটা শুধু দেবতাদের নিয়েই নয়, অসুর-রাক্ষস, মানুষ—সবই আছে এই স্বল্প পরিসরে। অবশ্য দেবতাদের কথা বলছি বলেই ভাববেন না যে, পরম ঈশ্বর, পরম ব্রহ্ম—এঁদের নিয়েও আমি কথা বলছি। বস্তুত ঈশ্বর কিংবা ব্রহ্মের সঙ্গে দেবতাদের বিলক্ষণ তফাত আছে। আর সেই তফাত আছে বলেই, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা বা রামচন্দ্রকে নিয়ে কিন্তু আমি কথা বলছি না। তবে একেবারেই যে এঁদের নাম উচ্চারণ করব না, তা মোটেই নয়। কিন্তু সেই উচ্চারণের মধ্যে যেহেতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবানের মাহাত্ম্য আছে, অতএব দেবতাদের থেকে তাঁরা একেবারেই আলাদা।

আসলে আমি এক সময়ে দেবতাদের নিয়ে কত রকম রঙ্গ-কৌতুক মানুষের মধ্যে চলে, তাই নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তখন কেউ আমাকে গালাগাল দিয়েছেন, কেউ বা ভালও বেসেছেন। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম—আমরা যে আজও গোবর-গণেশ, হাঁদা গঙ্গারাম, কলির কেষ্ট বা ন্যাকা চৈতন্য বলি—তার একটা পরম্পরা আছে। এই পরম্পরা বেদ-পুরাণ এবং কবি-মহাকবিদের নানান কাব্যকীর্তি থেকেই জন্ম নিয়েছে—এই ছিল আমার প্রতিপাদ্য এবং বিশ্বাস। কিন্তু এক পক্ষ থেকে গালাগালি যখন খেলাম, তখন আমার দায় আসল—কথাটা দার্শনিক দিক থেকে বুঝিয়ে বলার।

মনে হল—দেবতা, মানুষ এবং রাক্ষসদের সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বললে সাধারণ জনে হয়তো উপলব্ধি করবেন যে, আমি খুব অন্যায় বলিনি। অর্থাৎ দেবতাদের সঙ্গে রসিকতাটা যেমন মানুষের সাজাত্যে এসেছে, তেমনি পরম ঈশ্বর—কৃষ্ণ, রাম বা শিব সম্বন্ধে রসিকতাটা এসেছে দেবতার সাজাত্যে। আদতে দেবতা, মানুষ বা রাক্ষসে খুব বেশি তফাত না থাকলেও পরম ঈশ্বরের সঙ্গে কিন্তু মানুষের যত পার্থক্য, দেবতাদের সঙ্গেও তেমনই—ওঁদের কথা বলতে হলে বলতে হবে—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং/তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। কিন্তু শুধু দেবতার কথা বলতে হলে, কিছু মনে করবেন না, বলতেই হবে, আঁধার-আলোয়, ভাল-মন্দে তাঁরা আমাদের মতোই—হয়তো মানুষই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কটা লাইন এখানে উদ্ধার করতে চাই। সারা জীবন ব্রাহ্ম-ধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও কবি একখানি ব্যক্তিগত চিঠিতে আন্তরিকভাবে লিখেছেন—

> সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশত অন্ধভাবে আমি কোন কথা বলচি নে। যখন থেকে আমি আমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে আমার অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা

তা বর্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি। ....আমাদের দেশে দেবতা কেবলমাত্র মূর্তি নন, অর্থাৎ কেবল যে আমরা আমাদের ধ্যানকে বাইরে আকৃতি দিয়েছি তা নয়—তাঁরা জন্ম মৃত্যু বিবাহ সন্তান সন্ততি ক্রোধ-দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁদের সম্যক ধারণা এবং উপলব্ধি আছে, তাঁরাই বুঝবেন যে, আমাদের দেবতারা শুধু 'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্তী' জ্যোতিটুকুই নন, তাঁদের জন্ম-কর্ম, বিবাহ, রাগ-অনুরাগ, ক্রোধ-দ্বেষ, ঝগড়াঝাটি, এমনকি গালাগালিও মানুষের সম্বন্ধরূপ ইতিহাসের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা।

ভারী আশ্চর্য লাগে শঙ্করাচার্যের মত নিরাকারবাদী অদ্বৈতবেদান্তীকেও দেবতার শরীর এবং ক্রিয়াকর্ম স্বীকার করে নিতে হয়েছে। আমার বক্তব্যটা আরও একটু বিস্মৃত শুধু। যদি দেবতার শরীর এবং ক্রিয়াকর্ম কিছু থাকে, তবে কর্মের সঙ্গে অপকর্মও কিছু থাকবে। আর অপকর্মও যদি প্রমাণিত হয়, তবে দেবতাদের সম্বন্ধে অপশব্দও শুনতে হবে কিছু। আমাদের দেশে যাঁরা আপন অন্তরভূমি থেকে দেবতার সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা দেবতার পূজ্যত্ব বজায় রেখেও তাঁদের সম্বন্ধে লঘু রসিকতা করেছেন। এই রসিকতা সম্ভব হয়েছে দেবতাদের একান্ত মানবায়নের পথ ধরে। মনুষ্য-জীবনে একটি মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যেমন সত্য, তেমনই ক্ষেত্রবিশেষে তাকে নিয়ে যে ঠাট্টা-তামাশা, যে রঙ্গ-রসিকতা চলে—সেটাও তেমনই সত্য। মানুষের ঠাট্টা-তামাশা-রসিকতা যেহেতু ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব ভাব-ভঙ্গী এবং নানা ক্রিয়া-কলাপের ওপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনই দেবতাদের সম্বন্ধে মুখরোচক রসিকতাও তৈরি হয়েছে পুরাণ, ইতিহাসে যেমনটি তাঁদের ব্যক্তি-চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, সেগুলির সূত্র ধরেই।

মনে রাখতে হবে, হিন্দুর দেবতা যদি শুধুমাত্র অন্তরীক্ষলোকের ধ্যানগম্য শক্তিটুকু হতেন, তাহলে আমার এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন পড়ত না। আমাদের ভাগ্যে অথবা আপন করুণায় তিনি আমাদের সাংসারিক সম্বন্ধের মধ্যে নানাভাবে ধরা দিয়েছেন ; আমাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং প্রেম এমন নিবিড়ভাবে ঘটেছে যে, সংসারের বাপ-ভাই মা-বোন অথবা স্বামী-স্ত্রীর মতো প্রত্যেক দেবতার গুণ-দোষও আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জানি। কবি বলেছেন—"যতবড়ো ক্ষমতাশালী হোন-না কেন সত্যভাবে প্রকাশ পেতে হলে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই।"

হিন্দুর দেবতা মানুষের সঙ্গে নিজের প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করে বারবার নিজেকে ভাল লাগিয়েছেন। শুধু আনন্দরূপ বা অমৃতর তত্ত্ব নয়, মানুষের যে ছোট-ছোট দুঃখ-সুখ, ছোট-ছোট ব্যথা এবং আনন্দ আছে, হিন্দুর দেবতাকে তার ভাগ নিতে হতে হয়েছে বারবার। আকাশের ওপরের কোন নিরালম্ব ভূমিতে দাঁড়িয়ে কালদণ্ড হাতে সে দেবতার পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি—যাও তুমি, ওই তোমার আলাদা জগৎ। আমি প্রভু, তোমার নিয়ন্তা তোমার হীন জগতে সম্ভব নয় আমার বসতি।

না, আমাদের দেবতার এই হুকুম আমরা মানিনি। হুকুম মানানোর জন্য তাঁকে নিজে এসে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়েছে, নানা সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়েছে প্রিয়ত্বের। কবি বলেছেন—

"এ কথা বলব, সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক

মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা।"

সত্যি কথা বলতে কী, দেবতাকে যখন আমরা পেয়েছি আপন সখার মত, পিতার মত—পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ—ঠিক সেই জায়গাটা থেকেই আমার এই প্রবন্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাযোগ্য হয়ে উঠবে। বস্তুত প্রিয়ত্বই শুধু নয়, সে প্রিয়ত্বের সীমারেখা এতদূর, দেবতার সঙ্গে আমাদের মেশামেশি সেখানে এতটাই গভীর যে, তাঁকে আর নিয়ন্তার দূরত্বে রেখে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। তাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর বিপরীত কার্যকিলাপের জন্য ধমকও খেতে হয়েছে আমাদের কাছে, আবার কখনও বা দেবতার দেবত্ব ঘুলিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে চরম ঠাট্টা-রসিকতা করে তাঁর স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলি লঘু করে দিয়ে তাঁকে আমরা পুনরায় পূজ্যপদে স্থাপন করেছি।

এমন একটা প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে শুধু কতগুলি অল্পশ্রুত মানুষের ভয়ে আমাকে পদে পদে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। নইলে আজন্ম এক মহা-বৈষ্ণবের পুত্র হওয়ার সৌভাগ্যে এক চরম এক পরম দেবতাও আমার অন্তরে কোনদিন এতটুকু বিভীষিকা সৃষ্টি করেননি। দেবতা যে কোনদিন ভয় দেখাতে পারেন, আমার ওপরে কখনও যে দেবতার অভিশাপ নেমে আসতে পারে—এ আমি কোনদিন ভাবিইনি। দেবতার ভাষা মানেই আমার কাছে—কুঞ্চিতাধরপুটে মধুর মুরলীর শব্দ। দেবতার শরীর মানেই আমার কাছে—'রাধামুগ্ধমুখারবিন্দে'র এক মধুকর। শত্রুকে হত্যা করতে গেলেও তাঁর মুখের হাসিটি মেলায় না—এমন সাংঘাতিক। আর তিন ভুবনের সবচেয়ে কালো লোকটি যদি একখানা ক্যাটক্যাটে হলুদ কাপড় পরে, গলায় বনমালা দুলিয়ে মেয়েদের মন ভোলাতে যায়, তবে বাংলার কবি বলবেন—আহা! 'গতি অতি ললিত-ত্রিভঙ্গী', সংস্কৃতের ব্যাস বলবেন—'পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ'—কিন্তু আমার কথা বলুন—ওই কালো চেহারায় অতিবিপরীতভাবে বেমানান হলুদ কাপড়টি দেখে আমি কি রসিকতা না করে থাকতে পারি? এমন একটা দেবতার সঙ্গে আমার জন্ম-জন্ম সম্বন্ধ থাকায় অন্য দেবতাদের সম্বন্ধেও আমার মনে খুব একটা গম্ভীর কঠিন ধারণার সঞ্চার হয়নি। যদি বা আমার প্রবন্ধের প্ররোচনায় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নয় এমন কোন দেবতার রাগ হয়, তবে তার প্রতিরোধের জন্য আমার বাঁশীওয়ালার বাঁশীটিই যথেষ্ট মনে করি। তিনিই আমাকে সযত্নে সরসে রক্ষা করবেন।

এই প্রবন্ধ পড়ে যে পাঠকের দেবতার সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করার মত একটা অভিযোগ জাগবে, সেই পাঠককে আমি ভয়-বিহ্বল না হওয়ার অনুরোধ জানাই। যদি না জেনে আকস্মিকভাবে এই প্রবন্ধ পড়ে নিজেকে অপরাধী মনে করেন, তবে সে অপরাধ আমার ওপরেই চাপাবেন। কারণ লেখক হিসেবে সমস্ত অপরাধের দায় আমার এবং সে অপরাধের ফল ভোগ করতে আমার ভাল লাগবে। আর যদি গম্ভীর-সুজন কেউ বর্তমান প্রবন্ধ পড়ে বর্তমান লেখককে চপল ভাবেন, তবে সেই চাপল্যের দায় কিন্তু আমার অতি-চপল উপাস্য ঈশ্বরের। তাঁকে 'কৃষ্ণ' বলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই রসিক-ভাবুকের মনে আসে—হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে কৃপাজলনিধে! অতএব তিনি চপল হয়েছেন বলেই আমার চপলতা। কালিদাসের কথাটা একটু

হালকা করে নিলে—তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ।

'দেশ'-এ যখন এই প্রবন্ধের একাংশ লিখিত হয়েছিল, তখন শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ তাঁর ব্যক্তিগত প্রশংসায় আমাকে অশেষ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। অবশ্য সেই প্রবন্ধের পরিকল্পনা এবং অপরিমার্জিত সমস্ত লেখাটি পড়ে দিয়ে যিনি এটিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার মর্যাদা দেন, তিনি হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাগরবাবু এবং সুনীলদা—এই দুজনের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারলাম না।

বছর তিনেক আগে 'দেশ'-এ লেখা এই প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কোন পরিকল্পনাই আমার ছিল না। হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রিটে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীনিমাইসাধন বসুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে আনন্দ পাবলিশার্সে শ্রীবাদল বসুর ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন এবং আমার প্রবন্ধটি নিয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। প্রসঙ্গত হঠাৎই তিনি বললেন—এটা বই করে বার করবেন তো? আমি বললাম—তেমন করে কিছু ভাবিনি। এইবার বাদলবাবুর পালা। তিনি বললেন—পরিকল্পনাটা আমাদের কিন্তু আছে। কিন্তু আপনি এত অল্প লিখে ছেড়ে দিলেন যে, ওতে তো একটা ডাবল-ক্রাউন বইও হবে না। লেখাটা সম্পূর্ণ করে দিন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা এখনও স্মরণ করি এবং সত্যিই এই গ্রন্থ প্রকাশের পেছনে তাঁর ধৈর্য আছে অনেকখানি। আনন্দ পাবলিশার্সের মলয় ব্যানার্জিকেও আমায় ধন্যবাদ দিতে হবে। এই গ্রন্থের পাদটীকা এবং গ্রন্থপঞ্জী যোগ করতে হয়েছে প্রধানত তারই উৎসাহে। অলমিতি—

সূচি

প্রথম অধ্যায়

দেবতারা মানুষের লক্ষণাক্রান্ত

॥ ১ ॥

কবি যে বলেছিলেন, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'— সে তো রীতিমত তত্ত্বের কথা। 'হিউম্যানাইজেশন অব গড্স্' কিংবা 'ডিইফিকেশন্ অব হিউম্যান বিয়িংস' অথবা নিদেনপক্ষে 'অ্যাপোথিওসিস্'— এসব তো মিথলজিস্টদের পরিসর। আমি অত দূর যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য সাদামাটা। আমি বলতে চাই— দেবতারা, বিশেষ করে বৈদিকোত্তর যুগের দেবতারা, আমাদের এত কাছাকাছি চলে এসেছেন যে, তাঁরা শুধু ঘরের গোপালটি কিংবা লক্ষ্মণভাইটি হয়েই রেহাই পাননি। তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা যেমন হয়েছে, তেমনি তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিতান্ত লৌকিক স্তরের প্রবাদও গাঁথা হয়ে গেছে। রঙ্গ-রসিকতা তো এমন মাত্রাছাড়া পর্যায়ে চলে গেছে যে, তাতে দেবত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। যা থাকে— তা শুধু সাধারণ মনুষ্যসমাজের দৈনন্দিন চালচিত্রে আঁটা দেবতা নামক মনুষ্যটির বিচিত্র কাণ্ডকারখানা। সে সব কাণ্ডকারখানাকে আর যাই হোক, কোন ক্রমেই অলৌকিক মর্যাদাসম্পন্ন বলা যায় না। অন্যদিকে সংস্কৃতের কবিরাও বড়ই চতুর। তাঁদের দোষ দেওয়ার মতো কিচ্ছুটি নেই। তাঁরা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ বেশ করে পড়ে নিয়ে ভারতবর্ষের তাবড় তাবড় দেবতাকুলের স্খলন, পতন, ত্রুটিগুলি ভাল করে লক্ষ করেছেন এবং সেগুলি মনেও রেখে দিয়েছেন। দেবতাদের এই স্খলন, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা ক্রিয়াকলাপই পরবর্তী কবিদের ভয়ঙ্কর রঙ্গ-রসিকতার ইন্ধন যুগিয়েছে। অপিচ শুধু রসিকতাই নয়, আরও পরবর্তী সময়ে ওই রসিকতার অংশগুলিই আরও জমাটভাবে মর্মচ্ছেদী প্রবাদমালার জন্ম দিয়েছে— যা শুনলে, দেবতারা যদি জীবিত থাকতেন, আঁতকে উঠতেন, অথবা তুর্কি নাচন লাগিয়ে দিতেন।

এই তো দেখুন না, যে চৈতন্যদেব এই পাঁচশ বৎসর মাত্র আগে এত লীলা করে গেলেন, তাঁকে কিনা লোকে মেনিমুখো লোকের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলে— ন্যাকা চৈতন্য! চৈতন্যের দোষ কি? না, তিনি কিশোরীভাবে রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে আজীবন 'হা কৃষ্ণ', 'কোথা কৃষ্ণ' করে গেছেন। অথবা এটাও বুঝি সবচেয়ে বড় কারণ নয়, যেটা ন্যাকামি বলে গণ্য হতে পারে। কারণটা বোধহয় তাঁর অন্ত্যলীলার পাগলপারা সেই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত অবস্থা, যাতে লোকব্যবহার ক্ষুণ্ণ হত হয়তো। এই অবস্থায় ভাবের আতিশয্যে তাঁর কৃষ্ণ শব্দটি পুরো উচ্চারণ করার ক্ষমতা ছিল না।

তিনি কৃষ্ণ বলতে 'ক' বলতেন, রাধা বলতে উচ্চারণ করতেন 'রা'। মগ্নচৈতন্যের এই অলৌকিক আবেশ সজ্জন ভক্ত সাধুদের কাছে যতই উচ্চকোটির সাত্ত্বিক বিকার বলে গণ্য হোক না কেন, সাধারণে তাঁকে অবশ্যই ভুল বুঝত এবং তাঁর চরিত্রের অপব্যাখ্যাও করত। সম্ভবত সেই সময় থেকেই যে সব পুরুষ মানুষ একটু মেয়েলি স্বভাবের অথবা এক বলতে আরেক বলে, তার ওপরেই চৈতন্যচরিত্রের ওই আবেশটুকু চাপিয়ে দিয়ে লোকে বলে— ন্যাকা চৈতন্য। আমরা লক্ষ করে দেখেছি— চৈতন্যের আরও একটি সাংঘাতিক অভ্যাস ছিল। কেউ হয়তো অত্যন্ত কঠিন কোনও সমস্যায় পড়েছে এবং তা গিয়ে নিবেদনও করছে স্বয়ং মহাপ্রভুর কাছে। প্রভু কিন্তু সেই সমস্যার স্বাভাবিক সমাধানের পথ বাদ দিয়ে হয়তো বললেন— কৃষ্ণই তোমাদের রক্ষা করবেন, তিনিই পথ দেখাবেন। হয়তো মহাপ্রভু এবং কৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই সব সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু আজ যদি কারও গুরুতর সমস্যার সঠিক সমাধানের চেষ্টা না করে গোটা সমস্যাটাই আমরা সার্বিকভাবে লঘু করে দিই, তাহলে অবধারিতভাবে সমস্যা-বিধুর মানুষটির কাছে গালাগালি শুনতে হবে— ন্যাকাচৈতন্য! কিচ্ছুটি যেন বোঝ না।

অথচ চৈতন্যসংক্রান্ত সমস্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্য ঘেঁটে কখনও প্রমাণ করা যাবে না যে, চৈতন্যদেব কোন সমস্যা বুঝতেন না কিংবা তিনি ন্যাকা ছিলেন। শুধু কি এই গালাগালি? তাঁকে ভ্যাঙানোই কি কম হয়েছে? কেউ মাথার ওপরে হাত দুটি তুললেই হল— তাকে গৌরাঙ্গের ভঙ্গিতে হাত তোলা বলেছি, পুনরপি যে মানুষ টিকি রাখেন তাঁর টিকিটার নামই হয়ে গেল 'চৈতন'। হেতু কি? না, চৈতন্য ন্যাড়া মাথায় ধর্মীয় কারণে টিকি রাখতেন। কিন্তু তাই বলে এই শাস্তি? টিকিকে চৈতন বলে ডাকতে হবে? সাধারণ মানুষ থেকে রবীন্দ্রনাথের মত কবিকেও গাইতে হবে— যাও ঠাকুর চৈতন-চুটকি নিয়া। এস দাড়ি নাড়ি কলিমুদ্দি মিয়া।

আসলে এই হল ঘটনা। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এমনই যে, দরকার মত তাঁদের পুজোর আসনে বসিয়ে ভক্তি-গদগদচিত্তে ফুলনৈবেদ্য উপহার দিই, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, আবার ঠাট্টা-মশকরাও করি। আপনারা জোরালো যুক্তি দেখিয়ে বলতে পারেন যে, এসব প্রবাদ ধর্মীয় মতবাদে বিরোধী গোষ্ঠীর তৈরী। কথাটা যে একেবারে উড়িয়ে দেবার মত— তা আমি বলছি না। তবে ধর্মীয় নেতা কিংবা বিশিষ্ট অবতারের সম্পূর্ণ বিরোধী গোষ্ঠীরা যে প্রবাদ তৈরী করেন, সেগুলির মধ্যে সেই সেই নেতা কিংবা অবতারের চরিত্রহননই থাকে বেশি। যেমন আবার সেই চৈতন্যের উদাহরণই দেব— কেননা তাঁর ঐতিহাসিকতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাকে এক সময় কর্মব্যপদেশে চৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপে যেতে হত। প্রথম দিন যেদিন কৃষ্ণনগর থেকে স্বরূপগঞ্জের ঘাটে নৌকো ধরে ওপারে খেয়াঘাটে পৌঁছোলাম, তখন আমার ভ্রমণসঙ্গী বন্ধু— 'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি'র ভঙ্গিতে বললেন— 'নবদ্বীপের বাঁধাঘাটে/ নিত্যানন্দ পাঁঠা কাটে/ নিমাই চাপিয়া ধরে ঠ্যাং।' এ গানের সুর ছিল সকালবেলার টহল-কীর্তন— ভজ গৌরাঙ্গ/কহ গৌরাঙ্গের নকলে।

আজন্ম নিরামিষাশী চৈতন্যের সম্বন্ধে এই মর্মন্তুদ গান শুনে আমি একেবারে ধন্দে পড়ে গেলাম। পরে বুঝেছি— এ গানের মধ্যে চৈতন্য-ধর্মের বিরোধিতার সুর আছে, যে বিরোধিতা আরম্ভ হয়েছিল তাঁর আপন কাল থেকেই। পাঠকের স্মরণে থাকবে,

বৃন্দাবন দাসের লেখা চৈতন্যভাগবতের কথা। চৈতন্য যখন নবীন ভাবাবেশে শ্রীবাসের বাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে কীর্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন, সেদিন এইরকমই কিছু লোক শ্রীবাসের বাড়ির বন্ধ দরজায় কড়া নেড়ে নিজেরা নিজেরা বলেছিল— এই বৈষ্ণবগুলো আসলে মদ-মাংস সব খায়, এসব না খেলে দিনরাত এমন গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে কীর্তন করে কি করে ? বৃন্দাবন দাসের জবানীতে—

> কেহো বোলে, "এগুলা সকল নাকি খায়।
> চিনিলে পাইবে লাজ— দ্বার না ঘুচায় ॥"
> কেহো বোলে— "সত্য সত্য এই সে উত্তর।
> নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্টপ্রহর ॥"
> কেহো বোলে— "আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
> সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥"[১]

নবদ্বীপের বাঁধাঘাটে আমি যে গান শুনেছি, তার সঙ্গে বৃন্দাবন দাসের জবানীর তফাত নেই কোনও। বস্তুত বিরোধীরা যে প্রবাদ তৈরী করে তা মর্মভেদী, কিন্তু সাধারণের মধ্যে যে প্রবাদ তৈরী হয়েছে তার মধ্যে নির্ভেজাল বদামি ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি প্রধানত চৈতন্যের কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, তিনি এই পাঁচশ বছর আগেও বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আমাদের পরিমণ্ডলে যাঁরা দু'হাজার আড়াই হাজার বছরের বনেদী দেবতা— তাঁদের সম্বন্ধে যে প্রবাদগুলি তৈরী হয়েছে তার মধ্যেও এই একই প্যাটার্ন থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ কিনা এমন প্রবাদ, দেবতার চারিত্রিক আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এমন কিছু রসিকতা, যা দেবতার গায়ে হুল ফোটায় না, অথচ তাঁকে ঠেলা দেয় নাড়া দেয়, বিরোধী গোষ্ঠীর তৈরি-করা প্রবাদ কিন্তু সেক্ষেত্রে দেবতাকে একেবারে অপদেবের মতো করে তুলবে।

আমার কলেজ-জীবনের শিক্ষক সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য মশাই একসময় আমাকে বলেছিলেন যে, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দেবতায় দেবতায় ঝগড়া, বিদ্বেষ এবং গালাগালি অত্যন্ত লৌকিক পর্যায়ে চলে গেছে, এবং এই লৌকিকতার প্রভাব পরবর্তী প্রবাদবাক্যগুলির ওপর পড়ে থাকতে পারে। উল্লেখ্য, মাষ্টারমশাই মঙ্গলকাব্যগুলি নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তবে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত না হয়েও আমার একটা আর্জি পেশ করতে পারি। বস্তুত বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি আমার কাছে প্রাচীন পুরাণগুলির বাংলা সংস্করণ বলে মনে হয়। দেবতাদের লোকায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই সংস্কৃত পুরাণগুলির যুগ থেকেই। দেবতায় দেবতায় ঝগড়া শুধু নয়, দেবতাদের চারিত্রিক এবং আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিও পুরাণগুলির মধ্যে এমন লোকায়তভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, প্রবাদের জমি তৈরী হয়েছে সেখান থেকেই। আবার সভ্য সমাজের সাধারণ মানুষেরাও যে বিশিষ্ট দেবতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা কথা বলেন, নানা কবিতা তৈরী করেন, নানা রঙ্গ-রসিকতা করেন— তারও উৎসভূমি এই পুরাণগুলিই, যার প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে বিভিন্ন কবির জবানীতে।

বাঙালীর ঘরে ঘরে যে সব দেবতা অধিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের প্রতি অচলা ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাসি-ঠাট্টা-মশকরা কোনওদিনই বন্ধ থাকেনি। অনেক ক্ষেত্রে সে ইঙ্গিত অতি হীন, কখনও বা অতি কুরুচিপূর্ণও বটে।

কিন্তু দেখেছি— তাতে ভক্তের ভক্তিতেও ভাঁটা পড়ে না, দেবতার ঐশ্বর্য সম্বন্ধেও কোনও মালিন্য তৈরী হয় না। বরঞ্চ ওই সব রঙ্গ-রসিকতা ক্ষেত্রবিশেষে ভক্তের হৃদয়ে রীতিমত রসসঞ্চার করে। তাতে আপন আপন দেবতার ক্রিয়াকর্ম এমনকি বিক্রিয়াগুলিও লীলা-বিলাসের রূপ ধারণ করে। বিশ্বাস না হয়, বাঙালি ঘরের প্রাচীন এবং আধুনিক মায়েদের কথা স্মরণ করুন। তাঁরা যুবক-বয়সের অতিপক্ক পুরুষটিকেও নিছক 'গোপাল' বলে ভাবেন এবং তার অনেক অন্যায় কর্মকেও গোপাল-সুলভ মনে করে প্রশ্রয় দেন। কিন্তু এই প্রশ্রয় শুরু হয়েছে কবে থেকে জানেন ? সেই দেবতার সময় থেকেই, যাকে আমরা গোপাল বলে সেবা করি। যশোমতীর চিরন্তন মাতৃহৃদয় গোপালের পরস্ত্রীবিষয়ক ক্রিয়াকলাপে একটুও সন্দিগ্ধ কিংবা উৎকণ্ঠাগ্রস্ত ছিল না, বরঞ্চ এ রকম কথা শুনলে তিনি সাতবাহন হালের গাথা সপ্তশতীর পদ্ধতিতে বলতেন— আমার দামোদর এখনও ছেলে মানুষ—অজ্জাবি বালো দামোদরেত্তি— বাছা আমার ওসব বোঝেই না। পুত্রের অপকর্মগুলি যে সব মায়েরা এইভাবে আবরণ করেন, তাঁদের নিয়ে আমরা কি করি ? সামনে ঝগড়ার ভয়ে কিছু বলি না, পেছনে হাসি। তার ওপরে এই দুরন্ত প্রশ্রয় যদি ছেলের বন্ধু-বান্ধব বা বান্ধবীর সামনের প্রদর্শিত হয়, তাহলে বন্ধুরা কি করে ? হাসে। হাল দেখিয়েছেন — যশোমতীর মুখে এই প্রশ্রয়মাখা কথা শুনে ব্রজের যুবতীরা নাকি কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তেরছা করে হেসেছিল।[২] ব্যঞ্জনাটা পরিষ্কার।

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে হালের মত ভোগী কবি যা বলেছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে আপাত যৌবনবিরাগী রূপ গোস্বামী একই কথা বলেছেন। বিদগ্ধমাধব নাটকে দেখছি— কৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ যশোমতীকে বলছেন— কৃষ্ণের বিয়ের জন্য গোপীকুলে একটি মেয়ে দেখতে। উত্তরে যশোদা বললেন— ছেলে আমার এখনো 'দুগ্ধমুখ' বালক, তার আবার এখনই বিয়ে কি ? বলা বাহুল্য, স্নেহময়ী যশোদা গোপরমণীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রসবিলাসের কথা শুনেও শুনতেন না, জেনেও জানতেন না। কিন্তু যারা জানত, যেমন এক্ষেত্রে কৃষ্ণেরই এক বয়স্য বন্ধু— মধুমঙ্গল, সে এ কথা শুনেই চুপিচুপি কৃষ্ণের কানে কানে বলল— তুমি বুঝি সত্যিই দুগ্ধমুখ— যে দুধের লোভে সহস্র গোপকিশোরীরা তোমার মুখে মুখ দিয়ে দুধ চাখে।[৩]

সহৃদয় পাঠক ! কৃষ্ণের বন্ধুর এই তির্যক রসিকতা ভক্তের কাছে কিন্তু লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের বিলাস-বৈদগ্ধ্যের অঙ্গ। অভক্তজনে এসব কথার অপব্যাখ্যা করতে পারে বলে এই সব লীলা গ্রন্থে অভক্তজনের প্রবেশও নিষেধ। সেই রসের রসিক মানুষই এই রসিকতার অধিকারী এবং তিনিই এর বোদ্ধা। ভক্তের কাছে কৃষ্ণ শুধু নবনীত-চোর নন, তিনি অনেকই কিছুরই চোর। ঘটে-পটে ছিন্নভিন্ন রুক্ষ নৈয়ায়িক পর্যন্ত সরসে তাঁকে প্রণাম করেন— কাঁচা-বয়সী গোপবধূর বসন-চোরা বলে— গোপবধূটিদুকূলচৌরায়।[৪] আর সামগ্রিক ভক্তের কাছে তিনি শুধু ননীচোরা, গোপীর বসন-চোরা, ভক্তের মনোচোরাই নন, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় চোর— চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।[৫] ধ্যানগম্য বিরাট পুরুষকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চোর বলে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্ত যে পরম মাধুর্য আস্বাদন করেন— তারই পথ ধরে অন্য কবিরা কিন্তু এমন জায়গায় এসে পৌঁছোন, যাতে মর্ত্যলিঙ্গ পরম পুরুষটিকে 'কৃষ্ণস্তু

ভগবান্ স্বয়ম্ বলতে ভয় হয়।

॥ ২ ॥

বস্তুত রসিকতাই হোক কিংবা কটূক্তিই হোক— এই প্যাটার্নটা নতুন কিছু নয়, এমনকি এটা যে নিতান্ত ভারতবর্ষীয় কোন উদ্ভাবন— তাও বলা যাবে না। কারণ অন্যান্য দেশের দেবচরিত্রেও নানান কালিমা-কলঙ্ক আছে, আছে ক্রোধ, হিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা। পরম ঈশ্বরের রূপকল্পনা যেখানে কার্যত নিষিদ্ধ, সেখানে হোমারের মত কালজয়ী কবি মহাকাব্যের গ্রন্থিসূত্রে দেবতাদের নানান পাকে জড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি অনেক হীন কাজও তাঁদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। থিওগনির বিখ্যাত লেখক হেসিয়ড— তিনিও দেবতাদের কার্যকলাপ একেবারে নিঃসঙ্কোচে তুলে ধরার ফলে তাত্ত্বিকেরা পড়েছেন মহা ফাঁপরে। আমাদের দেশে ব্যাস-বাল্মিকীদের হোমার-হেসিয়ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু হোমার-হেসিয়ড যা করেছেন তাতে তাঁদের আপন দেশেই কোথাও কোথাও নিন্দা-মন্দ শুনতে হয়েছে। গ্রীস দেশের এক প্রখ্যাত দার্শনিক, হেরাক্লিটাস তো হোমার অথবা তাঁর সমগোত্রীয় আর্চিলোকাসকে চাবকে সোজা করার প্রস্তাব দিয়েছেন— Homer should be whipped and Archilochus likewise।[৬] হোমার-হেসিয়ডের মানসিক গঠন দেখে হেরাক্লিটাস্ মোটেই সুখী নন, এবং তাঁর ধারণা— অনেক কিছু জানলেই যে একজনের সব বোঝা হয়ে যাবে তার কোনও মানে নেই। যদি তাই হত, অহলে হেসিয়ড কিংবা পিথাগোরাস, জেনোফেনিস কিংবা হেকাটেলাসও অনেক কিছু শিখে ফেলত— The learning of many things does not teach understanding, otherwise it would have taught Hesiod and Pythagorus and again Xenophanes and Hecataleus.[৭]

সত্যি কথা বলতে কি— আমাদের দেশের তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা কেউই ব্যাস-বাল্মীকির ওপর এতটা মারমুখো নন। ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বৌদ্ধ দার্শনিকেরা পর্যন্ত কেউ বেত মারার ভয় দেখাননি ব্যাস-বাল্মিকীকে। বরঞ্চ আমরা ব্যাস-বাল্মীকির সূত্র ধরে যেটা রপ্ত করেছি— তা হল, দেবতাদের চরিত্রব্যাখ্যা, দেবতাদের ক্রোধ, হিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা, কামনা, এমনকি ভক্তের ওপর পক্ষপাত— এই সব কিছুরই একটা যুতসই কারণ খুঁজে বার করে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা করি আমরা। অপিচ এসব প্রশ্ন-ব্যাখ্যা আমরা নয়, আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাসেরাই করেছেন।

আপনারা জানেন যে, দেবতারা—সে ভারতীয়ই দেবতাই হোন কিংবা গ্রীক—ছল, জুয়োচুরিতে দারুণ অভ্যস্ত। কিন্তু এসব দৈবদোষ দেখে আমরা হেরাক্লিটাসের মতো মোটেই মারমুখো হইনি, বরঞ্চ রাজার মতো সশ্রদ্ধে দেবীভাগবত পুরাণের ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেছি— কি ব্যাপার, কেন এমন হল ? ঘটনা হল— দেবতাদের পুরোহিত বৃহস্পতি একবার অসুরগুরু শুক্রাচার্যের অনুপস্থিতিতে অসুরদের ছলনা করেছিলেন। তিনি শুক্রাচার্যের রূপ ধরে এসে অসুরদের প্রবঞ্চনা করে বলেছিলেন— আমিই তোদের গুরু। অসুরেরা বিশ্বাস করেছিল এবং এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে দেবগুরু তাঁদের অহিংসা শেখাচ্ছিলেন যাতে আততায়ী দেবতাদের তারা না মারে— অহিংসা

পরমো ধর্মোহন্তব্যা হ্যাততায়িনঃ ।।[৮]

খবর শুনে শ্রোতার আসনে-বসা রাজা জনমেজয় হুম হুম করে উঠলেন। ব্যাসকে বললেন— এটা কি রকম কথা হল, মুনিবর ? দেবতাদের গুরু হয়ে, প্রাতঃস্মরণীয় অঙ্গিরার ছেলে হয়ে বৃহস্পতি কিনা শেষে এমন নিপাট মিথ্যা কথা বলতে পারলেন ? ধর্মশাস্ত্রে কুলীন , বিদ্যাবাগীশ মুনি হয়েও যদি তিনি এমন মিথ্যাবাদী হন, তাহলে সংসারী লোকেরা আর সত্য কথা বলার উপদেশ শুনবে কেন— কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ?[৯] রাজা এইটুকু বলেই থামলেন না। বললেন— শাস্ত্রের বচনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হলে, মনুষ্যব্যবহারে দ্বিধা -দ্বন্দ্ব হলে আপনারাই না বলেন যে, ঋষিদের বাক্যই হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তা বৃহস্পতির এই ছলনায় তো শব্দ-প্রমাণের বারোটা বেজে গেল। আপনারা বলেছেন— দেবতাদের জন্ম নাকি সত্ত্বগুণ থেকে আর মানুষের জন্ম রজোগুণ থেকে। তা দেবতাদের গুরু সত্ত্বগুণী বৃহস্পতিই যদি এত মিথ্যাচারী হন, তা হলে রজোগুণী মানুষের মধ্যে আর সত্য কথা কইবে কে ? দেবগুরুর ওপর থেকে অভিযোগ সরিয়ে রাজা এবারে ধরলেন দেবতাদের। রাজা বললেন— দেখুন, মুনিবর ! ভগবান শ্রীহরি থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা, ইন্দ্র— সকলেই ছল-জুয়োচুরিতে বেশ সিদ্ধহস্ত দেখছি, মানুষের কথা নাই বা বললাম—

> হরি ব্রহ্মা শচীকান্ত স্তথান্যে সুরসত্তমাঃ।
> সর্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ।।[১০]

চিরটা কাল মানুষকে কেবল ধর্ম শেখানো হয়, শেখানো হয় দেবতা-মুনিদের দ্বারেই। আজকে উপযুক্ত মওকা বুঝে মানুষ রাজা ব্যাসকে বললেন— দেবতাদের কাম-ক্রোধ কোনওটাই তো কম নয়, লোভও দারুণ। এখন দেখছি— সত্ত্বগুণী দেবতা আর তপোধন মুনিরা ছল-চাতুরীও বেশ ভাল রকম জানেন। এই যে বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র— এত সব বড় বড় মুনিদের নাম। এঁরা তো প্রত্যেকে পাপী— তাহলে আর ধর্মের গতি কি হবে ? আর দেবতারাই কি কম ? ইন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্র, মায় বিধাতাপুরুষ পর্যন্ত ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, প্রত্যেকেই পরের বউ দেখলে হামলে পড়েন। কিন্তু তবু লোকে এঁদেরই ভদ্রলোক বলে, আর্য বলে, কেমন করে এমনটি হয় বলুন তো— আর্যত্বং ভুবনেষ্বেষু স্থিতং কুত্র মুনে বদ।

দেবতা-মুনিদের স্বভাব-চরিত্রে হাজার রকমের স্খলন পতনের কথা স্মরণ করে রাজা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিমনা হয়ে মন্তব্য করলেন— ঋষি, মুনি দেবতা— সবাই লোভে কাতর, এখন কার কথাই বা শুনব, কার কথাই বা মানব— বচনং কস্য মন্তব্যম্ ?[১১]

দেবীভাগবতের স্রষ্টা ব্যাসদেব কিন্তু সোজাসুজি দেবতা কিংবা মুনিদের স্বভাব-চরিত্রের কোন সাফাই গাইতে পারলেন না। কিংবা শ্রীমদ্‌ভাগবতের কায়দায়— তেজী লোকের কোনও দোষ হয় না বাপু—তেজীয়সাং ন দোষায়[১২]— এইরকম একটা বাহানা দিয়ে দৈব চ্যুতিগুলির দার্শনিক প্রতিপত্তি ঘটানোরও কোনও চেষ্টা করলেন না। উত্তরে ব্যাস যা বললেন, তা আমাদের মত মানুষের ভারি ভাল লেগেছে। ব্যাস দেবতাদের সম্পূর্ণ মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন, এবং মন্তব্য করেছেন— দেহধারী জীবমাত্রেরই এইরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে। ব্যাস কোন ভণিতা না করে জবাব দিলেন— কি বিষ্ণু, কি শিব, কি ইন্দ্র কি বৃহস্পতি— দেহবান পুরুষ মাত্রেই

এসব বিকার থাকবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর সবারই কামনা-বাসনা যথেষ্ট আছে বাপু— রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ।[১৩] আর কামপর মানুষ মাত্রেই সমস্ত অন্যায়ই করতে পারে। দেবতাদের তুমি ত্রিগুণাতীত ভেবে বসে আছ— এইখানেই তোমার গণ্ডগোল। সত্ত্ব, রজ এবং তম— এই তিন গুণের বশেই এঁরা ভাল-মন্দ সবই করেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের যেমন জন্ম-মরণ আছে, এঁদেরও তাই— কালে মরণধর্মশ্চ সন্দেহঃ কোঽত্র তে নৃপ।[১৪] পরিশেষে ব্যাস আমাদের মতই মন্তব্য করেছেন— অন্যকে উপদেশ দেওয়ার সময় সবাই খুব সাধু সাজতে পারে—

পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্বে ভবন্তি চ।
বিপ্লুতি র্হ্যবিশেষেণ স্বকার্যে সমুপস্থিতে ॥[১৫]

সেরকম সেরকম পরিস্থিতিতে পড়লে যে জ্ঞান দেওয়া বেরিয়ে যাবে, সেটা অনেকেই বোঝে না। ব্যাস বুঝি দেবতা-মুনিদের জ্ঞান দেওয়ার প্রবৃত্তি এবং কার্যক্ষেত্রে নিজেদের অন্যায় আচরণের নিরিখেই এত বড় কথাটা বললেন।

যাঁরা কৃষ্ণভক্ত, ভাগবত পুরাণকে যাঁরা সবচেয়ে প্রামাণিক বলে মনে করেন, তাঁরা দেবীভাগবতের মন্তব্যে খুবই ক্রুদ্ধ হবেন মনে করি ; বিশেষত ভগবান বিষ্ণুকে যেহেতু এখানে জন্ম-মরণশীল মনুষ্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে তাঁদের ক্রোধ উদ্রিক্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে তাঁদের রাগ হওয়ার কোন কারণ নেই, যেহেতু তাঁদের ঘরের ভাগবত পুরাণে একমাত্র বিষ্ণু ছাড়া শিব, ব্রহ্মা তথা ইন্দ্রাদি দেবতার অবস্থা খুবই খারাপ। ভগবদ্গীতা তো একেবারে দিনক্ষণ মেপে ব্রহ্মার আয়ু নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[১৬] আর ভাগবত পুরাণের একনিষ্ঠ অনুগামী চৈতন্যচরিতামৃত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে নিয়ে কি কাণ্ড করিয়েছে ভাবতেই পারবেন না। আসলে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মার দেখা করার সময়টি পূর্বে নিধারিত ছিল না। তিনি এক শুভ মুহূর্তে দ্বারকায় কৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। কৃষ্ণের দারোয়ানকে তিনি আর্জি জানালেন এবং দারোয়ান যথারীতি কৃষ্ণকে জানাল। আর্জি শুনে কৃষ্ণ বললেন, "কোন ব্রহ্মা, কি নাম তাহার ?" দারোয়ান ঘুরে এসে ব্রহ্মাকে কৃষ্ণের প্রশ্ন শুনিয়ে দিল। ব্রহ্মা বললেন— "কহ গিয়া, সনকপিতা চতুর্মুখ আইলা।"[১৭] পরিচয় পাবার পর ব্রহ্মার ডাক পড়ল বটে, কৃষ্ণও তাঁকে অনেক খাতির যত্ন করে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মার কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছিল না। সব ফেলে তিনি কৃষ্ণকে বললেন— একটা সন্দেহের নিরসন করতে হবে আগে—

'কোন ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন অভিপ্রায়ে।
আমা বই জগতে আর কোন ব্রহ্মা হয়ে ?'[১৮]

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান কৃষ্ণ নাকি শতমুখ ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে কোটি-মুখ ব্রহ্মার লাইন লাগিয়ে দিয়েছিলেন দ্বারকায়। হাজারো রুদ্র আর হাজারো ইন্দ্রদেরও চতুর্মুখ ব্রহ্মার চোখের সামনে ফেলে দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ব্রহ্মাটা কিছুই নয়।

আমি বেশ বুঝতে পারছি— আমার বক্তব্য অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে। আমরা বলতে চেয়েছিলাম— দেবতারা সবাই জন্ম-মরণশীল মনুষ্যের মতই। রাগ, দ্বেষ, লোভ, তৃষ্ণা কারুরই কম নয়। তবে হ্যাঁ, এই কথাটা এমনি করে দেবতাদের বলাটা একটু

কঠিন। মানুষ তো ভাবী ভবিষ্যতের জন্য দেবতাদের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। তাদের পক্ষে এ সব কথা বলা মানে ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করা। আমরা তাই কথাটা অসুরদের জবানীতে বলব। আর দেখুন, আমরা গণতন্ত্রের যুগে বাস করি। বিরোধী গোষ্ঠীর মতামত যাই হোক— আমরা মূল্য দিয়ে থাকি, কারণ সরকার গোষ্ঠীরা সব সময়ই বিরোধীদের সমালোচনার মূল্য দেন। আপনারা তো এটা জানেন যে, স্বর্গে সরকারি দল হলেন দেবতারা ; কিন্তু মাঝে মাঝে বিরোধী গোষ্ঠী অসুরেরাও ক্ষমতা দখল করে নেন। তখনই লাগে গণ্ডগোল, একবার বিষ্ণুর ডাক পড়ে, একবার শিবের ডাক পড়ে— তারপর কোনওমতে অসুরদের সামলানো হয়। কিন্তু কেন এই অবিচার ? স্বয়ং বিষ্ণুর কাছেও কিছু বলে লাভ নেই, কারণ তিনি দেবতাদের অনুকূলে কাজ করেন। কাজেই এমন একটা জায়গা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, যেখানে অসুরেরা নির্ভয়ে দেবতাদের সমালোচনা করছে। তবে এর জন্য আবার আমাদের দেবীপুরাণ খুলতে হবে। সেখানে দেখা যাবে অসুরেরা সম্পূর্ণ দশ বছর স্বর্গসুখ ভোগ করেছে। দৈত্যদের রাজা তখন বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ। তিনি তখন পূর্বে উল্লিখিত বৃহস্পতির বঞ্চনায় খানিকটা মুষড়ে পড়েছেন। ওদিকে দেবরাজ ইন্দ্রও কোমর কষে তপস্যা করে দেবী মহামায়াকে তুষ্ট করেছেন। তিনি এখন উপস্থিত হয়েছেন প্রহ্লাদের সামনে। দৈত্য-দানবেরা সবাই ভয় পাচ্ছে একটু-আধটু। প্রহ্লাদও তখন দেবীর উদ্দেশে দারুণ ভাব দিয়ে একটা স্তুতি-পাঠ করলেন। এর পরেই প্রহ্লাদ এত সুন্দর কতকগুলি কথা বললেন, যাতে আত্ম-সমালোচনাও যেমন আছে, তেমনি আছে দেবতাদের সমালোচনা। বিশ্বজননী মায়ের সামনেই এমন কথা বলা যায় বলে, দেবীভাগবতের ব্যাস নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সে সব কথা নিজের মমতা মাখিয়ে নিজের জবানীতেই ধরে রেখেছেন।

প্রহ্লাদ বললেন— তুমি বিশ্বজননী, তোমার কাছেই বলি। দেবতারাও স্বার্থপর, আমরাও স্বার্থপর। তাহলে আমাদের সঙ্গে দেবতাদের পার্থক্যটা কোথায় ? আমরাও টাকাপয়সা চাই, ভোগ করার জন্য স্ত্রীলোক কামনা করি, দেবতারাও তাই চায়— সেখানে সুরাসুরে ভেদ কিসের ? ওদের জন্ম কশ্যপ মুনির ঔরসে, আমাদের জন্মও তাই, তাহলে কোথা থেকে এল এই জন্ম-জন্মান্তরের বৈরিতা। মাগো ! তোমার নিশ্চয়ই যুদ্ধ দেখতে ভাল লাগে, নইলে তুমিও তো আমাদের মধ্যে একটা সমতা আনার চেষ্টা করতে পার ![১৯] প্রহ্লাদ এতক্ষণ ভণিতা করে এবার আসল অভিযোগ পেশ করলেন, পেশ করলেন দেবতাদের বঞ্চনার কথা। প্রহ্লাদ বললেন— তুমিই বিচার করে দেখ, মা ! দেবতারা এবং অসুরেরা সমবেতভাবে সমুদ্রমন্থন করল। কিন্তু সমুদ্র থেকে যা যা রত্ন উঠল, যে অমৃত উঠল— সব গিয়ে পড়ল দেবতাদের ভাগে। স্বয়ং বিষ্ণুই তখন দেবাসুরে ভেদ তৈরী করলেন। তিনি জগতের পালক বলে পরিচিত, অথচ লোভে পড়ে তিনি কি কাণ্ডটাই না করলেন ! সমুদ্র থেকে ওঠা মাত্র তিনি স্বর্গসুন্দরী লক্ষ্মীকে হাতিয়ে নিলেন— তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদ্ গৃহীতামরসুন্দরী।[২০] সমুদ্র থেকে ঐরাবত হাতী উঠল, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া উঠল, পারিজাত ফুল উঠল— সব মেরে দিল দেবরাজ ইন্দ্র এবং এর মধ্যে স্বয়ং বিষ্ণুর হাত ছিল— সুরৈঃ সর্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া।[২১]

প্রহ্লাদ এবার — তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ— এমন একটা ভঙ্গিতে সিদ্ধান্ত

করলেন— এইরকম সব জঘন্য অন্যায় করেও দেবতারা আজ সাধু হয়ে গেলেন— জাতা দেবাস্তু সাধবঃ।[২২] কিন্তু আপনাদের ধর্মের লক্ষণে কি বলে ? এত অন্যায় করা সত্ত্বেও ভগবান বিষ্ণু সেই দেবতাদের রক্ষা করে যাচ্ছেন, আর আমাদের মেরে ঠাণ্ডা করছেন, এই কি আপনাদের ধর্মের লক্ষণ ! প্রহ্লাদ এবার রেগে উঠলেন— কোথায় ধর্ম, কিসের ধর্ম, ঔচিত্য কোথায়, সাধুতাই বা কোথায় ? কার কাছে গিয়েই বা এই অন্যায়, এই অবিচারের কথা জানাব ? আপনারা তো এক কথা বলেন না। একেক শাস্ত্রে একেক রকম, এক বেদজ্ঞ এক কথা বললে, আরেক বেদজ্ঞ তা মানে না— নৈকবাক্যং বচস্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ।[২৩] আর কেনই বা বলবে— সবাই যে স্বার্থপর— যতঃ স্বার্থপরং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।[২৪] সংসারে কামনা ছাড়া মানুষ নেই। এই যে চন্দ্র ! তিনি গুরু বৃহস্পতির বউকে নিয়ে পালালেন। দেবরাজ ইন্দ্র— রাজা বটে— তিনি গৌতমগুরুর সাধ্বী পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করলেন। গুরু বৃহস্পতি, তার নিজের বউ কোথায় পালাল ঠিক নেই, তিনি তাঁর ছোটভাইয়ের বউকে গর্ভবতী অবস্থায় বলাৎকার করে অন্ধ ছেলে হওয়ার অভিশাপ দিলেন। ভগবান বিষ্ণু বিনা অপরাধে রাহুর গলা কাটলেন। শুধু কি তাই ! আমার দৈত্যঘরের নাতি বলি স্বর্গ অধিকার করেছিল, তাকে বেঁটে বামুনের বেশে ছলনা করে রাজ্য কেড়ে নিলেন বিষ্ণু। অথচ এঁরাই নাকি দেবতা, লোকে তাঁদের ধর্মজ্ঞ বলে জানে। আর জনগণেরও বলিহারি যাই— এইসব দেবতার পেছনে তেল দিয়ে, চাটুকারিতা করে, ধর্মোভাব খুইয়ে দিলে— জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধর্মবাদাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।[২৫]

প্রহ্লাদের মুখে হক কথা শুনে বিশ্বজননী বিচলিত বোধ করেছেন নিশ্চয়ই ; কিন্তু তাই বলে তিনি কোনও অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারেননি। তিনি ঝামেলা-ঝক্কি এড়ানোর জন্য অসুরদের পাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নীতিগতভাবে এ কথাটা মেনে নিয়েছিলেন যে, দেবতারা লোভী। ত্রৈলোক্য রাজ্যে রাজত্ব করেও সেই লোভীদের যে সুখ নেই— সে কথাও তিনি কবুল করেছেন— ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যে' পি ন সুখং লোভচেতসাম্।[২৬]

পৌরাণিক ব্যাসেরা দেবতাদের লোভ-তৃষ্ণা যেভাবে চিত্রিত করেছেন— তার একটা প্যাটার্ন আছে, কিন্তু তাঁদের পথ ধরে আমাদের সাধারণ কবিরা পরম পূজ্য দেবতাদের ওপর এমন রঙ চাপিয়েছেন, যাতে মনে হবে— তাঁরা যেন বড় কোম্পানীর 'একজিকিউটিভ' চাকুরে। পয়সায়, সম্মানে কে কাকে ফেলে আগে যাবে— সেই চিন্তাতেই যেন তাঁরা বিভোর। কবি বলেছেন— যে ব্যাটা গরীব, সে একশ টাকার কাঙাল, যার একশ আছে, সে চায় দশ হাজার, দশ-হাজারী চায় কবে সে লাখপতি হবে, আর লাখপতি ভাবে কবে আমি একটা গোটা রাজ্য পাব। রাজ্য পেয়ে এবং রাজ্য বৃদ্ধি করে যখন একজন চক্রবর্তী রাজা হয়, তখন সে স্বর্গের আধিপত্য চায়। আর একবার স্বর্গাধিপতি দেবরাজ হলে সে চায় কবে ব্রহ্মা হবে। এইভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণুর পদ চায়, বিষ্ণু শিবের পদ চায়— হায় ! দেবতাদেরই যখন এই অবস্থা, লোভ-তৃষ্ণার শেষ পারে কেই বা গেছে তাহলে— ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরি র্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ?[২৭]

গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের সঙ্গে পার্থক্যটা লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই। আমাদের পুরাণকারেরা, ইতিহাসকারেরা, কবিরা মানুষের আদলেই দেবতাদের গড়েছেন। লোভ, হিংসা, কামনা— এই সব মশলা যে শুধুমাত্র মনুষ্য-জীবনেরই উপযোগী নয়— এটা তাঁরা জানতেন এবং জানতেন বলেই মৎস্যপুরাণে স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে যে, জরামরণহীন নিস্তরঙ্গ সৃষ্টি, যা নাকি শুধু সিদ্ধ পুরুষের জন্ম দেবে— তেমন সৃষ্টি কোন কাজের কথাই নয়— নৈবংবিধা ভবেৎ সৃষ্টির্জরামরণবর্জিতা।[২৮] সৃষ্টি হবে এমন, যার মধ্যে শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ দুইই থাকবে। ফলত দেবতা, মানুষ, ঋষি, মুনি কেউই লোভ-মোহ, হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থ-নীচতা বাদ দিয়ে তৈরী হলেন না। মজা হল— এ সব সত্ত্বেও পৌরাণিকেরা, ব্যাসেরা আমাদের দেবতাদের শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন। কেন শিখিয়েছেন— তার কারণও আছে। পৌরাণিকদের মতে— মানুষে আর দেবতায় তফাৎ কিছুই নেই, শুধু বুদ্ধির প্রাধান্য ছাড়া। মানুষের বুদ্ধি কম, দেবতার বুদ্ধি বেশি— বুদ্ধ্যতিশয়যুক্তস্তু দেবানাং কায়মুচ্যতে।[২৯] আমরা এ কথা অস্বীকার করি না, কারণ পৌরণিকদের মত করেই আমরাও জানি যে, বুদ্ধি, ক্ষমতা কিংবা গুণাতিশয্যেই মানুষ দেবতা হয়ে যায়, যেমন কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, চৈতন্য মহাপ্রভু। আধুনিক সমাজেও যাঁদের বুদ্ধি বেশি, ক্ষমতা বেশি, তাঁরাই যেমন সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে যান, কিংবা যাঁদের সর্বাতিশায়ী গুণ আছে বিদ্যা আছে, তাঁরাই যেমন পূজ্যপদে বৃত হন, ঠিক তেমনি সেকালের সমাজেও যাঁদের ক্ষমতা বেশি ছিল, বুদ্ধি বেশি ছিল—তাঁরাই দেবতা হয়ে গেছেন। তাঁরা দেবতা, কারণ আমাদের ভাল-মন্দ দুইই তাঁরা স্বেচ্ছায় করতে পারেন। ইচ্ছে করলে ভালটাও তাঁরা বেশি করতে পারেন, না ইচ্ছে করলে মন্দটাও বেশিই করতে পারেন।

হোমার হেসিয়ড এই নিরিখেই তাঁদের কাব্যে দেবতার চরিত্র এঁকেছেন—ব্যাস-বাল্মীকিও তাই। দ্বিতীয় জন তো রামায়ণের প্রারম্ভ থেকেই সেই আদর্শ মানুষটিকে খুঁজছিলেন, যাঁকে উত্তরকাণ্ডে গিয়ে অবধারিত ভাবে দেবতা বানাতে হয়েছে। কিন্তু গ্রীসদেশের হেরাক্লিটাসের থেকে আমাদের বাস্তব বোধটা এইজন্য একটু বেশি যে, দেবতাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁদের আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরা হোমার হেসিয়ডের ওপরে রেগেই গেলেন। শুধু হেরাক্লিটাস নয়, আরও একজনকে আমাদের এ বিষয়ে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন জেনোফেনিস— সক্রেতিসের পূর্বসূরিদের অন্যতম। জেনোফেনিস নিজে সুন্দর কবিতা লিখতেন, অথচ মহাকাব্যের কবি হোমারের ওপর তিনি একেবারেই প্রসন্ন ছিলেন না। হোমার এবং হেসিয়ডের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে তিনি যা বলেছেন, তা অবশ্য আমাদের প্রবন্ধের পক্ষে খুব জরুরী।

জেনোফেনিস লিখেছেন— হোমার এবং হেসিয়ড দেবতাদের ওপর চুরি, লাম্পট্য, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি সমস্ত কলুষিত আচরণগুলিই আরোপ করেছেন, যা মানব সমাজে লজ্জাকর কিংবা খারাপ বলে পরিচিত।[৩০] গ্রীস দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জেনোফেনিস যা লিখেছেন, আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারত বিশেষত পুরাণের কবিরাও আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে একই কাজ করেছেন। সেই বেদের আমল থেকে বৈদিক দেবতা

ইন্দ্রের মধ্যে যেমন এই চুরি প্রবঞ্চনা এবং লাম্পট্যের সমস্ত উদাহরণ দেখেছি, ঠিক তেমনটিই আমরা দেখেছি ইতিহাস-পুরাণের অবিসংবাদিত নায়ক কৃষ্ণের মধ্যে এবং কি আশ্চর্য, এঁদের সঙ্গে গ্রীস-দেশীয় জিউসের চরিত্রের কোন তফাৎ নেই। হোমার-হেসিয়ড জিউস কিংবা অ্যাপোলোর ওপর যে সব মানবিক কলুষ বা কলংকের আরোপ করেছেন, আমাদের দেশে বাল্মীকি-ব্যাস, বিশেষত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, আমাদের প্রধান প্রধান দেবতাদের ওপর একইভাবে সমস্ত মানবিক স্বভাবই আরোপ করেছেন।

হোমার-হেসিয়ডের ভাব দেখে দার্শনিক জেনোফেনিস মন্তব্য করেছেন— সাধারণ মর্ত্য মানুষেরা ভাবে যে, দেবতাদের জন্ম হয়, তাঁরা মানুষের মতই জামা-কাপড় পরেন, মানুষের ভাষায় কথা বলেন এবং তাঁদের মতই দেবতাদের দেহ-অবয়ব আছে।[৩১]

হায়! জেনোফেনিস আমার পিতৃদেবকে দেখেননি ; দেখলে বুঝতেন, জামাকাপড় পরা কি! রাগানুগা ভক্তির কারণে তিনি মহাভারতের ধুরন্ধর নায়ক কৃষ্ণকে এবং বিশ্বমোহিনী রাধাকে শীতকালে সোয়েটার পরিয়ে রাখতেন এবং সদা গরম জলে স্নান করাতেন, পাছে ওই অতি-অভিসারপ্রিয় যুবক-যুবতীর ঠান্ডা লাগে। তবে এর জন্য রাগানুগা ভক্তি পর্যন্ত যেতে হবে কেন? স্ত্রী দেবতার নাকে নথ পরানো থেকে আরম্ভ করে ঠাকুর দেবতাকে নানা সাজে সাজানো আমাদের চিরকালের অভ্যাস। কুঙ্কুম, চন্দন না পেলে আমরা শেষ পর্যন্ত সখার প্রেমে সখীকে সাজিয়েছি। জেনোফেনিস সেসব রোমান্স বুঝবেন কি করে?

বস্তুত জেনোফেনিসের ধারণা ছিল প্রায় ঔপনিষদিক। তিনি কোন সময়েই দেবতাকে মর্ত্য পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চাননি এবং ব্যঙ্গ করে লিখেছেন— গরু, ঘোড়া অথবা সিংহের যদি মানুষের মত হাত থাকত এবং সেই হাত দিয়ে তারা যদি আঁকতে পারত, তাহলে ঘোড়ারা দেবতাদের চেহারা আঁকত ঘোড়ার মত, গরুরা আঁকত গরুর মত এবং সিংহেরা সিংহের মত। তা ছাড়া, তারা দেবতাদের দেহের আকার তৈরী করত নিজেদের আদল অনুযায়ী, অর্থাৎ গরুরা গরুর মত, ঘোড়ারা ঘোড়ার মত এবং সিংহ সিংহের মত। জেনোফেনিস লিখেছেন— এই যে ইথিওপিয়ানরা বলে— তাদের দেবতারা নাকখাঁদা আর কালোকোলো, কিংবা থ্রোসিয়ানরা বলে— তাদের দেবতাদের চোখ নীল, চুল লাল— এসব কিছুই তাদের নিজস্ব চেহারা আর প্রকৃতি অনুযায়ী। অর্থাৎ ইথিওপিয়ানরা নিজেরা নাকখাঁদা আর কালো বলেই তাদের দেবতাদেরও তারা নাকখাঁদা আর কালো ভাবে, ঠিক যেমন থ্রেসিয়ানরা নিজেরা নীল চোখ আর লাল চুলের অধিকারী বলেই দেবতাদেরও তারা সেইরকম ভাবে।[৩২]

প্রাক-সক্রেতিস যুগে মহামতি জেনোফেনিস যা বলেছেন— আমরা তা জেনোফেনিসের অনেক আগে অনুভব করেছি। ঋক্‌সংহিতার যুগেই বৈদিক ঋষি তর্জনী তুলে শাসন করেছেন— যিনি এই সৃষ্টি করেছেন- তাঁকে তোমরা কিচ্ছুটি বুঝতে পার না, তোমাদের অন্তঃকরণ সেটা বোঝবার ক্ষমতাই পায়নি। ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানা রকম প্রচার করে অর্থাৎ তারা বলে— তিনি এইরকম, তিনি ওইরকম। তারা নিজের প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং নিজের প্রাণের তৃপ্তির জন্যই স্তবস্তুতি করে— নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি।[৩৩] এ কথাটা খুব কম কথা নয়, অন্তত সেই যুগে। ঋষির শাসন থেকে বোঝা যায়— সে

কালেও সাধারণ মানুষেরা নিজেদের বিচার অনুসারেই দেবতার বিচার করত। কল্পলোকের সেই বিচার সহজেই ঢুকে পড়ত স্তবস্তুতির শব্দ-রাশির মধ্যে, অর্থের মধ্যে, ছন্দ এবং মন্ত্রের মধ্যে। অবশ্য, বিশেষ মানুষের আদলে এই যে দেবতার গড়ন, যা সক্রেতিসের পূর্বসূরি জেনোফেনিস ভ্রান্ত বলে ভেবেছেন, তাকে আমাদের দেশের দার্শনিকেরা অনেকে ভ্রান্ত জেনেও স্বীকার করেছেন। এমনকি আমাদের দার্শনিকেরা অনেকক্ষেত্রে দেবতার রূপের সত্যতাও স্বীকার করেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতে জেনোফেনিসের যে ধারনা ছিল, কিংবা যেসব দার্শনিক কথা তিনি ক্ষীণ স্বরে বলতে পেরেছিলেন, সে সব কথা আমরা অত্যন্ত জোরদারভাবে বলে এসেছি খ্রীষ্টপূর্ব নবম/অষ্টম শতাব্দীতে।

খোদ ঋক্‌সংহিতার মধ্যেই আমরা বৈদিক দেবতামন্ডলীর সম্বন্ধে এত মত ব্যক্ত করেছি যে, আসলে পরম দেবতা একজনই, কিন্তু ঋষিরা তাঁকে কেউ অগ্নি, কেউ যম, আবার কেউ বা ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু বলে ডেকেছেন— একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি/ অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।[৩৪] বেদের ভাষাবিদ নিরাক্তকার যাস্ক এই সব একেশ্বরবাদী কথাবার্তা তাঁর তত্ত্বসমীক্ষায় প্রথমেই উচ্চারণ করে নিয়েছেন। কিন্তু তার পরেই মানুষের মধ্যে দেবচিন্তার ধারা বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিকল্পের ব্যবস্থা দিয়েছেন। বলেছেন— এবার দেবতাদের আকার সম্বন্ধে চিন্তা করা হচ্ছে— অথ আকার-চিন্তনং দেবানাম্।[৩৫]

যাস্কের মতস্থিতি বোঝাতে গিয়ে প্রাচীন টীকাকার বলেছেন যে, আত্মবিৎ ব্রহ্মবাদী জানেন— পরমেশ্বর এক এবং নিত্য। তাঁর কোন আকারও নেই। কিন্তু যাজ্ঞিক বৈদিকের কাছে দেবতার একটা আকার নিশ্চয় আছে। যাজ্ঞিকেরা বলেছেন— সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি বৈদিক দেবতার চেহারা আমরা দেখতেই পাই। কিন্তু ইন্দ্র, রুদ্র— এ সব দেবতাদের তো আমরা প্রত্যক্ষ দেখিনি, তাই তাঁদের চেহারাটা ভেবে নিয়েছি দুভাবে। প্রথমত এঁদের আমরা মনুষ্যোচিত কতগুলি শব্দ দিয়ে নামকরণ করেছি— যেহেতু মন্ত্রবর্ণের মধ্যে সেই রকমের মনুষ্যকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত ভেবেছি— বায়ু আকাশ ইত্যাদি শব্দ যেমন এক একটা অনাকার অর্থবিশেষের পরিচায়ক, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ দেবতার রূপকল্পও হয়তো ওই রকম অনাকার অথচ অর্থবহ। এত সব কূট চিন্তায় বিমূঢ় যাজ্ঞিকেরা শেষ পর্যন্ত বলেছেন— ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিন, পর্জন্য— এই সব দেবতাদের রূপ বুঝি বা পুরুষ মানুষের মতই হবে— পুরুষবিধাঃ স্যুঃ।[৩৬]

এইখানটা হয়তো যাজ্ঞিক দার্শনিকের ভাবনাটা গ্রীক দার্শনিক জেনোফেনিসের অভিযোগের শিকার হল। কারণ পুরুষশাসিত সমাজে দেবতারা বেশির ভাগ যে পুরুষ মানুষের মতই হবেন, তাতে আশ্চর্য কি! অবশ্য পুরুষ কথাটা এখানে অত আক্ষরিক অর্থে না ধরাই ভাল। পুরুষ বলতে যাস্ক মানুষই বুঝিয়েছেন, নইলে এর পর man is mortal বললে স্ত্রীলোকের অন্তর্ভুক্তির জন্য woman is mortal বলে আলাদা প্রবাদ তৈরী করতে হবে। যাই হোক, আমার বক্তব্য— দেবতাদের আকার নিয়ে একটা চিন্তা চলেছে পাণিনিরও পূর্বযুগে, কিন্তু অপরপক্ষে একথাও ঠিক যে, খোদ ঋক্‌সংহিতার যুগেও আমরা এরকম ভ্রান্ত ছিলাম না যে একক পরমেশ্বরের কথা আমরা জানতাম না। বরঞ্চ আমাদের তত্ত্বটা জেনোফেনিসের চেয়েও গভীরে। আমরা যা করেছি, জেনেশুনেই করেছি। আমাদের ঈশ্বর যেহেতু সর্বক্ষম ঈশ্বর, তাই তাঁকে দিয়ে করিয়ে

নিয়েছি। যাজ্ঞিকেরা খোদ বেদের মধ্যে দেবতাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, কেলি-কলা-কূতূহল— সবই ব্যক্ত করেছেন। পুরাণ ইতিহাসের আমলে তো দেবতারা যা-ইচ্ছে-তাই শুধু নয়, একেবারে যাচ্ছেতাই কান্ডকারখানা করেছেন, এবং সাধারণ মানুষেরাও যে তাঁদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করেছেন, তার কারণ— মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা নিজেরাই দেবতাদের দিয়ে মানুষের ইচ্ছাপূরক ব্যবহার করিয়েছেন। এর ফল হয়েছে অনেক রকম।

প্রথম ফল— বৈদিক দেবতাদের কাছে শত শত চাহিদা এবং তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপনিষদের যুগে আমরা ভয়ংকর জ্ঞানকান্ডী হয়ে উঠেছি। বৈদিক দেবতাদের প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমরা একান্ত আত্মবিৎ হয়ে উঠেছি। দ্বিতীয় ফল—উপনিষদের সর্ব-ব্রহ্মবাদী প্রতিক্রিয়ায় আমরা আমাদের অভীষ্টদায়ী দেবতাদের প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। উপনিষদের মুনিরা প্রায় সবাই ব্রহ্মকে স্ত্রী-পুরুষের চিহ্নরহিত এক জোতিঃস্বরূপে মেনে নিয়েছিলেন। তবু এরই মধ্যে দু-একটি তত্ত্বদর্শী আরণ্যক মুনি ছিলেন যাঁরা ব্রহ্মকে এখানে সেখানে একটি মানুষের আদলে কল্পনা করেছেন। তাঁরা ব্রহ্মকে নির্বিশেষ, নিরাকার না ভেবে সাকার, সবিশেষ কল্পনা করেছেন। এমনকি রসস্বরূপ ব্রহ্মের কল্পনায় তাঁরা এতদূর ভেবেছেন যে, তাঁর একা একা ভাল লাগে না— একাকী ন রমতে—তাঁর দ্বিতীয় একজনের সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে। এই ইচ্ছায় নাকি শেষ পর্যন্ত একাকী ব্রহ্মকে নারী-পুরুষ হয়ে জন্মাতে হয়েছে।[৩৭]

এই সাকার ইচ্ছাময় ব্রহ্মের সূত্র ধরে পুরাণ-ইতিহাসের যুগে আমরা আবার এক শ্রেণীর দেবতা পেলাম— যাঁদের মধ্যে বৈদিক দেবতাকুলের মনুষ্যধর্মিতাও আছে, আবার উপনিষদের চরম তাত্ত্বিক মাহাত্ম্যও আছে— অথচ তাঁরা মানুষের দেহ এবং মনের খুব কাছাকাছি। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়— এই দেবতাদের মন পেতে যাজ্ঞিকদের কঠিন ক্রিয়াকলাপ, বিচিত্র মন্ত্রবিধি লাগে না, আবার উপনিষদের চরম তাত্ত্বিক জ্ঞান, সূক্ষ্ম ভাবনাবৃত্তিও লাগে না। এ এক এমন ঈশ্বর, যাঁর সম্বন্ধে প্যাসকাল লিখেছেন— God of Abraham, Issac and Jacob, not of the philosophers and scholars.[৩৮] এতে আমাদের সুবিধে এই যে, যখন তখন একজন নামী দেবতার মাথায় ব্রহ্মের টোপর পরিয়ে দেওয়া যায়, যদিও মনুষ্যলোকের ভক্তির টানে এঁরা একেবারেই মানুষের আদলে মানুষের মধ্যেই দেখা দেন। মানুষের মতই একটা স্বয়ং ভগবান প্রাপ্তি হওয়ার ফলে সিদ্ধ মহাপুরুকেরা বৃন্দাবনের নন্দরাজার ঘরের দুয়োরে পরমব্রহ্মকে দেখতে পেয়েছেন— অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম[৩৯],— অথবা এই পরব্রহ্মকে যমুনার কুঞ্জবনে অল্পবয়সী মেয়েদের পেছনেও লাগতে দেখা গেছে— গোপবধূটিবিটং ব্রহ্ম।

॥ ৪ ॥

সত্যি কথা বলতে কি, বিপদটা শুরু হয়েছে সেই বেদের আমল থেকেই। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা ইষ্ট দেবতাদের মধ্যে মানুষের প্রাত্যহিক আবেশ দেখতে পেয়েছেন এবং সেই কারণেই পিতামহের প্রশ্রয়ে দেবতাদের দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নিয়েছেন। জগতের

চৈতন্যস্বরূপ সূর্যকে তাঁরা লাল চেলি-পরা সুন্দরী উষার পেছন পেছন ঘুরতে দিয়েছেন, ঠিক যেমন যুবক পুরুষটি যুবতী মেয়ের পেছন পেছন ঘোরে— মর্যো ন যোষাম্ অভি এতি পশ্চাৎ।[৪০] ঋষিরা দশ জালা সোমরসের টোপ সামনে রেখে বায়ু দেবতা আর ইন্দ্রকে দিয়ে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত একজনকে জয়ী ঘোষণা করে সোমরসের বিশাল পানপাত্রখানি উপহার হিসেবে তুলে দিয়েছেন বায়ু দেবতার হাতে। এই সোমরসের ভাগাভাগি নিয়ে বিভিন্ন দেবতার মধ্যে কলহেরও সূত্রপাত ঘটিয়েছেন বৈদিক ঋষিরা। আপন কার্য সাধনের জন্য মন্ত্রবর্ণের মধ্যে আগাম পানপাত্রের ব্যবস্থা করে ঋষিরা একেবারে আধুনিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন— অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে সৃজামি সৌমং মধু[৪১]— তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও, তার জন্য আগেভাগেই এই সোমরসের মধু বানিয়ে রেখেছি আমি। (তা, এসব জিনিস তো একা একা ভাল লাগে না), তুমি তোমার দেবতা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গেই এস— মরুদ্ভিঃ অগ্ন আগহি। রাজার রাজা ইন্দ্রকে দিয়ে যাজ্ঞিকেরা যেমন অসাধারণ সব যোদ্ধৃকর্ম করিয়েছেন, তেমনি তাঁকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার উপযুক্ত উপভোগ থেকেও বঞ্চিত করেননি। পৌনঃপুনিক সোমপান থেকে আরম্ভ করে নারীহরণ, পরনারীসম্ভোগ পর্যন্ত সমস্ত উপচার আর অধিকার ইন্দ্রেরই দখলে।

অন্তরীক্ষলোকের এই দেবতাদের ওপর বৈদিক ঋষিদের এমনই এক অকৃত্রিম স্নেহ ছিল যে তাদের জন্ম-কর্ম, সাহস, প্রেম এমনকি অসভ্যতাগুলিও তাঁরা পিতামহের প্রশ্রয়ে দর্শন করেছেন। গৃহস্থের অনেকগুলি সন্তান থাকলে তাদের মধ্যে যেমন বড় ছোট মেজোর ভাগ তৈরি করা হয়, দেবতাদের মধ্যেও সে ভাগ আছে। বৈদিকেরা নিশ্চয়ই বলবেন যে,—বাপু হে! ওসব ভাগ সৃষ্টি হয়েছে দেবতাদের ক্ষমতা, ওজস্বিতা এবং যজ্ঞভাগ নিশ্চয়ের কারণে। আমরা বলি—তা হোক। কিন্তু ভাগটি তো তৈরি হয়েছে গেরস্থের আদলেই। এমনকি অনেকগুলি ছেলের মধ্যে যার সম্বন্ধে আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলি—এমন ছেলে আর হয় না, জন্মের সময় থেকেই ওর বুদ্ধি একেবারে প্যাকা, তেমনই আমরা ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলেছি—জন্মমাত্রেই যিনি সবার চাইতে বুদ্ধিমান অথবা জন্মমাত্রেই যিনি দেবতাদের প্রধান, তিনিই ইন্দ্র—যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্।[৪২]

দেবতার পরিবারে ইন্দ্র একেবারে প্রশ্রয়-পাওয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মত। যেমন তাঁর শারীরিক শক্তি তেমনই মানসিক ক্ষমতা, তেমনই তাঁর ভোগবিলাস। একদিকে তিনি যেমন "ওজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমঃ",[৪৩] অন্যদিকে তাঁর জন্য বৈদিক ঋষিরা যে পরিমাণ সোমরস এবং স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা করেছেন, তাকে লায়েক ছেলের ওপর প্রশ্রয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ভাবুন একবার—বৈদিক ঋষিরা এমন বিপুল পরিমাণ সোমরস ইন্দ্রের উদ্দেশে সমন্ত্র নিবেদন করেছেন যে, ইন্দ্রের পেটটি সমুদ্রের মত ফুলে উঠেছে। শত বা সহস্র সোমলতার নির্যাস অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে ইন্দ্রের আনন্দের জন্য প্রস্তুত করা হয়, আর তাতেই তাঁর পেট ফুলে ওঠে জয়ঢাকের মত—সং যন্মদায় শুষ্মিণ এনা হ্যস্যোদরে। সমুদ্রো ন ব্যচো দধে॥[৪৪]

সমাজের উচ্ছন্ন যুবকটি মদ খেয়ে পেট ফোলালে আমরা বলি জয়-ঢাক, আর ঋষিরা বলেন সমুদ্র। তা হোক, বড় ছেলে, কৃতী ছেলে, কত দাস-দস্যু, অহি-বৃত্র-শম্বর মেরে সপ্ত সিন্ধুর ধারা মুক্ত করেছেন, আকাশ-পর্বত ফাটিয়ে জল এনেছেন বসুন্ধরায়,

সেই দেবতাকে তো একটু ভোজ্য-পান দিতেই হবে। তার ওপরে ইন্দ্র হলেন গিয়ে দেবতাদের সেনানী এবং রাজা, মেজাজটাও তাঁর 'মিলিটারি'। ফলে মনুষ্যলোকের ঋষিরা একদিকে যেমন তাঁর উদ্দেশ্য সবচেয়ে বেশি স্তুতিপাঠ করেছেন, তেমনই সোমরসেরও ব্যবস্থা করেছেন।

তবে মজা হল, মনুষ্যলোকে যেমন একটি লোভনীয় বস্তু সামনে রেখে দুটি অপরিণত বালককে প্রলোভিত করে তাদের দিয়ে আমরা রীতিমত দৌড় করাতে পারি, ঠিক তেমনই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি—সোমরসের পাত্র সামনে রেখে দেবতাদের দৌড়-প্রতিযোগিতা হচ্ছে। মনে রাখবেন—এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে সোমাহুতির জন্য যে যুগল-দেবতার হোমগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে ঐন্দ্রবায়ব—মানে ইন্দ্র এবং বায়ুর উদ্দেশ্যে যে হোমটি হবে, তার জন্যই এই সোম-প্রতিযোগিতার গল্প বলেছেন ঋষিরা। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রামাণ্য বেদের মতই, কারণ বৈদিকদের মতে বেদ বলতে বেদও বোঝায় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতেও বোঝায়—মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ম্।

তো ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যাচ্ছে—সোমপানের জন্য দেবতারা সব এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন। ইনি বলছেন—আমি আগে খাব, উনি বলছেন—আরে তুই নয় আমি। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করা গেল না যে কে আগে সোম পান করবেন। তারপর দেবতারা সবাই মিলে ঠিক করলেন—বেশ, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ধরা যাক, আমরা সবাই সেই লক্ষ্যের দিকে দৌড়োব, যে জিতবে, সেই প্রথম সোমপানের অধিকার পাবে।[৪৫]

দেব-দৌড় শুরু হল ; কিন্তু প্রতিযোগিতায় যা হয়, সব হিসেব-নিকেষ উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়। এমন যে সেনানায়ক তথা অশেষ সমর-বিজয়ী ইন্দ্র, তিনি বায়ু দেবতার কাছে হেরে গেলেন। প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে প্রথম পৌঁছোলেন বায়ু, তারপর ইন্দ্র, তারপর মিত্র ও বরুণ এবং তারও পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

যে ইন্দ্র তিন ভুবনের রাজা—ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনাম্, ঋষিরা যাঁকে স্তব করে বলেন—শক্তি বা বল থেকেই তোমার জন্ম—ত্বমিন্দ্র বলাদধি—সেই ইন্দ্র কিনা বায়ুর কাছে দৌড়-প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেন! তাও কি, এ তো যে সে প্রতিযোগিতা নয়, সোমপানের জন্য প্রতিযোগিতা!

সোমরস দেখলে পরে দৌড়ে যাওয়াটা ইন্দ্রের অভ্যাসের মধ্যে ছিল। নিরুক্তকার যাস্ক, যিনি খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে বৈদিক কোষ লিখে নিরুক্তকে বেদাঙ্গের মধ্যে স্থান করে দিতে পেরেছিলেন, সেই যাস্ক ইন্দ্র শব্দের মূল খুঁজতে গিয়ে অনেক বিকল্পের মধ্যে একবার বলছেন—'ইন্দবে দ্রবতীতি বা'।[৪৬] অর্থাৎ ইন্দু বা সোমরস দেখলে পরে যিনি দৌড়ে যান, তিনি ইন্দ্র। কাজেই সারা জীবন সোমরসের জন্য দৌড় করেও যে ইন্দ্র বায়ুর কাছে হেরে গেলেন, সেই ইন্দ্রের আর মান-সম্মান রইল না দেবসমাজে।

কিন্তু মজাটা কি জানেন—ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা, তিনি ভাঙেন তবু মচকান না। সেকালে ফোটো-ফিনিশে প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্তটি ধরে রাখার প্রশ্ন ছিল না ঠিকই, তবে ইন্দ্র বোধহয় বায়ুর পরপরই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছেছিলেন। ইন্দ্র যখন বুঝলেন বায়ুই সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন, তখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যাচ্ছে ইন্দ্র বায়ুর পেছনে পেছনে গিয়ে বললেন—এই প্রতিযোগিতায় আমরা যুগ্ম-জয়ী, তাই না?

তমনুপরাপতৎ সহনাবথোজ্জয়াবেতি।[৪৭]

বায়ু বললেন—কেন বাপু! আমি একা যেখানে জয়ী হয়েছি, সেখানে আবার তুমি ঢুকে পড়ছ কেন? ইন্দ্র দেখলেন বায়ুর মন গলছে না। তিনি বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, যুগ্ম-জয়ী নাই হলাম, জয়ের এক তৃতীয়াংশটা অন্তত আমার হোক, তাহলেও তো বলা যাবে—আমাদের একসঙ্গে জয় হয়েছে।[৪৮]

বায়ু তাতেও রাজি হলেন না। বললেন—আমি প্রথমে লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছি, আমি একাই জয়ী। ইন্দ্র বললেন—আচ্ছা বেশ, জয়ের এক চতুর্থাংশ না হয় আমার নামে চিহ্নিত হোক। তাতেও অন্তত আমাদের একসঙ্গে জয় লাভ করা হবে।

বায়ু এবার রাজি হলেন। হাজার হোক, ইন্দ্র যখন দেবতাদের রাজা, সেনানী এবং প্রধান। প্রতিযোগিতার সম্মান-বন্টনে তাঁকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না। ফলে ঋষিরা যখন ভোরবেলায় সোমাহুতির পর ইন্দ্র-বায়ব নামে দুই দেবতার হোম করেন, তখন ঐন্দ্র-বায়ব গ্রহ থেকে অর্ধেক সোমরস নিয়ে প্রথমে বায়ুর উদ্দেশে দেন। পরে অন্য অর্ধাংশ থেকে বায়ু এবং ইন্দ্র—দুজনের উদ্দেশেই হোম করেন। ইন্দ্রের ভাগ এখানে এক-চতুর্থাংশমাত্র।[৪৯]

তাহলে দেখুন, তুচ্ছ সোমপানের জন্য এই যে দেবতাদের দিয়ে দৌড় করিয়েছেন ঋষিরা অথবা সেবসমাজে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব বারবার ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার বাস্তব মুহূর্তে তাঁকে যে হেরে যেতে হল অথবা হেরে যাবার পরেও বহুকীর্তিত যশস্বী ব্যক্তি যে তাঁর হেরে যাওয়াটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন না—এগুলি একেবারে মনুষ্যসমাজের আদলেই বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে প্রতিচ্ছায়ার মত নেমে এসেছে। তা যদি না হত, তাহলে জগতের আদিভূত জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যকে একটি রোমাঞ্চিত মনুষ্যযুবকের মত লাল-চেলি-পরা সুন্দরী উষার পেছন পেছন ঘুরতে দেখতাম না—সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষাম্ অভ্যেতি পশ্চাৎ। ঋষিরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রভাতের রক্তিম উষা যেমন অভিসারিকার সত্তায় চিহ্নিত, তেমনই তমঃশেষের আদিত্যবর্ণ দেব-পুরুষটিও প্রেমে-পড়া মনুষ্যযুবকের রসাপ্লুতিতে অঙ্কিত। ঋষি পিতামহের প্রশ্রয়ে উষাকে সম্বোধন করে বলেছেন—দেবি! তুমি কুমারী কন্যার মত শারীরিক সৌন্দর্য বিকাশ করে দীপ্তিমান সূর্যের কাছে যাও। যুবতীর মত দীপ্তিমতী হয়ে স্মিতহাস্যে তুমি তোমার বক্ষোদেশ অনাবৃত কর তার সামনে—সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদাবি র্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী।[৫০]

বেদ থেকে এইরকম শৃঙ্গারসিক্ত মন্ত্র আমি আরও উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু তার দরকার কি? আমার বক্তব্য দেবতারা মানুষের আদলেই ঋষির দর্শনে ধরা দিয়েছেন। মানুষের শক্তি, মানুষের অবয়ব, মানুষের ভালবাসা, এমনকি মানুষের অভব্যতা বর্ণনা করার জন্য আমরা যে সব শব্দরাশি ব্যবহার করি, ঋষিরাও সেই ভাবেই মন্ত্র দর্শন করেছেন, সেইভাবেই দেবতাদের চরিত্র নির্ণয় করেছেন। একদিকে যেমন চরম স্থূলভাবে আমরা দেবতাদের জিভ দিয়ে চেটে চেটে সোমরসের আস্বাদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছি—গৃভায় জিহ্বয়া মধু, তেমনই পরম সূক্ষ্মভাবে সেই দেবতাদের মধ্যে চরাচর ব্যাপ্ত পরম উপলব্ধি করেছি। মাতাল পানশৌন্ড ব্যক্তি হা-হা করে হেসে বলে—আমার জন্মের সময় আমার মা মুখে মধু না দিয়ে মদ দিয়েছিলেন, ঋষিরা এই সাবলীল রসিকতা জানতেন। তাঁরা বলেছেন—ইন্দ্র! তুমি জন্মেই পাহাড়ী

সোমলতার রস চেখেছিলে, কেননা তোমার মা যুবতী অদিতি তোমাকে স্তন্যদানের আগেই তোমার মুখে সোমরস সিঞ্চন করেছিলেন—তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতু র্দম আসিঞ্চদগ্রে। [৫১]

এই রসিকতার সঙ্গে এও জানি যে, আমরা এই দেবতাকে আমাদের একান্ত স্বার্থসাধনের জন্য, অন্নপানের জন্য, আমাদের শত্রুপাতনের জন্য বারবার স্তুতি করি। বারবার ব্যবহার করি। নিজেদের অফুরন্ত স্বার্থের মধ্যে সেই দেবতার জন্য আমাদের মায়াও আছে। মাঝে মাঝে তাকে বলি—এইটুকু খেয়ে বাড়ি যাও ভাই, বাড়িতে তোমার কল্যাণী বধূটি আছেন, নৃত্যগীতের আয়াসটুকু আছে, তুমি রথে করে বাড়ি যাও ভাই—অপাঃ সোমমস্তামিন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে। [৫২]

এমন করে মানুষের মায়া, মানুষের ভালবাসা, মানুষের রসিকতায় যে দেবতাদের আমরা অহরহ বেঁধে ফেলেছি, পরম তত্ত্ব এবং দর্শনের ভাবনায় হঠাৎ করে তাঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে—তুমি আমাদের পরম উপাস্য দেব, অতএব পরম গম্ভীর, অতএব সমস্ত লঘুতা রসিকতার তুমি ঊর্ধ্বে—এমন ভাব পোষণ করা কোন কালেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বস্তুত বেদের সাহিত্যে যে সমস্ত দেবতাদের কাছ থেকে গৃহ-জায়া-ভৃত্য-ধন—এত শত পেয়েছি, সেই পাওয়ার জন্যই তাঁদের হাজারবার পিতা, দাতা, আশ্রয় বলে স্তুতি করেছি নিশ্চয়, কিন্তু পাওনা-গণ্ডা মিটে যাবার পর লঘু অবসরে কতবার যে তাঁদের 'সখা' বলে ডেকেছি, কতবার যে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছি—রসিকতার পূর্বে সেই সম্বন্ধটুকুও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

একই বৈদিক সূক্তের মধ্যে যেখানে দেবতার মহাশক্তিসূচক সম্বোধন অথবা স্তুতিবাচক শব্দ আটটা-নটা আছে, সেই একই সূক্তের শেষে সেই উদগ্র-বীর দেবতার সখ্য-সম্বন্ধটি পাকা করে নিতে কিন্তু ঋষিরা ভোলেননি। বলেছেন আমাদের সঙ্গে তোমার সখ্যভাব যেন মঙ্গলকর হয়—অস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি। আর সেই সখ্য শুধু একদিক থেকে নয়—অর্থাৎ আপনি বলতে পারবে না—এত দিচ্ছে, তাই আমরা দেবতার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে চাই, এই সখ্য-সম্বন্ধ দুই দিক থেকেই আছে।

একটি বৈদিক সূক্তের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অগস্ত্য ঋষি আর ইন্দ্র দুজনেই কথা বলছেন। অগস্ত্য বলছেন—ইন্দ্র! তুমি কি আমাদের মেরে ফেলতে চাইছ? অন্য দেবতাদের সঙ্গে তুমি তোমার যজ্ঞভাগ নাও। উত্তরে ইন্দ্র বলছেন—আরে ভাই অগস্ত্য! তুমি আমাদের বন্ধুলোক হয়ে আমাদের টপ্‌কে যাবার চেষ্টা করছে কেন বাপু—কিং নো ভ্রাতরগস্ত্য সখা সন্নতি মন্যসে। [৫৩] এই ঋক্-মন্ত্রগুলির আগে কিম্বা পরে অগস্ত্যের দিক থেকে শরণাগতির কথা যেমন আছে, তেমনই দেবতার দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি—উপাস্য এবং উপাসক একই অমৃত-যজ্ঞের প্রস্তুতিতে অংশ নিয়েছেন—তত্রামৃতস্য চেতনং যজ্ঞং তে তনবাবহৈ। [৫৪]

উপাস্য আর এই উপাসকের মধ্যে এই সখ্য-সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধ উপনিষদের পরম সূক্ষ্ম জ্ঞান-সাধনার পথ বাহিত হয়ে অন্য এক ধারায় ইতিহাস-পুরানের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। এই সাধনার চরম বিন্দু হল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রস।

বৈদিক দেবতাদের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপেরই জের এসে পড়েছে ইতিহাসে, পুরাণে। মহাভারত, রামায়ণ এবং অন্যান্য প্রাচীন পুরাণগুলিতে দেবতারা বারবার নেমে

এসেছেন মানুষের কর্মভূমিতে। এই সময় থেকে মর্ত্ত্য রাজা-মহারাজা কিংবা ঋষিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, চলাফেরা বেড়ে গেছে। তাঁদের যে কোন আপদ-বিপদে, আনন্দে দেবতারা যে প্রত্যক্ষভাবে শুধু অংশ নিচ্ছেন- তাই নয়, মর্ত্ত্যভূমির সুন্দরী রমণীদের দেখে তাঁরা স্বর্গসুন্দরীদের মোহ পর্যন্ত ত্যাগ করছেন। এমনকি পৃথিবীর পরিসরে মনুষ্য-রমণীদের গর্ভে তাঁদের দু-একটি ছেলেপুলে থাকবে— এই ভাবনাও তাঁদের রোমাঞ্চিত করত। সোজাসুজি মানুষের ঘর থেকে পুলকিত প্রেমের আহ্বান আর কটা আসত ? এক কুন্তী ছাড়া এরকম আহ্বান দু-চারটি বৈ নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেবতারা নিজেরাই মনুষ্যরমণীর রূপে এতই মোহিত ছিলেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের হিতাহিত জ্ঞানের পরিচয় থাকত না। বিশেষত স্বর্গের রাজা ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যা এবং আরও কয়েকটি মনুষ্যরমণীকে এমন কৌশলে ধর্ষণ করেছেন যে, মর্ত্ত্যের ঐতিহাসিক বেদব্যাস মহাভারতে তাঁর উপাধি দিয়েছেন— ইন্দ্রস্তু রতিলম্পটঃ। শুধু ইন্দ্র কেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অহল্যাকে মনুষ্য-ঋষি গৌতমের হাতে সঁপে দেওয়ায় সমস্ত দেবকুলেই যে হতাশার ছায়া নেমে এসেছিল, সেকথা রামায়ণের কবি বাল্মীকিও লক্ষ করেছেন— আসন্নিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তয়া। অন্যদিকে বায়ুদেবতা বানরী রমণী অঞ্জনার বুকের কাপড় এমনভাবে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, তাতে বিদগ্ধ বাল্মীকি পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছেন। বেদের দেবতা এবং মহাভারত-রামায়ণের দেবতাদের কীর্ত্তিকলাপ দেখে পুরাণগুলি পরিস্কার বুঝতে পেরেছে যে, স্বর্গের দেবতারা যতই চতুর্বাহু, সহস্রবাহু আর সহস্রলোচন বলে কীর্ত্তিত হোন না কেন, তাঁদের আসল চেহারা মানুষের মতই। বায়ুপুরাণ তো পরিস্কার বলেই দিল যে, দেবতাদের সমস্ত লক্ষণ মানুষেরই মত এবং এ হিসেব সাধারণের মনগড়া হিসেব নয়, তত্ত্বদর্শী ঋষিমুনিরাই তাঁদের এইভাবে দেখেছেন। বায়ুপুরাণ বলেছে— মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অবয়বসংস্থান ঠিক যেমনটি, দেবতাদের শরীর, অবয়বসংস্থানও ঠিক তেমনটিই এবং এটাই ঋষিদের তত্ত্ববোধ এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তে প্রতিভাত—

মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ।
তল্লক্ষণং তু দেবানাং দৃশ্যতে তত্ত্বদর্শনাৎ। [৫৫]

দেবতাদের সমস্ত লক্ষণ যেখানে মানুষের মত, সেখানে ভগবানকে শুধু মানুষের মত দেখতে হবে— এইটুকুই নয়, তাঁদের আচার-ব্যবহারও মানুষের মত হবে- এটাই স্বাভাবিক। বিপদের শুরু কিন্তু এইখান থেকেই। কবিরা, দার্শনিকেরা ব্যক্তি ভগবানের সমস্ত মাহাত্ম্য তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করে নিয়েও ভগবানের ওপর চাপিয়ে দিলেন মনুষ্য ব্যবহারের নানান দিক— মানুষের শৈশব, তার বাল্যচপল ভঙ্গী, তার যৌবন এমনকি লাম্পট্যও। পুরাণকারেরা যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বায়ু-কাউকেই বাদ দিলেন না, সেখানে কবিরা রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণগুলির মধ্যে বর্ণিত দেবচরিত্রের সূত্র ধরে দেবতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অতি মধুর তথা চটুল কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। কোথাও কোথাও সে কবিতা রসসৃষ্টির চূড়ান্ত উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে, মূলত তার মধ্যে রসিকতার অংশই বেশি।

রসিকতা জিনিসটা এমনই যে, রসিকতা করতে করতে তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। যে কবি শিব কিংবা কৃষ্ণজীবনের ব্যক্তিগত ঘটনা নিয়ে সুন্দর রসসৃষ্টি করলেন, অন্য কবি তারই জের টেনে এমন রসিকতা করলেন যে, তাকে রস না বলে রসোদ্গার

বলাই ভাল। এইসব রস, ঠাট্টা-মস্করার শেষ পরিণতি হল আঞ্চলিক প্রবাদ, যা কোন কোন মহান দেবতা কুলের মান একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এই যে, তবু দেবতারা স্বমাহাত্ম্যে, সগর্বে মানুষের উপাসনা-মঞ্চে সমাসীন এবং অত্যন্ত লীলায়িত ভঙ্গিতে সমাসীন। পাশাপাশি সরস রঙ্গ এবং কুরস ঠাট্টা-তামাশা তাঁদের ওপরে সমানভাবে বর্ষিত হলেও তাঁরা অবিচল, এবং নিজেদের কিছু দোষ আছে বলেই হোক অথবা অত্যন্ত রসিক বলেই হোক— এই সব ঠাট্টা-তামাশায় হিন্দুকুলের দেবতারা কিছু মনে করেন না, অথবা সাধারণ মনুষ্যকুলের কোন ক্ষতিও করেন না। স্বয়ং রাজশেখর বসু তাই সাহস করে লিখেছেন— ব্রহ্মা গড ও আল্লা— এঁদের মেজাজ একরকম নয়। ঠাট্টা তামাশায় কোন হিন্দু দেবতা চটেন না। ব্রহ্মার তো কথাই নেই, তিনি সম্পর্কে সকলেরই ঠাকুরদাদা। (তিন বিধাতা)

কবিদের রঙ্গ-রসিকতা বোঝার জন্য আপনার প্রধান কতর্ব্য। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা পুরাণগুলির বিভিন্ন স্থলে দেবতাদের যে সব কীর্ত্তিকলাপ আছে সেগুলি আপনাকে অনুপুঙ্খ জানতে হবে, জানতে হবে দেবতাজীবনের রতি-বিলাস, কলহ, ঈর্ষা, ক্রোধ, মমতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছুই— কেননা এইগুলিই পরবর্ত্তী কবিদের ইন্ধন।

সূত্র

১ বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্য-ভাগবত', ২· ৮· ২৩৫-২৩৭
২ হাল, 'গাথা-সপ্তশতী', ২· ১২
৩ যশোদা—অজ্জ দুদ্ধমুহস্‌স বৎসস্‌স কো কখু দাণীং উব্বাহে ওসরো।
মধুমঙ্গলঃ—(অপবার্য্য) বয়স্‌স সচ্চং দুদ্ধমুহোসি জং দুদ্ধলুদ্ধাইং গোবকিশোরীসহস্‌সাইং তুজ্‌ঝ মুহং পিঅন্তি।
রূপ গোস্বামী, বিদগ্ধমাধব, ১· ৩৯·, পৃ. ৩৯.
৪ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', কারিকা ১, আরম্ভ-শ্লোক, পৃ. ৪.
৫ 'শ্রীচৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্', ভক্তিগীতি, পৃ. ৩১৩-৩১৫
৬ Fredrick Copleston, *A History of Philosophy,* Vol. I: Pt. I P. 54
৭ তদেব, পৃ. ৫৪
৮ 'দেবীভাগবত পুরাণ' ৪. ১৩. ৫৫
৯ তদেব, ৪. ১৩. ৪
১০ তদেব, ৪. ১৩. ১০
১১ তদেব, ৪. ১৩. ১৪
১২ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্', ১০. ৩৩. ২৯
১৩ 'দেবীভাগবত পুরাণ', ৪· ১৩· ১৬
১৪ তদেব, ৪. ১৩. ১৯
১৫ তদেব, ৪. ১৩. ১৯-২০
১৬ 'ভগবদ্গীতা', ৮. ১৮-১৯
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনো'র্জুনঃ।
সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং...
এই হিসাবে সত্য-ত্রেতা ইত্যাদি চতুর্যুগ সহস্রবার গত হলে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এই পরিমাণে একশ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু।
১৭ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'চৈতন্য-চরিতামৃত', ২. ২১. ৬১

১৮ তদেব, ২. ২১. ৬৫
১৯ 'দেবীভাগবত পুরাণ', ৪. ১৫. ৪৫
২০ তদেব, ৪. ১৫. ৫০
২১ তদেব, ৪. ১৫. ৫১
২২ তদেব, ৪. ১৫. ৫২
২৩ তদেব, ৪. ১৫. ৫৭
২৪ তদেব, ৪. ১৫. ৫৮
২৫ তদেব, ৪. ১৫. ৬৪
২৬ তদেব, ৪. ১৫. ৬৮
২৭ 'সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগার', ৭৭. ৫০
২৮ 'মৎস্য-পুরাণ', ৪. ৩১
২৯ 'বায়ু-পুরাণ', ৫৯. ১৪
৩০ G. S. Kirk & J. E. Raven, *Pre-socratic Philosophers*, P. 168, Fn. 169.
৩১ তদেব, P. 168, Fn. 170
৩২ তদেব, P. 168, Fn. 171
৩৩ 'ঋগ্-বেদ সংহিতা', ১০. ৮২. ৭
৩৪ 'ঋগ্-বেদ সংহিতা', ১. ১৬৪. ৪৬
৩৫ যাস্ক, 'নিরুক্তম্', দৈবতকাণ্ড, পৃ. ৩৫৩
৩৬ তদেব, পৃ. ৩৫৪
৩৭ "স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। ...স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম...।"
'বৃহদারণ্যক উপনিষৎ', পৃ. ১৯১
৩৮ Hugo Rahner, The Christian mysteries and Pagan mysteries, p. 359. In 'The Mysteries'.
৩৯ 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্', পৃ. ২২.
৪০ 'ঋগ্-বেদসংহিতা', ১. ১১৫. ২
৪১ তদেব, ১. ১৯. ৯
৪২ তদেব, ২. ১২. ১
৪৩ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', ৩. ১
৪৪ তদেব, ১. ৩০. ৩
৪৫ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', পৃ. ২৩ খ
৪৬ যাস্ক, 'নিরুক্তম্', পৃ. ৪৩৬
৪৭ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', পৃ. ২৩খ
৪৮ তদেব, পৃ. ২৩ খ
৪৯ "তত্ তৃতীয়ভাগ্ ইন্দ্রো'ভবত্, ত্রিভাগ্ বায়ু স্তৌ সহৈবেন্দ্রবায়ু উদজয়তাং...।"
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পৃ. ২৩ খ
৫০ 'ঋগ্-বেদসংহিতা', ১. ১২৩. ১০
৫১ 'তদেব, ৩. ৪৮. ২
৫২ তদেব, ৩. ৫৩. ৬
৫৩ তদেব, ১০. ১৭০. ৩
৫৪ তদেব, ১. ১৭০. ৪
৫৫ 'বায়ুপুরাণম্', ৫৯.৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবতা এবং স্বর্গের ঠিকানা

॥ ১ ॥

বস্তুত ছলনা, বঞ্চনা, হিংসা, ধর্ষণ—এগুলি ন্যায়, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম, ভালবাসার বিপরীতঃ কোটিতে অবস্থান করলেও এই সমস্ত বৃত্তিগুলিকেই আমি সুস্থ সমাজের লক্ষণ বলে মনে করি। অবশ্য আমার কথাগুলি একটু বিশদ অর্থে বোঝা দরকার। আদর্শ যে সমাজটি আমাদের একান্ত কাম্য, তাতে লোভ, হিংসা-দ্বেষ, তঞ্চকতা—এগুলি থাকবে না এটা অস্বাভাবিক। অর্থাৎ এই অসদ্‌বৃত্তিগুলি পরিহার্য হলেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পরিহার্য এক কথা, আর শূন্যতা আরেক কথা। সমাজে এই জঘন্যবৃত্তিগুলি যদি একটুও না থাকে, সেই সমাজে বিরোধী দলের গণতান্ত্রিকেরা যতই আবাস-কল্পনা করুন, আমি সেই সমাজে থাকতে চাই না। আমাদের বাপ-পিতামহ ব্রাহ্মণ-ঋষি, ক্ষত্রিয়-রাজা এবং দেবতারাও কেউ সেই সমাজের বাসিন্দা হতে চান না।

আমাকে আধুনিকমনা অনেকে—অনেকে যাঁরা প্রাচীন দেবতা, ঋষি বা ব্রাহ্মণমাত্রকেই শুদ্ধ ধর্মপুরুষ বলে মনে করেন, তাঁরা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন—ছি ছি কী সব জিনিস নিয়েই আপনার কারবার! যাঁদের আমরা দেবতা বলে পুজো করছি, যে ব্রাহ্মণ-ঋষিদের আমরা শম-দম-তপস্যার প্রতিমূর্তি ভাবছি, তাঁরা কিনা বঞ্চনা করছেন, নারীর রূপ দেখা মাত্রই মোহিত হচ্ছেন, অন্যের সম্পত্তির লোভ করছেন, এমনকি রেগে গেলে ভীষণ-ভীষণ সব শাপ দিচ্ছেন। এই কি তপস্যার ফল? এই কি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ? ছিঃ, এঁরা আবার ঋষি, এঁরা আবার দেবতা!

এই সব অপভাষণে আমি ক্রুদ্ধ হই না, দুঃখিতও হই না। বরঞ্চ এই বন্ধুদের আপাত অজ্ঞতার জন্য খানিকটা কৌতুকও বোধ করি। কেউ যদি ভেবে নেন—আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় বা গান্ধী—আমি এঁদেরও ঋষি বা দেবতার মতই মনে করি—এঁরা অতি উচ্চমার্গের লোক বলেই এঁদের কোন কাম, লোভ বা ক্রোধ-বেগ ছিল না, তাহলে ভুল ভাবা হবে। হয়তো এঁরা নারীধর্ষণ বা কারও সঙ্গে প্রত্যক্ষ বঞ্চনা করেননি,—করেননি যে, তার কারণ এরা উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন। সভ্যতার অগ্রগতিতে হৃদয়ের দুর্বৃত্তিগুলি চেপে রাখা যায় বলেই সেটা সভ্যতা। কিন্তু সমাজ যখন বেশি এগোয়নি, মানুষ যখন নাগর-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়নি, তখনও যে সমাজটা অসভ্য ছিল, তা নয়। যথেষ্ট শম-দম এবং তপস্যার মধ্যেও দেবতা কিংবা ঋষি-মুনিরা যে অসংযমের পরিচয় দিতেন, তার কারণ সেই সমাজে এই

দুর্বৃত্তিগুলি না চাপলেও চলত।

তা ছাড়া সমাজের তৎকালীন অবস্থার কথাটাও আমাদের ভাবতে হবে। ভাবতে হবে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথাও। তবে আর্থ-সামাজিকতার কথা যখন ভাববেন, তখন যেন আমাদের আধুনিক সমাজের পরিশীলিত মনন সেই সমাজের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। তাহলে অবিচার হবে। আমি আগে দু-একটি গুরুগৃহবাসী শিষ্যের গুরুপত্নীগমনের কথা ইঙ্গিত করেছি। উল্লেখ করেছি—ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতার বঞ্চনার কথাও। কিন্তু তার সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বলিনি। এবারে তাও একটু বলব।

যাঁরা ভাবেন—সে যুগে ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং ব্রাহ্মণ হলেই তাঁদের আর কোন অভাব অভিযোগ থাকত না তাঁরা অংশত ভুল ভাবেন। এটা অতিসরলীকরণ অথবা সাধারণীকরণ। সন্দেহ নেই আপন শিক্ষার গুণে অথবা তাত্ত্বিকতার গুণে ব্রাহ্মণেরাই সে যুগের 'প্রিভিলেজড ক্লাস'। ঠিক যেমন রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ-দখল করে, রাজারাও সুবিধাভোগী দেবতারাও তাই। কিন্তু তাই বলে সমাজে অভাবী ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাঁদের কোন কষ্টও ছিল না—এ ধারণা স্পষ্টতই ভুল।

আমি এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই বিখ্যাত ঘটনাটি উল্লেখ করতে চাই। বৈদেহ জনক ব্রহ্মসভার আয়োজন করে সমবেত মুনি-ঋষিদের বলেছিলেন—আপনাদের মধ্যে যিনি নিজেকে ব্রহ্মিষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবিৎ বলে মনে করেন, তিনি আমার উপহারস্বরূপ এই গরুগুলি নিয়ে যান। কোন ঋষি কোন কথা বললেন না, তর্কে-বিতর্কে ব্রহ্ম-বিষয়ের চরম মীমাংসা হওয়ার আগেই যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যকে বললেন—সৌম্য সামশ্রব ! তুমি গরুগুলি নিয়ে চল। সমবেত ঋষি-ব্রাহ্মণরা রে-রে করে উঠলেন। রাজর্ষি জনকের ঋত্বিক যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন—তুমি কি নিজেকে আমাদের সবার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করো। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—আরে ! সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষির চরণে নমস্কার। আমার মশাই গরু দরকার, গরু নিয়ে যাচ্ছি—নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি।[১]

এই সভায় ব্রহ্ম-বিষয়ণী চর্চা অনেক হয়েছিল, যাজ্ঞবল্ক্যও শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য হল, এই সামান্য ঘটনার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের কৌতুকপ্রিয়তা যতই থাক, গরুগুলি তাঁর দরকার ছিল। রাজা-রাজড়ারা মুনি-ঋষিদের দান-ধ্যান কম করতেন না। কিন্তু সব সময় তাঁদের সেই দানেই সংসার চলত, এ কথা ঠিক নয়। উপরন্তু ব্রাহ্মণ নিজেও দান করতেন। তার ওপরে শিষ্য-সামন্ত যাঁরা গুরুগৃহে থাকতেন, তাঁদেরও ভরণ-পোষণের ব্যাপার ছিল। সব কিছু মিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে অপরের দান গ্রহণ বা প্রতিগ্রহ করাটা নিয়মের পর্যায়ে পড়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত অভাবের তাড়নায় অন্যের যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করে তাঁদের সে দক্ষিণার দিকে তাকিয়ে থাকতে হত, তার কারণ ব্রাহ্মণ নিজেই। তিনি অন্যের চাকরি করবেন না, অন্যের গোলামি করবেন না—শুধু যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং দান-প্রতিগ্রহ—এই নিয়েই তাঁরা থাকবেন, এই তাঁদের ধর্ম। কিন্তু ওই যে বলেছি—আদর্শ এক জিনিস, আর বাস্তব আরেক জিনিস। যাঁরা অযাচিতবৃত্তি হতে চাইতেন, তাঁদেরও আর্থ-সামাজিক চাপে লোভী হয়ে পড়তে হত। তার উদাহরণ আছে ভূরি ভূরি।

মহাভারতে পাণ্ডব-কৌরবের সন্তান-বীজ মহারাজ পরীক্ষিৎ তৃষ্ণাকুল হয়ে নিরুত্তর ধ্যানস্থ শমীক মুনির গলায় মরা সাপ জড়িয়ে দিয়ে তাঁর ছেলের অভিশাপ লাভ করলেন—তক্ষকের দংশনে রাজার মৃত্যু হবে। রাজা পরীক্ষিৎ উপায়ন্তর না দেখে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাপ এবং সাপের বিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ওদিকে তক্ষকও তার পথ খুঁজছিল পরীক্ষিৎকে দংশন করার। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজবাড়ির অন্ধিসন্ধি দেখে নিচ্ছিল। এমন সময় সে মহর্ষি কাশ্যপকে দেখতে পেল। কাশ্যপ সর্প-চিকিৎসা জানেন এবং সাপের বিষ নির্মূল করে সাপে-কাটা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। তিনি পরীক্ষিতের কাছে এসেছেন, কারণ দেশের রাজাকে বাঁচালে তাঁর ধর্মও হবে এবং তিনি টাকাও পাবেন প্রচুর—তত্র মে'র্থশ্চ ধর্মশ্চ ভবিতেতি বিচিন্তয়ন্।[২]

ঠিক এই অবস্থায় ব্রাহ্মণবেশী তক্ষকের সঙ্গে কাশ্যপের দেখা। তক্ষক বলল—মশাই! আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছেন? কাশ্যপ উত্তর দিলেন যে, সর্পদষ্ট রাজাকে তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন। তক্ষক কাশ্যপকে উপযুক্ত পরীক্ষা করেও দেখল যে, তিনি কতটা ক্ষমতা রাখেন। তক্ষক দেখল—কাশ্যপের ক্ষমতা যথেষ্টই। সে তখন নিজের পরিচয় দিয়ে পরীক্ষিতের অন্যায় আচরণের কথা তুলল। তক্ষক বলল—কিসের আশায়, কোন লাভের জন্য আপনি পরীক্ষিৎকে বাঁচাতে চাইছেন। আপনি যা চান, তা যদি দুষ্প্রাপ্যও হয়, তবু আমিই সেটা আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি পরীক্ষিতের কাছে যাবেন না। তক্ষক বলল—পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণকে অপমান করেছে। আপনি তাঁকে বাঁচিয়ে তুললে, সেটা আপনার মর্যাদা বাড়াবে? অর্থাৎ তক্ষক এবার কাশ্যপের ব্রাহ্মণত্বে তথা জাতিসাম্যে সুড়সুড়ি দিলেন। কাশ্যপ কিন্তু সব ভুলে গিয়েও বললেন—তবু আমি সেখানে যাব, কারণ আমার টাকার দরকার। তুমি সেই টাকা দাও আমি এখুনি চলে যাচ্ছি—ধনার্থী যাম্যহং তত্র তন্মে দেহি ভুজঙ্গম। তক্ষক বলল—আপনি রাজার কাছে যত টাকা চাইবেন, আমি তার চাইতে বেশি দেব আপনাকে, আপনি ফিরে যান—যাবদ্ধনং প্রার্থয়সে তস্মাদ্ রাজ্ঞ স্ততো'ধিকম্। অহমেব প্রদাস্যামি...।

কাশ্যপ তক্ষকের কাছ থেকে অভিলষিত ধন নিয়ে ফিরে গেলেন ; রাজার বাড়ি আর গেলেন না। আপনারা বলতেই পারেন—ব্রাহ্মণ লোভী, স্বার্থপর, টাকার মূল্যে সব দেখে। যে রাজা-রাজরাড়া ব্রাহ্মণদের জন্য এত করেছেন, ব্রাহ্মণ সেই রাজাকে দেখল না, তাঁর জীবনের কথা চিন্তা করল না! এ কেমন ব্রাহ্মণ্য, এ কেমন ব্যবহার? উত্তরে আমি আবারও সেই কথা বলি—আর্থিক পরিস্থিতি, সামাজিক পরিস্থিতি। এগুলির জন্যই আদর্শ ব্রাহ্মণ-ঋষি তাঁর ত্যাগব্রত তপস্যার আদর্শ ধর্ম থেকে চ্যুত হন। এই চ্যুতির উপকার একটাই—দেবতা, ঋষি, রাজা—সবাইকেই মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মানুষের মহত্ত্বেই সামান্যীকরণের সুযোগ পাওয়া যায়।

সময় আসবে, যখন আমি দেবতাদের রাজার জাত বলতে বাধ্য হব। বেদেও অনেক দেবতাই রাজ-সম্বোধনে সম্মানিত, অন্যদিকে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রমতে মর্ত্যের রাজারাও সব দেবতার অংশে বলীয়ান—যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ[৩]—অতএব দেবতার চরিত্রে সেই স্বেচ্ছাচারিতার বীজ আছে, যা প্রাচীন রাজাদের মধ্যে দেখতে পাই। নইলে ইন্দ্র যেভাবে গুরুর চেহারা নকল করে গুরুপত্নী

অহল্যাকে ধর্ষণ করেছেন এবং চন্দ্র যে মেজাজে বৃহস্পতির স্ত্রীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন, তা একান্তই রাজকীয়। অন্যদিকে সমাজের গরীব-গুর্বো ব্রাহ্মণেরা অর্থের অস্বচ্ছলতায় যে অন্যায় করতেন, তার থেকে অনেক বেশি অন্যায় করে ফেলতেন তাঁরা, যাঁরা রাজার আশ্রিত অথবা রাজার সঙ্গে যাঁদের ওঠা-বসা। রাজাদের সঙ্গে মিলে মিশে, তাঁদের মধ্যেও অনেক স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করেছে। শাস্ত্রের বিধান যেহেতু তাঁদের হাতেই ছিল, অতএব অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্র-নিয়মও এমনভাবেই তাঁরা তৈরি করেছেন যাতে তাঁদের অথবা রাজাদের অসুবিধে না হয়। অন্যদিকে দেবতাদের কাম-ক্রোধ-লোভের মত হাজার ত্রুটি থাকলেও তাঁরা কিন্তু দেবতার চরিত্র এমনভাবেই বর্ণনা করেছেন, যাতে দোষ-সমন্বিত হলেও তাঁদের আরাধ্যতা নষ্ট না হয়। এই দৃষ্টি অবশ্যই বাস্তব-সম্মত এবং অত্যন্ত মানবিকও বটে। অন্যকে ছলনা করা, বঞ্চনা করা, অথবা আপন স্বার্থ সাধন করা—এগুলি ব্রাহ্মণোচিত গুণ না হলেও অনেক ঋষি-মুনি-ব্রাহ্মণই এই আচরণ করেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি এই আচরণকে সুস্থ সমাজের অঙ্গ বলেই মনে করি।

মুনি-ঋষি এবং মান্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে চরিত্রের কলুষ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে সমস্ত সমাজের মূর্ধণ্য-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার কারণ সমস্ত রকমের উচ্চ শিক্ষা, ত্যাগ এবং বহুজনহিতের মাহাত্ম্য তাঁদের মধ্যে বেশি ছিল। লক্ষ্য করে দেখুন, মানুষের ভাগ্য-বিধান এবং আরাধ্যত্বের নিরিখে যে দেবতাদের আমরা হয়তো পরে 'উত্তমোত্তম' মানুষ বলব, তাঁদেরও কিন্তু এই মুনি-ঋষিদের কাছেই একটা 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি'র ব্যাপার ছিল। অর্থাৎ রাজকীয় স্বেচ্ছাচারিতার বশে দেবতা যদি কোন অন্যায় করে বসতেন, তাহলে তিনি রেহাই পেয়ে বেরিয়ে যেতে পারতেন না। মনুষ্য-সমাজে রাজারা যদি অন্যায় করতেন, তাহলে ব্রাহ্মণ ঋষিদের মুখে সাবধান-বাণী শোনা ছাড়াও তাঁদের যেমন অভিশাপ লাভ করতে হত, তেমনই মানুষের আরাধ্য দেবতারা মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তার সিংহাসনে বসেও নিজকৃত অন্যায়ের জন্য মনুষ্য ঋষি-মুনির তর্জন-গর্জন অভিশাপ লাভ করতেন। অর্থাৎ মুনি-ঋষিদের কাছে মনুষ্য-রাজার যে 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি' ছিল, দেবতা অথবা দেবরাজেরও সেই 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি' ছিল।

এই যে জবাবদিহির একটা ব্যাপার সর্বত্র থেকে যাচ্ছে, এইটাই দেবতা, ঋষি, রাজা বা অসুরেরা না হয় মুনি-ঋষিদের কাছে জবাবদিহি করে নিজেদের শুধরে নেবার সুযোগ পেতেন অথবা জবাবদিহি না করে অভিশাপ লাভ করে অন্যায়ের ফল ভোগ করতেন, কিন্তু মুনি-ঋষিরা? তাঁরা তো কারও কাছেই জবাবদিহি করছেন না। তাঁদের অন্যায় শুধরাবে কে? উত্তরে জানাই—তাঁদের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল। যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যে পরম পদের জন্য তাঁদের শিক্ষা, দীক্ষা, তপস্যা, তাঁদের সেই তপস্যার সিদ্ধি নষ্ট হয়ে যেত হঠাৎ আপতিত কোন অসংযমের কারণে অথবা অন্যায় আচরণের ফলে।

আমি এই প্রসঙ্গে আরও একবার পরীক্ষিৎ মহারাজের কথাই তুলব। তিনি তৃষ্ণাকুল হয়ে মৌনব্রতধারী তপস্যামান শমীর ঋষির গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে এলেন। এতে কিন্তু শমীক এতটুকু রাগ করলেন না, পরীক্ষিৎকে তিনি কোন অভিশাপও দিলেন না। কিন্তু শমীকের ছেলে যুবক মুনি শৃঙ্গী রাজার এই আচরণ সহ্য করতে পারলেন না এবং তিনি পরীক্ষিৎকে তক্ষক-দংশনে মৃত্যুর অভিশাপ দিলেন।

পুত্র শৃঙ্গীর এই হঠাৎ ক্রোধ এবং উদ্ধত আচরণে শমীক কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না। তিনি পুত্রকে ডেকে শাসন করলেন অত্যন্ত কর্কশভাবে এবং তির্যকভাবে তাঁর তপস্যার শক্তি যে অপব্যবহৃত হয়েছে—তাও বলে দিলেন।

শমীক বললেন—পুত্র ! তোমার তপস্যার শক্তি বড় উগ্র—জানাম্যুগ্রপ্রভাবং ত্বাম্। তুমি সত্যবাদী, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, অতএব এখন যা বলেছ, তাও নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু বাবারা যে বয়স্ক ছেলেকেও শাসন করেন, তার কারণ তাঁরা চান তাঁদের ছেলে গুণবান হোক, ছেলের যশ বাড়ুক, এই তো ? তপস্যার ফলে তোমার প্রভাব বেড়েছে বটে, কিন্তু এখনও তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে আমার বলার কিছু থাকতেই পারে—সো'হং পশ্যামি বক্তব্যং ত্বয়ি ধর্মভৃতাং বর।

শমীক এই ভণিতাটুকু শেষ করেই আসল কথায় এলেন। বললেন—যে সমস্ত মহাত্মা পুরুষেরা তপস্যার বলে বলীয়ান হন, তাঁদের রাগ বড় বেড়ে যায়—বর্ধতে চ প্রভবতাং কোপো'তীব মহাত্মানাম্। তুমি বাপু বনের ফলমূল খেয়ে আরও সংযমের মাধ্যমে এই ক্রোধটাকে সংযত করার চেষ্টা কর। স্বর্গলিপ্সু লোকেরা অনেক কষ্টে যে ধর্ম সঞ্চয় করেন, এই ক্রোধ তা নষ্ট করে দেয়। শমগুণ বা সংযমই জিতেন্দ্রিয় লোকের অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটায়। তুমিও ইন্দ্রিয়কে শাসন কর, ক্ষমাশীল হও।

শমীক আরও বললেন—তুমি যা করেছ, আমি কিন্তু তা মেনে নিতে পারছি না। আমি অন্তত শিষ্যমুখে সেই রাজাকে সংবাদ পাঠাব যে, আমার অশিক্ষিতবুদ্ধি বালক পুত্র আপনাকে এই অভিশাপ দিয়েছে—মম পুত্রেণ শপ্তো'সি বালেনাকৃতবুদ্ধিনা।

শমীক একটা মাত্র অসংযমের কথা বলেছেন, সেটা ক্রোধ। একইভাবে কাম-মৈথুন, লোভ এগুলিও যে মুনি-ঋষিদের তপস্যার প্রভাব নষ্ট করেছে, তারও উদাহরণ আছে ভূরি ভূরি। পুরাণে ইতিহাসে কত মুনি-ঋষিকে শেষ পর্যন্ত হাহাকার করতে দেখেছি, তাঁরা তাঁদের অন্তঃস্থিত কামবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে অথবা লোভী হয়ে পড়েছেন বলে। কাজেই মানুষ, অসুর বা দেবতাদের ওপর যেভাবে অভিশাপ নেমে আসত, ঋষি-মুনিদের ওপরেও সেই অভিশাপ নেমে আসত কাম-ক্রোধের ছদ্মবেশ ধরে। অর্থাৎ দেবতা বা রাজাদের মত তাঁদেরও এক জায়গায় 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি' আছে। তাঁরাও সর্বেসর্বা নন।

অন্যায়, অসংযম এবং অভিশাপের সূত্র ধরে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি, তা হল—সমাজ যেখানে আছে, সেখানে মনুষ্যধর্মের নিয়ম অনুযায়ী দেবতা-অসুর, ঋষি বা রাজা কেউই নির্ভেজাল ভালর মহিমা দিয়েই তৈরি হতে পারেন না। ভাল-মন্দ মিশিয়ে যেমন মানুষ, তেমনই ভাল-মন্দ মিশিয়েই দেবতা, ঋষি এবং বৃহত্তর মনুষ্যসমাজ। সুস্থ সমাজের নিয়মে ভাল-মন্দেই সবার প্রবহমানতা, নইলে হিন্দুর দেবতা হতেন নিষ্প্রাণ, ধূসর এবং শুধুই আরাধ্যতম। তাঁরা আমাদের জীবনের অংশীদার হতেন না। দেবতারা যেখানে সব দিক দিয়েই মনুষ্যধর্মের অঙ্গীভূত, অতএব এই রকম একটা জায়গা থেকেই আমরা দেবতা, ঋষি অথবা দেবকল্প রাজাদের মনুষ্যোচিত কামনা-বাসনা, রতি, ক্রোধ একেবারে মানুষের দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করতে থাকব। দেখবেন, এই চরম মনুষ্যায়ণের শেষ বিন্দুতেই দেবতা, ঋষি বা আমাদের প্রাচীন পিতামহদের নিয়ে রঙ্গ-রসিকতাও খুব অন্যায় বলে গণ্য হবে না।

দেবতাদের সম্মানার্থে পুরাণকারেরা পৃথিবীতে তাঁদের বাসস্থান নির্ণয় করতে পারেননি ; করেছেন স্বর্গ নামক এক কাল্পনিক লোকে। তবে কি জানেন, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বুঝবেন, স্বর্গ জায়গাটা পৃথিবীর বাইরে কোন কাল্পনিক জায়গা নয়। ওটা পৃথিবীতেই ছিল। স্বর্গের সম্বন্ধে যে সব রোমাঞ্চকর বিলাসের খবর পাওয়া যায়, সে সবও মিথ্যে নাও হতে পারে। হ্যাঁ, আপনি মরবার পরে স্বর্গে গিয়ে উর্বশী-রম্ভার কাঁধে হাত রেখে আঙুর ফল খেতে পারবেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ রাখাটাই শ্রেয় মনে করি। কিন্তু আপনি এখনকার ভারতের মুঘল গার্ডেনে বিশ্বাস করবেন, অথচ নন্দন-কাননে বিশ্বাস করবেন না—তা হবে না। ভারী সুন্দর একটা ফুল-ফলের বাগান যে স্বর্গের দেশে ছিল, তাতে অসম্ভব কি আছে ? পারিজাত ফুলও কিছু অসম্ভব নয়। রেয়ার কোয়ালিটির গোলাপে বিশ্বাস করবেন, নাগচম্পায় বিশ্বাস করবেন, অথচ পারিজাতের মোহন গন্ধে বিশ্বাস করবেন না, তা হবে না।

এই সেদিনের রাজা-রাজড়ারা সুন্দরী নতর্ক্কীদের নৃত্য উপভোগ করতেন। জমিদার বাড়িতে মেহ্‌ফিল বসত। আলোর রোশনাই আর সুরার হিল্লোলে রাত দিন হয়ে যেত—সেটা আপনি বিশ্বাস করবেন। তাহলে পানীয় হাতে দেবরাজ ইন্দ্রের সামনে উর্বশী-মেনকার মত স্বর্গসুন্দরীরা একটু নাচ দেখালেই সেটা কল্পলোকের বিলাস-ব্যাভার হবে কেন ? বস্তুত নন্দকানন, পারিজাত ফুল অথবা উর্বশী-রম্ভারা স্বর্গের বিশ্বাসে একেবারেই গৌণ ব্যাপার। আসল ব্যাপার হল, স্বর্গ নামক জায়গাটি কোথায় ? সেটা যদি পাওয়া যায় তবে নাচ-গান আর ফুলের বাহারটা মোটেই কাল্পনিক হবে না।

আপনারা মৎস্যপুরাণ খুলুন। দেখবেন, মহাশক্তিশালী তারকাসুর ত্রিপুর বলে একটা দুর্গ বানিয়েছেন। এই দুর্গ দেবতারা শত চেষ্টা করেও ভাঙতে পারেননি এবং এই দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করা তাঁদের পক্ষে একরকম অসম্ভব। দেবতারা এই অবাধ্য অসুরকে বধ করার জন্য দেবদেব মহাদেবের শরণ নিয়েছেন। দেবতাদের অভয় দিতে মহাদেব এসে পৌঁছেছেন দেবসভায়। সে সভার নাম অমরাবতী। আমাদের যেমন দেওয়ান-ই-আম্, দেওয়ান-ই-খাস্ অথবা মিটিং রুম, তেমনই ইন্দ্রের অমরাবতী। এই অমরাবতীর মধ্যেও আবার ইন্দ্রের একটা 'পারসোন্যাল' প্রমোদ-প্রাসাদ আছে যার নাম বৈজয়ন্ত-প্রাসাদ। এই প্রাসাদের যা বর্ণনা আছে, তাতে এটাকে আক্ষরিক অর্থে 'ক্রিস্ট্যাল প্যালেস' বলা যায়, কারণ প্রাসাদটি স্ফটিক-নির্মিত।

এখন ইন্দ্রের যা অবস্থা, তাতে তাঁর পক্ষে ওই প্রাসাদে বসে উর্বশীর নৃত্যকলা দেখা সম্ভব ছিল না। তিনি দেবসভায় এসে মিলিত হয়েছেন উপস্থিত দেবগণের সঙ্গে। সেখানে নারদও এসে উপস্থিত হয়েছেন ত্রিপুর দুর্গের খবরাখবর নিয়ে। সকলেই অবশ্য এখন মহাদেবের আপ্যায়নে ব্যস্ত। কিন্তু মহাদেব নিজের জায়গা ছেড়ে কোথায় এসেছেন এবং দেবসভাই বা কোথায় বসেছে—তার একটা হিসেব কষলেই বুঝতে পারবেন—আমাদের সেই কল্পিত স্বর্গভূমি কোথায়।

পুরাণের কথক ঠাকুর বললেন—নারদ মুনি ত্রিপুর থেকে এসে দেবসভায় উপস্থিত হলেন। জায়গাটার নাম কি ? জায়গাটার নাম ইলাবৃত বর্ষ। বর্ষ মানে ভৌগোলিক

সীমাযুক্ত একেকটা জায়গা, যেমন ভারতবর্ষ। তা এই ইলাবৃতের বর্ষের আর কোন পরিচয় আছে কি ? পুরাণকার চিনিয়ে দিচ্ছেন—আছে ! যেখানে দৈত্যরাজ বলি বড় যত্ন করে সেই বিশাল যজ্ঞ করেছিলেন। যে যজ্ঞে বিষ্ণুকে বামন হয়ে ভিক্ষা চাইতে হয়েছিল, যে যজ্ঞে বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দান করতে গিয়ে তিনি সর্বস্ব খুইয়েছিলেন এবং যে যজ্ঞের দানমহিমায় স্বয়ং বিষ্ণুকে বলির দ্বারপাল নিযুক্ত হতে হয়েছিল, সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল এই ইলাবৃত বর্ষে—যত্র যজ্ঞো বলের্বৃত্তো বলির্যত্র চ সংযতঃ। আর কি কোন ইতিহাস আছে এই ইলাবৃত বর্ষের ? পুরাণকার বললেন—আছে। এই সেই পবিত্র স্থান, যেখানে দেবতাদের জন্ম হয়েছিল। দেবতাদের যাগ-যজ্ঞ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ এমনকি কন্যা সম্প্রদান করতে হলেও এই জায়গাতে আসতে হয়—

দেবানাং জন্মভূমি র্যা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
বিবাহাঃ ক্রতবশ্চৈব জাতকর্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥
দেবানাং যত্র বৃত্তানি কন্যাদানানি যানি চ।[১]

তাহলে দেখুন—বলি দৈত্যদের রাজা, তিনিও যজ্ঞ করেছিলেন এইখানে ; আবার দেবতাদের জন্ম-কর্ম, বিয়ে-সাদিও এইখানে। অর্থাৎ দেবতা এবং দৈত্য দুই পক্ষেরই পছন্দের জায়গাটা হল এই ইলাবৃত বর্ষ। মহাদেব ত্রিপুর দুর্গের অধিকারীকে শায়েস্তা করার আগে এই ইলাবৃতবর্ষে দাঁড়িয়েই ইন্দ্রকে বলেছেন—দেখ ইন্দ্র ! ত্রিপুর দুর্গে শত্রুদের পতাকাগুলো কেমন পত্‌পত্‌ করে উড়ছে দেখ। বিমানগুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, অট্টালিকার মধ্যে কেমন সুন্দর সব ঘরগুলো। এই দুর্গ যেন আগুনের মত তাপ দিচ্ছে, অসুররা সব অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

আসলে অট্টালিকা কি দুর্গ বানানোতে অসুর-দৈত্যরা খুবই অভ্যস্ত ছিলেন। ওঁদের মধ্যে যত ভাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, দেবতাদের মধ্যে তেমন ছিলেন না। ত্রিপুর দুর্গ যেমন তার প্রমাণ, রাবণের স্বর্ণলংকাও তার প্রমাণ। অর্জুনকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপ্রাসাদ বানাতে হয়েছিল ময়দানবকে দিয়ে এবং ত্রিপুর দুর্গের অন্যতম রূপকারও ওই ময়দানব। কিন্তু সে কথা যাক। মোদ্দা ব্যাপার হল—দেবতাদের জন্মভূমি আর সমস্ত কাজ-কারবারের জায়গা যেটা, সেইখানেই কিন্তু এই ত্রিপুর দুর্গ এবং জায়গাটা হল ইলাবৃত বর্ষ।

এই ইলাবৃতবর্ষের অন্য নাম হল স্বর্গ। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্বতের অবস্থান। হিমালয়ের উত্তরে এবং হেমকূট পর্বতমালার দক্ষিণে হল কিম্পুরুষ বর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের সীমা নিষধ পর্বত পর্যন্ত এবং নিষধের উত্তরেই হল আমাদের ইলাবৃতবর্ষ—হরিবর্ষাৎ পরঞ্চাপি মেরোস্তু তদিলাবৃতম্।[২] পুরাণের এক জায়গায় যেমন বলা হল—ইলাবৃতবর্ষ দেবতাদের জন্মভূমি, অন্যত্র কিন্তু আবার বলা হচ্ছে যে, সেখানকার মানুষের গায়ের রঙ পদ্মের মত, আর তাদের চোখগুলো সব পদ্মের পাঁপড়ির মত, গা দিয়েও যেন পদ্মের গন্ধ বেরুচ্ছে—পদ্মগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র সর্বে চ মানবাঃ। আমার মতে এই মানুষেরাই দেবতা। পুরাণও একই সঙ্গে বলছে—দেবলোকচ্যুতাঃ সর্বে মহারাজতবাসসঃ।[৩]

পণ্ডিতেরা বলেছেন—এই ইলাবৃতবর্ষ মোটামুটি "মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। সম্ভবত

আধুনিক পামির বা পূর্ব-তুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত।" পণ্ডিতদের অনুমান—এই জায়গার নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে এই ইলাবৃত বর্ষের সভ্যতা লুপ্ত হয় এবং নিতান্ত জলাভাবের জন্যই ইলাবৃত বর্ষ থেকে তাঁরা ভারতের দিকে ক্রমশ আসতে থাকেন। গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখেছেন—ইলাবৃতবাসীগণ আর্য ছিলেন। কালবশে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। একদল নিজেদের দেব এবং অপর দল নিজেদের অসুর বলিতেন। অসুরগণ দেবগণের জ্ঞাতি ও বন্ধু ছিলেন।

এটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দেখা যাবে—দেবতাদেরও নানা দল ছিল। একেকটা দলের একেকটা গোষ্ঠী-পরিচয়ও ছিল। দেব, শুক্র, ত্বিষিমান্—এইগুলি হল দলের নাম। ইন্দ্র ছিলেন এঁদের প্রধান এবং বলা বাহুল্য, ইন্দ্র একটা উপাধিমাত্র, দল-প্রধানের উপাধি। আর অসুররা এই দেবতাদেরই জ্ঞাতিবন্ধু—অসুরা যে তদা তেষামাসন্ দায়াদবান্ধবাঃ। ঠিক এইখানটায় গিরীন্দ্রশেখরের সুচিন্তিত বক্তব্য আমি আবার চলিত ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছি—

"অনুমান হয় দেবগণ তুর্কীস্থান থেকে কাশ্মীরের পথে প্রথমে ভারতে আসেন। তাঁরা কাশ্মীর থেকে পঞ্জাব ও পঞ্জাব থেকে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত ক্রমে অধিকার করেন। তারপর বিন্ধ্যের দক্ষিণেও আর্যরা রাজ্যবিস্তার করেন। পুরাণ আলোচনায় দেখা যায় যে, দক্ষিণাপথে আর্যরাজ্য বেশ প্রাচীন। ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর-বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণাপথ পর্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য এবং পাতাল নামে পুরাণে পরিচিত। ভারতীয়দের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে এসে বসবাস করেন বলেই অন্তরীক্ষের অন্য নাম পিতৃলোক। অন্তরীক্ষ মানে মধ্যবর্তী দেশ। দেবলোক, পিতৃলোক এবং মর্তলোক অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর ও উত্তরভারত প্রাচীনকালে আরও তিনটি নামে পরিচিত ছিল—যেমন, ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। একাধিক ঋক্‌সূক্তে এই তিনটি নাম পাওয়া যায়। এই তিন প্রদেশেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঋগ্‌বেদে বাগ্‌দেবতা নামে পরিচিত।

যখন দেবতারা প্রথমে ভারতে আসেন, তখন প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রের অধীন ছিলেন। স্বর্গ বা ইলাবৃতবর্ষের অধিপতির সাধারণ নাম ইন্দ্র। ভারতে তখন রাজা বলে কেউ ছিলেন না। ভারতে নেমে আসার পর দেবতারা মানব নামে পরিচিত হন। ইন্দ্রের প্রতিভূর নামই মনু বা প্রজাপতি। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী ভারতে বেণরাজাই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করেন। ইলাবৃত-বর্ষ ভারতীয়দের আদি বাসস্থান বলেই অতি পবিত্র তীর্থভূমি বলে মনে করা হত। যুধিষ্ঠিরের সময়েও লোকে স্বর্গে তীর্থ করতে যেত। স্বর্গের পথ ক্রমে দুর্গম হয়ে পড়ে। কাশ্মীর থেকে তুর্কীস্থান যাবার যে বণিক্‌পথ এখনও আছে, সেটাই স্বর্গে যাবার আদিপথ বা দেবযান-পথ বলে মনে হয়। উত্তরদেশের উচ্চ ভূমি এবং পর্বতও পরবর্তী কালে স্বর্গ নাম লাভ করেছিল।

ইলাবৃত-বর্ষ যে দেবতাদের বাসভূমি পুরাণে তা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। ইলাবৃত-বর্ষের মধ্যে যে মেরুপর্বত (এই মেরু পৃথিবীর অক্ষপ্রান্ত মেরু নয়), সেইখানেই দেবতাদের বাস ছিল। বায়ুপুরাণে আছে—বেদ-বেদাঙ্গ জানা পণ্ডিতেরা নাকপৃষ্ঠ, দিব, স্বর্গ ইত্যাদি পর্যায়বাচক শব্দে মেরুমহিমা কীর্তন করেন। এই গিরিতেই দেবলোক বিরাজিত বলে সমস্ত শ্রুতি বা বেদে বলা আছে—দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্বশ্রুতিষু গীয়তে।

দিবি আরোহণ বা স্বর্গারোহণের কথাটা এখন এমনই শুনতে লাগে যে, স্বর্গ বুঝি মৃত পুণ্যাত্মাদের মরণোত্তর আশ্রয়ভূমি। আমাদের দেশে এই সেদিনও লোকে বুড়ো হয়ে গেলে জীবনের শেষ কদিন ভগবান বিশ্বেশ্বরের সান্নিধ্যে কাটানোর জন্য কাশী যেতেন। আমরা পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকেও মৃত্যুর ঠিক আগে মহাপ্রস্থানিক পর্বে নিজের জায়গা ছেড়ে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখেছি। যদিও যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ এবং তাঁরও পূর্বে ইলাবৃত বর্ষের স্বর্গ একেবারেই আলাদা। কেন তা বলছি পরে। কিন্তু এই যে মাঝে মাঝে পুরাণে-ইতিহাসে সশরীরে স্বর্গে যাবার কথাটা শোনেন, সেটা ছিল অনেকটাই মৃত্যুর পূর্বে সশরীরে কাশী যাবার মত।

বস্তুত স্বর্গ বলে একটা জায়গা নির্দিষ্টই ছিল এবং সেখানে যেতে হলে যেহেতু পাহাড়-নদী পেরিয়ে বন্ধুর পথে ওপরের দিকেই উঠতে হত, তাই স্বর্গে যাওয়াটা আমাদের কাছে যাত্রা মাত্র ছিল না, সেটা ছিল আরোহণ। ঠিক সেইজন্যই উত্তর আরও উত্তর দেশের উচ্চ ভূমি বা পর্বতই স্বর্গ বলে কল্পিত হয়েছিল। পণ্ডিতেরা মৎস্যপুরাণের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন—পুরাকালে কোন এক ইন্দ্র সামরিক উদ্দেশ্যে দেবযান নামের বণিক্‌পথটি পাহাড় ফেলে ফেলে দুর্গম করে দেন। পুরাণ এই ইন্দ্রকে হীনচেতা অথবা ক্ষুদ্রাত্মা বলতে দ্বিধা বোধ করেনি। পুরাণ বলে—যখন থেকে ইন্দ্র আপন সংকীর্ণতায় বজ্র দিয়ে স্বর্গপথ রোধ করেন, তখন থেকেই মানুষের কাছে স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে—তদা প্রভৃতি লোকানাং স্বর্গমার্গো নিবারিতঃ।"[১০]

লক্ষণীয় বিষয় হল, এক স্বর্গ রুদ্ধ হলেও আরেক স্বর্গ তৈরি হতে দেরি হয়নি। আর্যরা যতদিন ইলাবৃত বর্ষের কাছাকাছি ছিলেন, তখন সেটাই স্বর্গ ছিল। কিন্তু কাশ্মীর থেকে আরও নীচে নেমে এসে ভারতের উত্তরপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর ইলাবৃত স্বর্গের পথ তাঁদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরকে তাই বদরীনারায়ণ এবং মানস সরোবরের পথে স্বর্গে যেতে হয়েছে। স্বর্গের উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করে ইন্দ্রসভা থেকে ফিরে এসে অর্জুন যেখানে ভাইদের সঙ্গে মিলেছিলেন, সেটা হিমালয়ের কোলঘেঁষা একটা জায়গা। অর্জুনের স্বর্গ থেকে সে জায়গা বড় দূরে নয়।

আমি যে তখন থেকে আপনাদের স্বর্গ চিনিয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, তার কারণ একটাই। আমার প্রস্তাবে দেবতারা উন্নত শ্রেণীর মানুষ এবং তাঁদের আবাসভূমি যে স্বর্গরাজ্য, সেও পৃথিবীর বাইরে কোন স্থান নয় ; মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমানার মধ্যেই সেই স্বর্গরাজ্যের ঠিকানা আছে। দূরে ফেলে আসা সেই ঠিকানার জন্য তাঁদের মনে ব্যাকুলতাও আছে। স্বর্গবাসী দেবতাদেরও পরলোকের চিন্তা সাধারণ মানুষের মতই। জীবনের সময় ফুরোলে পরলোকের ভাবনা এবং বিষাদ দুইই তাঁদের পেয়ে বসে—ইত্যৌৎসুক্যবিষাদেন। অন্যদিকে সংসারে থাকলে মায়ায় মমতায় যেমন আমাদের এই নশ্বর ভূমিখণ্ডটি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না, দেবতারাও তেমনই এই সুন্দর ভুবন ছেড়ে পরপারে যেতে চান না। পুরাণকার বলেছেন—তাঁরা হলেন 'ইহস্থানাভিমানিনঃ', অর্থাৎ এই স্থান সম্বন্ধে তাঁদের মায়া জন্মে যায়।[১১] তাহলে মানুষের মতই ভাবনা, বিষাদ আর মায়া নিয়ে যে দেবতারা মানুষের মনের ঊর্ধ্বলোকে বসে আছেন, তাঁদের আমার মতে মানুষই বলা ভাল।

সূত্র

১ 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ' পৃ. ৭০৬
২ 'মহাভারত' ১. ৩৭. ৩৫
৩ তদেব, ১. ৩৮. ১৭
৪ 'মনুসংহিতা', ৭. ৫
৫ 'মহাভারত', ১. ৩৭. ৫
৬ তদেব, ১. ৩৭. ১২
৭ 'মৎস্য-পুরাণম্', ১৩৫, ৩-৪
৮ 'বায়ু-পুরাণম্', ৩৪. ২৯
৯ 'মৎস্য-পুরাণম্', ১১৪. ৭২
১০ গিরীন্দ্রশেখর বসু, 'পুরাণপ্রবেশ', পৃ. ২৩২-২৩৩ দ্রঃ মৎস্য-পুরাণম্, ১৯১ ১০-১১
১১ 'বায়ু-পুরাণম্', ৭· ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

পুরাণের সচল সমাজে দেবতাদের লোকব্যবহার

॥ ১ ॥

আচ্ছা, মনুষ্য-ব্যবহারের বিচারে আমরা যদি দেবতাদের উত্তমোত্তম মানুষ বলি, তাহলে ক্ষতি কি ! এখনও সমাজে উত্তমোত্তম তাঁরাই, যাঁরা সাধারণের ভাগ্য বিধান করেন কিংবা যাঁদের হাতে দণ্ড। পৌরাণিক দৃষ্টিতে আধুনিক প্রলেপ দিয়ে আমরা কি দেবতাদের রাজা বলতে পারি ? বৈদিক ঋষিরা তো অনেককেই রাজা বলেছেন। আরও একটা জিনিস পুরাণ ইতিহাসে লক্ষ করার মতো। সেটি হল, স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীর রাজাদের সর্বক্ষণের যোগাযোগ। একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে না হলে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এত মেশামেশি কি সম্ভব ? মনুষ্যলোকে যখনই কোন শক্তিশালী রাজা অসুবিধেয় পড়েছেন, দেবতারা অনেকেই তখন নেমে এসেছেন যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত ভূমিতে, তাঁরই সাহায্যকল্পে। দেবতাদের রাজার প্রতীক ইন্দ্রকেই তো কতবার দেখা গেছে, মনুষ্য রাজার ধ্বজ-পতাকার অন্তরালে। মর্ত্যলোকে গুণী রাজার উপাধিই তো ইন্দ্র-রাজেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র। আবার উল্টোদিকে, স্বর্গের দেবতারা যখন শত্রুপক্ষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না, তখনই দেখি মানুষ রাজা ছুটছেন স্বর্গের দিকে, স্বয়ং দেবরাজের রথ আসছে তাঁকে নিতে। দশরথ স্বর্গে গেছেন যুদ্ধ করতে, মুচুকুন্দ গেছেন, খট্বাঙ্গ গেছেন, দুষ্যন্ত গেছেন। আরও কত রাজা স্বর্গক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ের পর দেবস্থানের ধন্যধ্বনি শুনতে শুনতে স্বর্গের মন্দারমঞ্জরী এনে গুঁজে দিয়েছেন রাজ-রানীর খোঁপায় ! আবার দেখুন, যখনই পুরাণকাহিনীতে বিষ্ণুর অবতার নেমে এসেছেন ভুঁয়ে, তখনই তাঁর সাহায্যকল্পে স্বর্গের দেবতারা এসে জন্মেছেন মনুষ্যলোকে রাজরানীদের গর্ভে। মনে রাখা দরকার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজরানীর গর্ভে, ঋষিপত্নীর গর্ভে নয়।

কি পশ্চিমী পুরাণকাহিনীর মধ্যে, কি প্রাচ্য পুরাণকথায়, এটা প্রায় দেবলোকের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে যে, তাঁরা মনুষ্য রমণীর গর্ভে পুত্র উৎপাদনে বড়োই দক্ষ। আমাদের ঘরের দেবতারাও সোজাসুজি এসে মনুষ্য রমণীর গর্ভাধান করেছেন নির্দ্বিধায়। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, কর্ণের কথা ছেড়েই দিলাম, ভারতবর্ষের বানরীরাও বাদ যায়নি দেবতার রতিগ্রাস থেকে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাও বানর ঘরের রানী। পুরাণে, ইতিহাসে আবার এ-ও দেখা যাবে যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ—এই সমস্ত শক্তিশালী দেবতার অংশেই রাজার জন্ম। যে কোন রাজাই তাই। আমরা তাই পৌরাণিক দেবতাদের যেমন রাজার জাত বলব, তেমনি মর্ত্যভূমির রাজাদেরও

দেবতার জাত বলব। তাহলে আমাদের আগেকার সিদ্ধান্তটা একটু ঘসামাজা করে দেবতা এবং রাজাদেরই আমরা উত্তমোত্তম মানুষ বলব। উত্তমোত্তম এইজন্যে যে, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির নিরিখে মুনি-ঋষিদের 'উত্তম' উপাধি দিতেই হবে। মধ্যম বলব সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের—যাঁরা সমাজের সাধারণ সুবিধেগুলি সব সময়ই পেতেন এবং যাঁদের একাংশ সাধনা, তপস্যার মাধ্যমে ঋষি-মুনির পর্যায়ে চলে যেতেন এবং অন্যাংশ ক্ষমতা এবং বুদ্ধির জোরে রাজপদবী লাভ করতেন। আর সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ যে 'পাবলিক', তারা যেমন গণতন্ত্রের যুগেও কার্যত অধম অবস্থায় আছে, পৌরাণিক রাজতন্ত্রের যুগেও তাই ছিল। কাজেই 'পাবলিক'কে অধম বলতে কোন অসুবিধে নেই।

এ-কথা অবশ্য মানতেই হবে পৌরাণিকেরা আমাদের মতো কুটিল ছিলেন না। এখনকার দিনে সমাজের অধম সাধারণ মানুষকে মৌখিকভাবে গণতান্ত্রিক মূল্য দিয়ে দিয়ে মনে মনে তাদের পাঁঠা ভাবা হয়, পুরাণের যুগে কিন্তু এমন ছিল না। যাদের তাঁরা অধম ভাবতেন, তাদের তাঁরা সামনাসামনিই অধম বলতেন। শূদ্রদের তাঁরা অধম ভাবতেন এবং সামনাসামনিই অধম বলতেন। স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না, ত্যাগ কর তাকে। আবার যাকে পছন্দ হল, তার সঙ্গফল অবধারিত রতিক্রিয়া। এই সোজাসুজি দৃষ্টি থাকার ফলে তাঁরা এ-ও বুঝেছিলেন যে, সমাজের উচ্চকোটির মানুষ যাঁরা, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষমতা এবং মানসিক বলের সঙ্গে দোষও কিছু থাকে। এই সহজ কথাটা সহজে বুঝেছিলেন বলেই পৌরাণিকেরা দেবতা, মুনি কিংবা রাজাদেরও চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাতে লজ্জাবোধ করেননি।

প্রায় প্রত্যেকটি পুরাণেই যে বিষয়টি আরম্ভ-সর্গগুলি অধিকার করে আছে, তা হল সৃষ্টি। আমরা জানি যে-কোন সৃষ্টির মূলে আছে কাম। মৎস্যপুরাণ জানিয়েছে—ব্রহ্মা যখন বেদাভ্যাসে রত ছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁর দশটি মানস পুত্র জন্মায়। এঁরা সবাই মাতৃহীন, অযোনিজ এবং স্থিতধী মুনি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু মজা হল, এই সম্ভ্রান্ত মুনিকুল সৃষ্টির পরেই ব্রহ্মা তাঁর বুক থেকে ধর্ম সৃষ্টি করলেন, হৃদয় থেকে কাম এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে লোভ, মোহ, অহঙ্কার। তার মানে কি সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনে ধর্ম যেমন প্রয়োজন, কামও তেমন প্রয়োজন? সময় বিশেষে লোভ, মোহ, অহঙ্কারও যে জীবনের শক্তি জোগায়, এটা বোঝানোর জন্যই বোধহয় এরা ব্রহ্মার পুত্র বলে স্বীকৃত। পৌরাণিক বলেছেন—এই পুত্রগুলির সঙ্গে একটি কন্যাও আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই কন্যা জন্মের প্রসঙ্গেই পৌরাণিকেরা এমন একটি জীবন-সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন, যা তাঁরা চিরকাল প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন।

প্রজা সৃষ্টির সময় ব্রহ্মা নাকি চতুর্বেদের সার সাবিত্রী-মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে জপে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর পবিত্র দেহ ভেদ করে অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক স্ত্রী জন্মাল। অর্ধেক মানে এই নয় যে, এরা একটি পুরুষেরও অর্ধেক কিংবা একটি নারীরও অর্ধেক। স্বরূপত, যে কোন একটি পুরুষ কিংবা যে কোন একটি নারী সৃষ্টি রহস্যের অর্ধাংশমাত্র। এরা মিলিত হলে তবেই না সম্পূর্ণ মানুষটা। আমার বক্তব্য কিন্তু এখানে নয়। পৌরাণিকেরা বলেছিলেন—ব্রহ্মার ভাবটা ছিল যেন, সব তাঁর মন থেকেই তৈরি হচ্ছে—মানসপুত্র—তার মধ্যে কামগন্ধের ছিটেফোঁটাও নেই যেন।

তাঁর শরীর ভেদ করে এইমাত্র যে কন্যাটি জন্মাল, তাঁকে তিনি 'আত্মজা' বলে ডেকেছেন, তাঁর নামকরণ করেছেন সাবিত্রী বলে, সরস্বতী বলে, শতরূপা বলে। ঠিক যেমন সুন্দরী রমণীকে প্রথম দেখে আমরা ভাবি—এ আমার হৃদয়ের ধন, মানসরূপিণী, এর সঙ্গে আমার কাম-সম্বন্ধ নেই কোন ; সোচ্ছ্বাসে তার নামকরণ করি প্রিয়া বলে, প্রণয়িণী বলে, মানসী বলে। কিন্তু হঠাৎ করে হৃদয়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে কীট আর ঠিক ব্রহ্মার মতোই তখন বলে উঠি—আহা কি রূপ, কি রূপ—অহো রূপম্ অহো রূপমিতি চাহ প্রজাপতিঃ। কন্যার রূপ দেখে বিভু ব্রহ্মা কামনায় পীড়িত হলেন।[১]

ব্রহ্মার মন থেকে আগে যে সব মুনিরা জন্মেছিলেন সেই বশিষ্ঠ প্রমুখ মানসপুত্রেরা পিতার অঙ্গজাত কন্যাকে 'বোন, বোন' বলে ডাকতে থাকলেন। কিন্তু ব্রহ্মা খালি কন্যার মুখটি দেখেন আর বলেন—'অহো রূপম্ অহো রূপম্'। প্রণাম-নম্রা সেই কন্যা ব্রহ্মার চারদিক ঘুরে প্রদক্ষিণ করল, কিন্তু ব্রহ্মার কেবলই ইচ্ছে হতে লাগল নারীরূপ দেখার। লজ্জা ! লজ্জা ! মানসজাত পুত্রদের সামনে এ কি হল, লজ্জা—পুত্রেভ্যো লজ্জিতস্য—অতএব ব্রহ্মার তপোরুক্ষ মাথার দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয় একটি হলদে রঙের মুখ বেরোল—ভাল করে রূপ দেখার জন্য। পশ্চিম দিক থেকে যে মুখটি বেরোল, সেটি তো কন্যার রূপ দেখে বিস্ময়ে স্ফুরিতাধর। বাঁদিক থেকে চতুর্থ মুখ যেটি বেরোল, সেটি একেবারে 'কামশরাতুরম্'। ঠিক এমন অবস্থাতেও আরও একটি মুখ দেখা গেল ব্রহ্মার এবং সেটিও নাকি তাঁর নাকি কামাতুর অবস্থার জন্যই। কথাটা কেমন হল ? একটি কামাতুর মুখ, আবার কামাতুরতার জন্য আরও একটি মুখ। আসলে মানুষ রূপ দেখে, বিস্মিত হয়, কামনাও জাগে। কিন্তু কামনা জাগার পরে মানুষের যে মুখটি প্রকট হয়ে ওঠে, সে মুখটি তো আর মানুষের মতো থাকে না। কাজেই ব্রহ্মার কামদিগ্ধ মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরও একটি মুখ—যার লজ্জা নেই, ভাবনা নেই, শুধুই সে নগ্নতার কুতূহলী—আলোকন-কুতূহলাৎ। সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করার জন্য ব্রহ্মার এতদিনের তপস্যা নিজের কন্যার সম্ভোগ বাসনায় সম্পূর্ণ বৃথা হয়ে গেল। ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্রদের প্রজা সৃষ্টির আজ্ঞা দিয়ে নিজে শতরূপাকে বিয়েই করে ফেললেন। তারপর ! তারপর কমলকেলির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। শতরূপার সঙ্গে একশ বছর কেটে গেল—সলজ্জাং চকমে দেবঃ কমলোদরমন্দিরে।[২]

এই গল্পটার মধ্যে নাকি রূপক আছে। চতুরানন ব্রহ্মার চারটে মুখ থেকে চতুর্বেদের জন্ম। বেদসার গায়ত্রী অথবা সাবিত্রী তাই ব্রহ্মার অঙ্গজা। বেদের সঙ্গে গায়ত্রীর সম্পর্ক মিথুনের মতো, বেদস্বরূপ ব্রহ্মার সঙ্গেও তাই—বিরিঞ্চি যত্র ভগবাংস্তত্র দেবী সরস্বতী। কিন্তু ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর রূপকের সম্পর্ক যাই হোক আমরা শুধু পৌরাণিকের বাস্তব দৃষ্টিটুকু বোঝাতে চাই। কামনার সূত্রই যে জীবনের প্রথম ইন্ধন—এ কথাটা পিতামহের ব্যবহারে প্রমাণ দিয়েই পৌরাণিক যেন আধুনিক উপন্যাস সমালোচনার প্রথম কথাটি বললেন। তাঁদের এই বাস্তববোধ ছিল যে, সংঘাত ছাড়া, 'টেনশন' ছাড়া মানুষের জীবন চলে না। এ বোধ যে কত বড় বোধ তা বলে বোঝাতে পারব না। ব্রহ্মার আদেশমতো তাঁর মানসপুত্রেরা যখন জরা-মরণ-হীন সিদ্ধদের জন্ম দিচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা বললেন—দেখ বাপু। এই জরা-মৃত্যুবর্জিত কতকগুলি স্থাণু সৃষ্টির মধ্যে কোন রহস্য নেই—নৈবংবিধা ভবেৎ

সৃষ্টির্জরামরণবর্জিতা। * জীবনের মধ্যে শুধু নিরঙ্কুশ শুভই থাকবে—তাহলে জীবনের কোন অর্থ থাকে না। শুভের সঙ্গে অশুভের সংঘাত হবে বারবার, তবেই না সৃষ্টির মজা—শুভাশুভাত্মিকা যা তু সৈব সৃষ্টিঃ প্রশস্যতে। এই শুভ এবং অশুভের গতি অনুসারেই পৌরাণিক সমাজ-জীবনের ধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে। দেবতা, ঋষি, রাজা, দানব, রাক্ষস এবং মানুষ—সকলের জীবনেই কাজ করছে এই শুভাশুভের সংঘাত। অন্যদিকে এই শুভাশুভের ইতরবিশেষই কিন্তু দেবতা, দৈত্য-রাক্ষস, মুনি-ঋষি অথবা মানুষের জন্ম।

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, এখনকার সমাজের সূক্ষ্ম অনুভূতির নিরিখে পৌরাণিক সমাজের নীতি-নিয়ম বিচার করা যায় না। কারণ তখনকার সমাজ ছিল শিথিল, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাও নির্ভর করত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ওপর, ইচ্ছার তীব্রতার ওপর। ধরুন আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, আপনি ঘুমোনোর আগেই সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, আপনি সরস চুম্বন করলে সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চুম্বিত স্থানটি পুঁছে দেয়—চুম্বিতা মার্ষ্টি বদনং—আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলে এমন ভাব করে, যেন পাড়ার মুদি মিন্‌সে আসছে—এ রকম বউকে আপনি কি করবেন? আজকের দিনের সামাজিক নীতিবোধে আপনি তো তাকে ত্যাগ করতে পারেন না। আপনি তাকে অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু একেবারে ফেলে তো দিতে পারেন না, দায়িত্বও অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই রকম স্ত্রীর ব্যাপারে আপনি যদি পুরাণজ্ঞ ঋষির পরামর্শ চান, তিনি সহজভাবে বলবেন—ওটাকে বাদ দিয়ে আর একটা বিয়ে কর বৎস, যে তোমাকে ভালবাসবে—তাং ত্যক্ত্বা সানুরাগাং স্ত্রিয়ং ভজেৎ।

পুরাণের কালে সেই সানুরাগা রমণীটি স্বামীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে জানেন? স্বামীকে দেখা মাত্রই সে খুশি-খুশি হয়ে উঠত, কিন্তু স্বামী তার দিকে সানুরাগে তাকালেই তার মুখে ফুটে উঠত লজ্জা-লজ্জা ভাব—দৃষ্ট্বৈব হৃষ্টা ভবতি বীক্ষিতে চ পরাংমুখী। লজ্জা-লজ্জা ভাব থাকলেও সে রমণী কিন্তু ফালুক-ফুলুক করে তাকাবে। ওদিকে বুকের আঁচল সরে গেলে একটু-আধটু খুলেও রাখবে আবার কুৎসিত দেখা গেলে গোপন অঙ্গ ঢাকা দেবে। স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে বাচ্চা ছেলের গালে চুমো খাবে—তদ্দর্শনে চ কুরুতে বালালিঙ্গনচুম্বনম্। এই ছেলেখেলার ফলাফলে উত্তেজিত স্বামী যদি সেই রমণীকে একবার স্পর্শ করে, তাহলেই তিনি পুলকে, আবেগে একেবারে ভেঙে ভেঙে পড়বেন—স্পৃষ্টা পুলকিতৈরঙ্গৈঃ স্বেদেনৈব চ ভজ্যতে।

পুরাণের এই বর্ণনা মিলিয়ে সেই মনোহরা রমণীটি আপনি পাবেন না, যদি বা পান দেখবেন বিয়ে করার উপায় নেই তাকে। কিন্তু পৌরাণিককালে স্ত্রী বর্তমান থাকতেও দেবতা, ঋষি-মুনি, রাজা বা যে কোন মানুষই পুরাণোক্ত সুলক্ষণা রমণীটিকে ঘরে আনতে পারতেন। কারণ, আগেই বলেছি, নীতি-নিয়মের বোধটা ছিল অন্য রকম। পুরাণে ঋষিরা অবশ্য তাঁদের কালের সমস্ত দুষ্কর্ম কিংবা অন্যায়গুলির দায় চাপিয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যৎকালের ওপর।

ঠিক এই কারণেই প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন পুরাণেই কলিকালে কি ঘটবে তার একটা বর্ণনা আছে। অথচ কলিকালে যা ঘটবে বা যা এখন ঘটছে, তার অনেক কিছুই ঘটত

সেই দেবতা, ঋষি বা রাজাদের যুগে। পৌরাণিকেরা একদিকে তত্ত্বগতভাবে এক আদর্শ সমাজের কথা বলছেন, অন্য দিকে আখ্যান এবং উপাখ্যানের মাধ্যমে তাঁরা যা জানাচ্ছেন, তাতে ফুটে উঠছে আদর্শচ্যুতির সম্ভাবনা। সেই আদর্শচ্যুতি একেবারে মানুষের মত করেই ঘটছে, কিন্তু সেই চ্যুতি ঘটাচ্ছেন দেবতারা ঋষিরা এবং মহান রাজারা। বিভিন্ন উপাখ্যানের সঙ্গে সেখানে উপদেশের মিল থাকছে না। বস্তুত পৌরাণিক ঋষিদের যুগে যা ঘটেছিল এবং যা তাঁরা ঘটুক বলে চাইছিলেন না, তারই ছায়া পড়েছে তাঁদের কলিকালের ভবিষ্যৎবাণীতে। অনীপ্সিত এই কলিযুগ আসলে তাঁদেরই কালের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিবিম্ব। পৌরাণিক যুগের কথা বলতে গিয়ে পুরাণ বিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা তাই লিখেছেন—The Puranic chapters on the Kali age are the records of the state of society during the period with which we are concerned here.[৪] প্রধান তথা পুরনো পুরাণগুলির মধ্যে বায়ু, মৎস্য, কূর্ম, ব্রহ্মাণ্ড এবং ভাগবত পুরাণের মধ্যে কলিকালের ধর্ম, আচার, আচরণ ব্যাখ্যা করা আছে। ভারত ইতিহাসের অন্যান্য পুঁজি এবং উপাদানগুলি নিপুণভাবে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব সমাজের যে ছন্দোভঙ্গ এই কলিধর্মে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অনেকটাই দেবতা বা ঋষিদের সমাজের প্রতিচ্ছবি। দেবতার একান্ত মানবায়নের প্রসঙ্গে তাই এই কলিকালকে বাদ দিলে মোটেই চলবে না।

আশি বছরের বুড়ি ঠাকুমা যদি নাতনিকে মিনি-ম্যাক্সি পরতে দেখেন তাহলে প্রথমে চমকে যান, তারপর অনুযোগের সুরে বলেন—কালে কালে কত কি দেখছি, আর কত কিই বা দেখতে হবে। ঠিক একইভাবে পুরাণ-যুগের কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়তো সেকালের কোন আধুনিকা নাতনিকে চুলের কায়দা করতে দেখেছিলেন। ফলে অবধারিত মন্তব্য শোনা গেছে—কলিকালের মেয়েরা শুধু চুলের কায়দা দেখাবে—কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলংকৃতাঃ।[৫] সেই যুগে হয়তো সেই প্রথম মেয়েদের চুলে কাঁটা গুঁজে খোঁপা করার চল উঠেছিল। ব্যাস, বৃদ্ধা নাক সিঁটকে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছেন—কলিকালের মেয়েগুলো সব মাথায় লোহার কাঁটা দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, ঢঙ কত—প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।[৬] নইলে ভগবান বলে চিহ্নিত পুরুষোত্তম কৃষ্ণের প্রিয়তমা আদরিণী সত্যভামা কী চুল নিয়ে কম ঝামেলা করেছিলেন নাকি। স্বর্গে দেখা পারিজাত ফুল খোঁপায় গুঁজে সতীনদের মধ্যে ডাঁটসে ঘুরে বেড়াবেন বলে সত্যভামা যে বায়না করেছিলেন কৃষ্ণের কাছে, তার জন্য কৃষ্ণকে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নন্দনের গন্ধমাতাল সেই পারিজাত স্বর্গ থেকে উপড়ে এনে কৃষ্ণকে তা পুঁতে দিতে হয়েছিল দ্বারকায়। অতএব কলিকালে গৃহিণীকে তুষ্ট করতে আমরাই যে শুধু ব্যস্ত, তা নয়। এ বাবদে মানুষের সঙ্গে ভগবানের কোন তফাৎ নেই। আসলে বৃদ্ধ স্থবিরের কাছে তাঁদের কালের আধুনিকতাই আশঙ্কার রূপ ধরে কলিকালের ধর্মে ঢুকে পড়েছে। পুরাণে বর্ণিত কলিকাল অতএব তাঁদেরই কলি।

॥ ২ ॥

ধর্মের ষাঁড় বলে যে কথাটা সাধারণ্যে চালু আছে, সে কথাটার একটা সময়োপযোগী মানে থাকতে পারে বটে, তবে সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাই—পৌরাণিক ঋষিরা ধর্মের চেহারাটাই কল্পনা করেছেন চতুষ্পদ ষাঁড়ের মতো। বৃষ শব্দের অর্থ নাকি জ্ঞান এবং দেবাদিদেব মহাদেব আসলে বৃষরূপী জ্ঞানবাহন। কথায় বলে, 'জ্ঞানঞ্চ শংকরাদিচ্ছেৎ'। ধর্মকে তাই বৃষের চেহারায় কল্পনা করতে কোন অসুবিধে নেই। এক একটি যুগের শেষে এই চতুষ্পদী প্রাণীর এক একটি পা ভেঙে দিতে পুরাণকারদের বাধেনি। সত্যযুগে ধর্ম একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ, ষাঁড়ের চার পা-ও ঠিকঠাক। কিন্তু সত্যযুগ গিয়ে যেই ত্রেতা এল, অমনি ষাঁড়ের একখানি পা ভেঙে গেল, ধর্ম হল ত্রিপাদ। দ্বাপর যুগে পেছনের দু পায়ে ভর করে ধর্মের ষাঁড় কোনও রকমে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কলিকাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার তিনখানা পা-ই ভেঙে গেল। এ অবস্থায় সমস্ত চাপ নিয়ে একখানা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা খুব কষ্টকর, তবু ঠিক এই অবস্থাতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বালক-বীর পরীক্ষিতের। পরীক্ষিৎ দেখলেন—কে একটা লোক, রাজা-রাজা চেহারা বটে, সে ধর্মের ষাঁড়কে একটা ঠ্যাঙা দিয়ে মারে আর কি। তাড়নার ভয়ে ষাঁড়টি ঠক-ঠক করে কাঁপছে এবং প্রস্রাব করে ফেলেছে—ভয়াৎ মূত্রয়ন্নিব।[১] পরীক্ষিৎ বললেন, খুব সাবধান।

তিন পা-ভাঙা ষাঁড়। তার ওপরে তাড়নার ভয়। পরীক্ষিৎ ষাঁড়কে দেখে করুণাগ্রস্ত হলেন, আর রেগে উঠলেন রাজা-পানা লোকটাকে দেখে। দুজনকেই পরিচয় জিজ্ঞেস করতে ষাঁড় বলল—আমি ধর্ম। রাজা-পানা লোকটি বলল—আমি কলিকাল। দ্বাপর যুগ শেষ, তাই জায়গা নিতে এসেছি। পরীক্ষিৎ তাঁর বাপ-পিতামহ এবং স্বনামধন্য কৃষ্ণের পুরাকীর্তি স্মরণ করে বললেন—এত বড় কথা। এই সমগ্র ব্রহ্মাবর্ত, যেখানে নানা যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর উপাসনা করছেন—যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ—সেখানে তোমার ঠাঁই হবে না জেনো। কলি বলল—তাহলে আমি থাকব কোথায়? যুগের টান তো আর উল্টো হতে পারে না। পরীক্ষিৎ বললেন—তাও তো বটে। তাহলে এক কাজ কর। তুমি থাক, যেখানে তাস-পাশা খেলা হয়, যেখানে মদ, যেখানে মেয়েছেলে, আর যেখানে মানুষে মানুষে হানাহানি—এই চার জায়গায় থাক তুমি। কলি বলল—আর একটু জায়গা দেবেন না? করুণাবশত পরীক্ষিৎ কলিকে সোনাচাঁদির জায়গাটাও ছেড়ে দিলেন—পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।[২] পাঁচ নম্বর এই সোনাচাঁদির জায়গাটার ছেড়ে দেওয়ার ফলে—তাস-পাশা, মদ-মেয়েছেলে এবং মারামারি—এই সবগুলির সঙ্গে যোগ হল টাকাপয়সার।

কলির সর্বগ্রাসী হাঁ-মুখটাকে মাত্র পাঁচ জায়গায় সীমায়িত করতে পেরে এবং একপেয়ে ধর্মকে আপাতত বাঁচাতে পেরে পরীক্ষিৎ খুব খুশি হলেন বটে কিন্তু অনভিজ্ঞ পরীক্ষিৎ 'কলির সন্ধ্যা' কথাটির অর্থ বোঝেননি। তিনি বোঝেননি সকালবেলায় রাত্রিদিনের সন্ধিক্ষণে দিনের ভাগ যতটুকু থাকে, রাতের ভাগও ততটুকুই থাকে। তিনি বোঝেননি যে কলি-মহারাজকে চাক্ষুষ দেখাটাই কলির আরম্ভ নয়—গোলমালটা আরম্ভ হয়েছে দ্বাপর যুগ থেকেই। এমনকি তিনি এ-ও বোঝেননি যে, তাঁর

বাপ-পিতামহেরাও ছিলেন কলির পোষ্য। একটা কথা জনসমাজে চালু আছে যে, কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের লোক। মোটেই নয়। কৃষ্ণ আমাদের মতোই কলিযুগের মানুষ, একেবারে আক্ষরিক অর্থে 'কলির কেষ্ট'। হরিবংশে লক্ষ করবেন—দানবরাজ কালযবনকে হত্যা করার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মুচুকুন্দের সামনে নিয়ে এসেছেন। কালযবন মথুরাবাসীর অবধ্য ছিল এবং মুচুকুন্দের ওপর দেবতাদের আশীর্বাদ ছিল যে, তাঁর ঘুম ভাঙলেই তাঁর চোখের সামনে যে আসবে, সেই পুড়ে যাবে। কৃষ্ণ ঘুমন্ত মুচুকুন্দের আলো-আঁধারি গুহায় প্রবেশ করলেন, পেছন পেছন কালযবন। কৃষ্ণ মুচুকুন্দের চোখ এড়িয়ে দূরে দাঁড়ালেন। এদিকে কালযবন মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ মনে করে তাঁর ঘুম ভাঙালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভস্মসাৎ। কিন্তু এবারেই হল আসল মজা। ঘুম ভেঙে মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে দেখে ভাবলেন—ব্যাপারটা কি? এরকম একটা খুদে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—বাসুদেবমুপালক্ষ্য রাজা হ্রস্বং প্রমাণতঃ।[৯] মুচুকুন্দ বললেন—আপনি কে? আপনি কি বলতে পারেন ঘুমন্ত অবস্থায় আমার কতদিন কেটেছে? কৃষ্ণ বললেন, আজ্ঞে, আমি যদুবংশের ছেলে, আমার নাম কৃষ্ণ বাসুদেব। আপনি সেই ত্রেতা যুগ থেকে ঘুমোচ্ছেন—এখন কলিযুগ চলছে, এবারে বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি—ইদং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যৎ করবাণি তে।[১০]

ব্যাখ্যাটা মানবেন কিনা জানিনা, তবে মুচুকুন্দের এই দীর্ঘ নিদ্রার একটা ব্যঞ্জনা আছে। আসলে কালের পরিবর্তন যখন দ্রুত ঘটতে থাকে, তখন প্রাচীন রক্ষণশীল বৃদ্ধরা চোখ বুঁজে সেই পরিবর্তনকে মনে-প্রাণে অস্বীকার করতে থাকেন। রক্ষণশীলতা এবং পরিবর্তন—এই দুয়ের সংঘর্ষে তাদের মধ্যে এক বিরূপ অন্তঃক্রিয়া চলতে থাকে। যাঁরা পরিবর্তনকে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারেন না, তাঁরা অক্ষম অনুযোগে কখনও একেবারে চুপ হয়ে যান, কখনও বা পুরাতনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। অর্থাৎ আমাদের কালে কী দেখেছি, আর এখন কী হল? বাস্তবে কিন্তু সাভিমানে চুপ করে যাওয়া বা নতুনকে অস্বীকার—দুটোই আমার মতে ঘুমের শামিল। এই ঘুম যখন ভাঙে অথবা যদি কখনও কৃষ্ণের মত অসাধারণ কেউ নূতনের মহত্ত্ব নিয়ে পুরাতনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘোষণা করেন, তখনও তাঁর একমাত্র প্রতিক্রিয়া—সবাইকে ছোট করে দেখা। অর্থাৎ তিনি সবাইকে আপন যুগের তুলনায় ছোট দেখেন, খাট করে দেখেন।

ঘুমচোখ ঘষে মুচকুন্দ গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন কলিযুগের প্রকৃতি দেখবার জন্য। দেখলেন পৃথিবী বেঁটে আর ক্ষুদে মানুষে ভরে গেছে—ততো দদর্শ পৃথিবীম্ আবৃতাং হ্রস্বকৈ র্নরৈঃ। তাদের উৎসাহ, শক্তি, পরাক্রম সবই কেমন কম কম। তিনি আর এই স্বল্পবল পৃথিবীকে বাসযোগ্য মনে করলেন না, চলে গেলেন হিমালয়ে। অবতারবাদী সংরক্ষণশীলেরা মনে করেন এই যে কৃষ্ণের মুখে পষ্টাপষ্টি কলিযুগের কথা শোনা গেল, এটা নাকি দ্বাপর-কলির সন্ধিলগ্ন। আমরা বলি 'ইদং কলিযুগং' বললে কি কোন সন্ধিলগ্ন বোঝায়? তাছাড়া প্রমাণ তো আরও রয়ে গেছে। স্বনামধন্য পরশুরাম বিষ্ণুপুরাণের যে অংশ অবলম্বনে 'রেবতীর পতিলাভ' গল্পটি লিখেছিলেন, সেখানেও রেবতীর বাবা ব্রহ্মার আসরে নাচ-গান শুনে এসে দেখেন পৃথিবীতে কলিকাল এসে গেছে—আসন্নো হি তৎ কলিঃ। তাঁর অবস্থাও হয়েছিল মুচুকুন্দের মতোই। বেশ

কিছুদিন 'স্পেসে' কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে রৈবত ককুদ্মী দেখলেন তিনি একেবারে একা হয়ে গেছেন আর পৃথিবী অল্পশক্তি ক্ষুদে মানুষে ভরে গেছে—দদর্শ হ্রস্বান্ পুরুষান্ অশেষাম্/অল্পৌজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্যান্ ।[১১]

তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি কৃষ্ণ, বলরাম, পাণ্ডব, কৌরব—এরা সবাই আমাদের মতো বেঁটে-খাটো কলিযুগের মানুষ এবং পুরাণের ইতিহাস মানে প্রায় কলিযুগেরই ইতিহাস। নৃতাত্ত্বিকেরা কি বলবেন জানি না, তবে পুরাণজ্ঞ ঋষিদের ধারণা ছিল—মানুষের চেহারা ক্রমেই বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। তবে বেঁটে-খাটো হলে হবে কি, এদের বুদ্ধি কম ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চতুর্যুগের ভাবনা ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র কোথাও নেই—অন্যত্র ন ক্বচিৎ। তবে নিবিষ্ট মনে পুরাণগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—আসলে মনুষ্যত্বের ক্রম-ক্ষীয়মান ইতিহাস অথবা উল্টোদিক দিয়ে জটিলতার ক্রম-বর্ধমান ইতিহাস। আমাদের কালের প্রাচীনদের কাছে প্রায়ই শুনি যে, তাঁদের যুগটা ছিল অন্য রকম। লোকের ধর্মভীতি ছিল, শৌচ, আচার ছিল, আর মেয়েরা ছিল সব দারুণ ভাল। আমাদের পৌরাণিকেরা ঠিক একইভাবে বলেছেন যে, সত্যযুগে যেমন সুদিন ছিল, ত্রেতাযুগে তা ছিল না, দ্বাপরের অবস্থা বেশ খারাপ আর কলিকালের তো কথাই নেই।

পুরাণকাহিনীতে সত্যযুগের কল্পনায় যে অনন্ত মাহাত্ম্য আছে তাতে মনে হয় সে সমাজটা ছিল একেবারে বিকারহীন, একেবারে নিরেট। মানুষ ভাল, মন ভাল, আচার আচরণ সব ভাল। শোক-তাপ, দুঃখকষ্ট, লোভ-মাৎসর্য, ধর্মাধর্ম কিছুই নেই। এই কাল্পনিক সমাজ খুব ভাল হতে পারে, তবে বিকারহীনতা জড়তারই নামান্তর। সত্যযুগের এত মাহাত্ম্যের মধ্যেও কূর্মপুরাণ লক্ষ করেছে যে, সে যুগের মানুষেরা ছিল নির্জনতাপ্রিয় এবং তাদের বাসস্থান বলে সঠিক কিছু ছিল না—অনিকেতাঃ। সমুদ্রতীর আর পর্বতের গুহাই ছিল তাদের থাকবার জায়গা—পর্বতোদধিবাসিন্যঃ। পুরাণের মতে, সমস্ত জটিলতার সূত্রপাত ঘটে ত্রেতা যুগে। এই জটিলতার সঙ্গে যে অর্থনৈতিক কারণের যোগ ছিল, সেটাও কূর্মপুরাণ লক্ষ করেছে। আগে হাজার হাজার গাছই মানুষকে জীবন ধারণে সাহায্য করত, কিন্তু হঠাৎ তাদের মধ্যে কামনা আর লোভ দেখা গেল—কামলোভাত্মকো ভাব স্তদা হ্যাকস্মিকো ভবৎ।[১২] কূর্মপুরাণ বলেছে, এই কামনা আর লোভের ফলেই মানুষের সমস্ত বৃক্ষাবাসগুলি নষ্ট হয়ে গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এ হল সেই যুগ, যখন বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীরা এক বনের খাবার শেষ করে আরেক বনে পৌঁছচ্ছিলেন। কারণ পুরাণের বার্তামতো মানুষের অনুতাপে আবার বনবৃক্ষেরা তাদের ঘরবাড়ি দিয়েছে, খাবার ফল দিয়েছে, দিয়েছে লজ্জাবস্ত্র—বল্কলবাস। গাছের 'পুটকে পুটকে মধু'—ভালই ছিল প্রজারা। কিন্তু পুরাণ বলেছে—কালক্রমে আবার মানুষের মধ্যে লোভ দেখা গেল। মানুষেরা জোর করে যে গাছ থেকে যত মধু পাবার নয়, তার চেয়ে বেশি মধু সংগ্রহ করা আরম্ভ করল—বৃক্ষাংস্তান্ পর্যগৃহ্নন্ত মধু চামাক্ষিকং বলাৎ।[১৩]

যতটুকু ব্যবহারে গাছ জীর্ণ হয় না, তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করার ফলেই বনগুলির মরণদশা উপস্থিত হচ্ছিল। আর এই যে বার বার গাছেরা জন্মাচ্ছে, লুপ্ত হচ্ছে, আবার জন্মাচ্ছে—এই বর্ণনা পশুপাখি যাযাবর আর্যজাতির আরণ্যক স্মৃতিমাত্র। কূর্মপুরাণ

বুঝিয়ে দিয়েছে—শুধুমাত্র গাছের ছায়া আর বনের ফলের অপ্রতুলতার জন্যই মানুষ পাকাপাকিভাবে বাড়িঘর বানানোর প্রেরণা পেল ; শীত, বর্ষা আর রোদের কবল থেকে বাঁচতে এবার তারা বাড়ি তৈরির কায়দা শিখেছে। গাছের ডাল যেমন একটা সামনে, একটা পেছনে, একটা এপাশে, একটা ওপাশে বেড়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেই বুদ্ধিতেই মানুষ বাড়ি বানানো শিখেছে। গাছের শাখার শিক্ষা থেকে বাড়ি তৈরি হয় বলেই বাড়ির নাম 'শালা'—বুধ্বাস্থিষ্যংস্তথা ন্যায়ো বৃক্ষশাখা যথা গতাঃ। তথা কৃতাস্তু তৈঃ শাখাঃ...। গাছগুলি একের পর এক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এই বিনাশের আশঙ্কার মধ্যেই জন্ম নিল কৃষিকর্মের সুপরিকল্পিত ভাবনা, পশুপালনের চিন্তা—বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্। তবে ত্রেতা যুগের প্রথম কৃষিকর্মে নাকি লাঙল লাগত না, বীজও লাগত না—অফালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা। আসলে পৌরাণিকের রূপকথায় লাঙল ব্যবহারের চেষ্টা, অপচেষ্টা এবং অবশেষে সার্থকতার ইতিহাসটুকু বেমানান। তাই লাঙল আর বীজ ছাড়াই সেখানে কৃষিকর্ম সম্পন্ন হয়।[১৪]

ঠিক এইরকম একটা সময়েই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সম্পত্তির চেতনা জন্মাল। কেননা পুরাণ বলেছে—ত্রেতাযুগের কালধর্মে মানুষের মধ্যে আবার লোভ জন্মাল এবং তারা জোর করে নদী, পাহাড়, জমি, গাছপালা, ওষধি—একের পর এক দখল করতে লাগল—ততস্তে পর্যগৃহ্নন্ত...প্রসহ্য তু যথাবলম্।[১৫] ঠিক এই গোষ্ঠীগত অধিকারের পালা যখন চরম আকার ধারণ করল, তখনই বোধহয় সেই মানুষটা জন্মালেন, যাঁর নাম পৃথু। এঁর নাম থেকেই এই মর্ত্যভূমির নাম পৃথ্বী অথবা পৃথিবী। বস্তুত পৃথুই ভারতবর্ষের প্রথম রাজা, যিনি সাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন এবং পৃথিবীর গর্ভ থেকে শস্য বার করে নিয়ে আসেন।

ত্রেতাযুগের যে সময়টাতে মানুষ ভীষণ লোভী হয়ে উঠেছিল এবং যে সময়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করতে শস্য উৎপাদন করতে শিখে গেল, এই সময়টার সঙ্গে পৃথু মহারাজের অবশ্যই একটা যোগ আছে। একটা কথা বোঝা দরকার, পৃথুর কথা সমস্ত নামী পুরাণগুলিতে পাওয়া যাবে। কেননা তিনিই স্বেচ্ছাচালিত দখলদারির মধ্যে প্রথম শৃঙ্খলা এবং সভ্যতা নিয়ে আসেন। আরও লক্ষ করার বিষয় হল—পুরাণগুলি যেখানে পৃথুকে ভগবানের অবতার বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি—সেই অবতারপুরুষ আদি ধর্মরাজের জন্ম কিন্তু প্রায় জীবন্ত এক অধর্মপুরুষের দেহ থেকে। পৃথুর বাবার নাম বেণ, যাঁর প্রথম পরিচয় ছিল—তিনি ধর্ম মানতেন না। সেচ্ছাচার এবং লোভই ছিল তাঁর একমাত্র বিলাস—স ধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভে ব্যবর্ত্তত।[১৬] ঠিক এই ব্যবহার আমরা সম্পত্তিগ্রাসী মানুষগুলির মধ্যেও পেয়েছি। নদী, পাহাড়, জমির দখলদারি নিয়ে যে চরম অবস্থা হয়েছিল তার একটা প্রতীকী আচরণ আছে এই বেণের মধ্যে। বেণ নাকি বলতেন—আমার চেয়ে বড় আবার কে আছে, আমি ছাড়া আর কেই বা আছে যাকে আরাধনা করা যায়—মত্তঃ কো'ভ্যধিকো'ন্যো'স্তি যশ্চারাধ্যো মমাপরঃ।[১৭] সমস্ত যজ্ঞে পুজো করতে হবে আমাকেই—অহমিজ্যশ্চ পূজ্যশ্চ। এটা বুঝতে হবে যে, সভ্যতার প্রথম লগ্নে বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বলশালী তাঁর কাছে এই ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়। দু-একটি পুরাণ বলেছে প্রথম রাজা হওয়ার কৃতিত্ব নাকি বেণেরই, পৃথুর নয়। তবে সব পুরাণই এ ব্যাপারে এককাট্টা যে, বেণের স্বেচ্ছাচার চরমে উঠলে ঋষিরা সব একজোট হলেন। আমরা অবশ্য ঋষিদের কথা

বলি না, বলি, শুভকামী মানুষেরা সংঘবদ্ধ হলেন। একথা বলি এইজন্যে যে, সব পুরাণের মতেই পৃথুর পূর্ববর্তী সময়ে কোন সভ্যতা ছিল না। এমনকি পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত ছিল অসমান—বিষমাসীদ্ বসুন্ধরা। পৃথুর আগে গ্রাম-শহরের কোন বিভাগই ছিল না, ছিল না কৃষিকর্ম। শস্য কিংবা পশুপালন। ব্যবসাবাণিজ্যের তো কথাই নেই—ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিক্‌পথঃ[১৮]। ঠিক এই অবস্থায় কোথায় বা যজ্ঞ, কোথায় বা ঋষি! তাই বলেছি শুভকামী মানুষেরা একজোট হলেন। পৌরাণিকেরা বলেছেন ঋষিরা বেণ-রাজাকে শাপদগ্ধ করে জীবন্ত অবস্থাতেই তাঁর বাহু দুটি মন্থন করতে থাকলেন। বাঁ হাতটি মন্থনের ফলে জন্মাল নিষাদেরা, আর ডান হাত মন্থনের ফল হলেন পৃথু।

আমরা আবার একটু আগের কথায় চলে যাই। আসলে আমাদের সেই ইলাবৃতবর্ষের স্বর্গছেড়া দেবতারা ভারতের মর্ত্যভূমিকে কিছুতেই বশে আনতে পারছিলেন না। বেণই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অস্বীকার করে বসেন। ঋষিরা কথায় কথায় ইন্দ্র-বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করবেন—এ তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি দেবতার অধিকার অস্বীকার করে বললেন—আমিই সব—ঘোষায়মাস স তদা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ। বেণের বক্তব্য—যজ্ঞ করতে হয় আমার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ কর, আহুতি দিতে হয় তো আমাকেই দাও, আর দান করতে হলেও সেই দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র আমি। যজ্ঞাধিপতি কখনই ইন্দ্র বা বিষ্ণু নন, যজ্ঞাধিপতি হলাম আমি স্বয়ং—অহং যজ্ঞপতি প্রভুঃ। বেণের এই বিদ্রোহের জন্য দেবসমাজকে কিছু করতে হয়নি। তাঁদের প্রতিভূ ঋষিরাই তাঁদের ঈপ্সিত কাজটি করে দিয়েছেন। বেণের দুই বাহু মন্থন করার মধ্যে যে রূপকই থাক না কেন, ঋষিরা বেণের পর এমন একজনকে সিংহাসনে বসাতে পেরেছেন, যিনি আর্যায়নের তাগিদ মেনে নিয়েছেন এবং যিনি দেবতা-ঋষির কর্তৃত্ব এবং প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন। এই মেনে নেওয়ার ফলেই পৃথুও পরবর্তী কালে ভগবানের অন্যতম অবতার বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অন্যদিকে বেণের অন্য বাহু থেকে বেরিয়ে আসা নিষাদদের অস্তিত্ব স্বীকার করে ঋষিরা বুঝিয়ে দিলেন ভারতবর্ষে অতি-দাক্ষিণ্যযুক্ত দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বামস্বভাব নিষাদ-মানুষও রইল। তবে এ সব হল ত্রেতা যুগের কথা অর্থাৎ আমার মতে কলির দ্বিতীয় 'ফেজে'র কথা।

জনসাধারণ বিপ্রতীপ স্বার্থপর আচরণের প্রতীক বেণ তো ধ্বংস হলেন। পৃথুও ব্রহ্মার আদেশে গোরূপা পৃথিবী দোহন করে তাকে শস্যশালিনী করে তুললেন। কিন্তু মুশকিল হল, এতে সবার অন্ন-পানের ব্যবস্থা হলেও জমি নিয়ে ঝগড়াটা বোধহয় চলছিলই। কূর্মপুরাণের পরবর্তী বচন থেকে সেটা বোঝাও যায়। সম্পদ এবং তার মালিকানা নিয়ে যে অর্থনৈতিক অভিসন্ধির কথা পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেন তার মূল বোধটা এসেছিল বোধহয় জমি আর স্ত্রীলোক নিয়েই। পুরাণের অন্যত্র সমস্ত স্ত্রীলোকেরাই অবশ্য এক ধরনের জমি বলেই স্বীকৃত। পৃথু মহারাজের জমানায় পৃথিবী দোহন করে অন্ন-বস্ত্র পাওয়া গেলেও স্ত্রীলোক আর ধনসম্পত্তি নিয়ে লড়াই চলছিল। এমনকি যাদের স্ত্রী এবং ধনসম্পত্তি দুই-ই ছিল, তারাও ছিল এই লড়াইতে সমান অংশীদার। তারা পরস্পরের জমি এবং বউ নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করেছিল—ততস্তা জগৃহুঃ সর্বা হ্যন্যোন্যং ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ। আপ্তদারধনাদ্যাস্তু বলাৎ

কালবলেন চ ।।[৮] পুরাণ লিখেছে—ঝগড়াটা হচ্ছিল কালবশে, গা-জোয়ারি করে। কিন্তু আমরা বলব—ঝগড়ার মূলটা মহাকালের গভীর নয়, মালিকানার তত্ত্ববোধে। ঠিক এই কারণেই দুটো নিয়ম করতে হল, এবং তা করতে হল স্বয়ং ব্রহ্মাকে।

প্রথম বিধান অবশ্যই স্ত্রীসংক্রান্ত। সৃষ্টির আরম্ভেই প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যাগমনের সংবাদে যদি কোন রূপকই থাকে, তবুও সভ্যতার আদিতে সাধারণের মধ্যে যে মৈথুন সংক্রান্ত কোন বিধি-বিধান ছিল না, বরঞ্চ দারুণ শিথিলতা ছিল, এটা ভাবাই স্বাভাবিক। পৌরাণিকেরা বলেছেন ব্রহ্মার দেহটি দুভাগ হয়ে একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রীরূপ তৈরি হল। ঠিক এই অবস্থায় দ্বিধাভিন্ন অর্ধেক মানুষ হয়ে জন্মাবার ফলে এদের পারস্পরিক মিলনের টান তাই রয়েই গেল, রয়ে গেল সম্পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছে। দুইয়ের এই পারস্পরিক মিমীলিষা বা মিলনের ইচ্ছেই হল কাম, যে কামনা রূপ ধারণ করেছে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকলায়।

পুরাকালে বিবাহ বলে কোন সামাজিক বন্ধন ছিল না। যা ছিল তা অথর্ববেদের কায়দায়—এ মেয়েমানুষ, এ পুরুষ মানুষ, একজন যুবক, অন্যজন যুবতী—এও যৌন মিলন করেনি, অন্যজনও নয়—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। দুজনে মিলনের জোড় বাঁধলেই মিথুন এবং তাদের মিলনকর্ম মৈথুন। ব্রহ্মা নিজকন্যা সরস্বতীর সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ করে—হ্যাঁ মিলন সম্পূর্ণ করেই—মিলনের দেবতাকে শাপ দিয়ে বললেন—তুমি শিবের চোখের আগুনে ভস্ম হবে। কাম বললে -সে কি কথা! আপনিই না আমাকে এরকম করে স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয় ক্ষোভ জন্মাতে বলেছেন। আপনি আমাকে বলেছেন—পুরুষ আর রমণী হলেই হল—স্ত্রীপুংসোরবিকারেণ—দুজনের মন একেবারে উথাল-পাথাল করে দেবে—ক্ষোভ্যং মনঃ প্রযত্নেন ত্বয়ৈবোক্তং পুরা বিভো। এখন আপনিই আমাকে দুষছেন? সত্যিই তো সৃষ্টির আদিতে কামনার দেবতা কি করে মনুষ্য সম্পর্কের কথা বুঝবে! মাতা, কন্যা, পিতা, পুত্র—এ সব সামাজিক সম্পর্ক অনেক পরের ব্যাপার। পৌরাণিকদের বিশ্বাস ছিল পুরাকালে ব্রহ্মা নাকি জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষ তৈরি করেছিলেন। তাদের মনে নাকি অদ্ভুত এক আনন্দ হওয়ায়—ততো বৈ হর্ষমানাস্তে—তারা কামনায় পরস্পর মৈথুনে প্রবৃত্ত হল—অন্যোন্যা হৃচ্ছয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমে।[১৯] তাদের সুবিধে ছিল বিরাট। তারা যত মৈথুনই করুক, তাদের ছেলেপুলে হত না, কারণ তখন নাকি রমণীদের মাসে মাসে ঋতুকাল ছিল না। কাজেই প্রচুর মৈথুনের পরেও—সবিতৈরপি মৈথুনঃ—রমণীরা পুত্র-কন্যা প্রসব করত না। সেই মিথুনজাত মানুষেরা নাকি আয়ুশেষে একেবারে আরও একটি যুগল ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়ে স্বর্গত হত।

তবে এ সব সত্য যুগের কথা। ত্রেতা যুগেই লোকজন প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় পৌরাণিকেরা বুঝতে পেরেছেন—মাসে মাসেই স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ঘুরে আসে আর মাসে মাসে মিলনের ফলেই—মাসি মাস্যুপগচ্ছতাম্—গর্ভোৎপত্তিও হয়। কিন্তু এই গর্ভোৎপত্তির মধ্যে শৃঙ্খলা আসেনি তখনও। সমাজে বিবাহ বস্তুটা কি অথবা নিদেনপক্ষে মৈথুন-বদ্ধ পুরুষ কিংবা নারী পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ কিনা—সেই সামাজিক সমস্যা তখনও তৈরি হয়নি। পুরাণকারেরাও প্রায় কোথাও নির্দিষ্ট করে বলেননি, যে, স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনে শৃঙ্খলা ব্যাপারটা কি করে এল। তবে

হ্যাঁ, খোদ মহাভারতের মধ্যে পৌরাণিক কথাবার্তা কিছু আছে। আমরা যদি সেখান থেকে স্ত্রী-পুরুষের প্রাথমিক ব্যবহারের একটা হদিশ পাই, তাতে পুরাণের মর্যাদা কিছু কমে না।

মহাভারতে মহারাজ পাণ্ডু যখন 'ছেলে হল না, ছেলে চাই' বলে পাগল-পারা হয়ে উঠলেন, তখন কুন্তী অনেক ধর্মকথা শোনালেন। দোষের মধ্যে পাণ্ডু বলেছিলেন—একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে একটি পুত্র জন্মের সাধন কর, কুন্তী! কুন্তী বড়ো দুঃখিত হয়ে এক পতিব্রতার কাহিনী শোনালেন বটে তবে ভুলেও তাঁর কুমারীকালের সূর্য-সম্ভোগ বর্ণনা করলেন না। পাণ্ডু তখন ভালো মানুষের মেয়ে কুন্তীকে বললেন—দেখ বাপু, তুমি কি জান যে, এককালে মেয়েদের দুয়োর ছিল সবার জন্য খোলা—অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে। তারা ছিল স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাবিহারী। তারা যে কোন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারত এবং তাতে কোন অধর্ম ছিল না, বরঞ্চ সেইটাই ছিল ধর্ম—স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ। পাণ্ডু বললেন—কুন্তী। তুমি হয়তো আমার কথা মানতে চাইবে না, কিন্তু প্রমাণ দিলে তো তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ—এখনও উত্তরকুরু দেশে এমনি প্রথাই চালু আছে—উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষু অদ্যাপি পূজ্যতে।[২০]

উত্তর-কুরু দেশটা কোথায় জানেন? পণ্ডিতেরা বলেন—মধ্য এশিয়ার পামির বা পূর্ব তুর্কীস্থান যদি ইলাবৃত-বর্ষ হয় এবং সেটা যদি স্বর্গ হয় তবে তারও উত্তরে হল 'উত্তর-কুরু'। গিরীন্দ্রশেখর লিখেছেন—ওটাই ব্রহ্মলোক এবং বিষ্ণুলোক। ঋগ্‌বেদে আছে বিষ্ণু 'উন্নত' অর্থাৎ উত্তরদেশবাসী এবং তাঁর রাজ্যে প্রচুর শৃঙ্গী হরিণ পাওয়া যায়—ভূরিশৃঙ্গাঃ গাবঃ। গিরীন্দ্রশেখর আরও লিখেছেন—"পৌরাণিক নির্দেশ অনুসারে মনে হয় বিষ্ণুর রাজ্য ক্যাসপিয়ন সাগরের উত্তরে ছিল। হিন্দু তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী ক্যাসপিয়ন সাগরের তীরে যাইতেন তাহার প্রমাণ আছে। (দ্রষ্টব্য : 'বাকুতে হিন্দুমন্দির' নামক প্রবন্ধ : নূতন পত্রিকা, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)। উত্তর কুরু সাইবিরিয়া বা রাশিয়ার কোন স্থান বলিয়া মনে হয়। উপনিষদে ব্রহ্মলোক যাইবার পথে 'আর' হ্রদ ও বিজরা নদীর উল্লেখ আছে। আর হ্রদ ও Lake Aral বোধ হয় একই। বিজরা ও আধুনিক Pechora একই বলিয়া মনে হয়।[২১]

উত্তর-কুরু ব্রহ্মলোক কি বিষ্ণুলোক সে কথা স্পষ্ট করে জানি না বটে, কিন্তু পাণ্ডু যে উত্তরকুরুর সমাজ-সচল একটি প্রথার উল্লেখ করেছেন, সে যে দেব-সমাজেরই নিয়ম-কানুন, তা স্বীকার করে নিতে দোষ নেই বোধহয়। এখন পাণ্ডুর কথার সূত্র ধরে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি—কবে থেকে এসব নিয়ম চালু হল যে, মেয়েরা স্বামীর ঘরেই থাকবে?

পাণ্ডু বলতে থাকলেন। পাণ্ডু যা বললেন, তা তাঁর কালের পুরাণ কথা। অবশ্য পাণ্ডু যে সময়ের কথা বললেন তাতে দেখা যাচ্ছে তখন স্ত্রীলোক একটি পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধা আরম্ভ করেছে। পাণ্ডু বললেন—মহর্ষি উদ্দালকের ছেলে হলেন শ্বেতকেতু। পাঠক! এই দুজনেই উপনিষদের নাম-করা মুনি, কাজেই পাণ্ডু হয়তো উপনিষদের যুগের বৃত্তান্ত বলছেন, তাও হতে পারে। পাণ্ডু বললেন—পুত্র শ্বেতকেতু একদিন দেখলেন, তাঁর মাকে তাঁর বাবার সামনেই আরেক বামুন এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বামুন এসে তাঁর মার হাত ধরে বলল—চল, আর মাও চললেন। জোর করে

নয়, এমনিই। কিন্তু পুত্র শ্বেতকেতুর মনে হল যেন জোর করেই তাঁর মাকে নিয়ে গেল ওই বিটলে বামুনটা—নীয়মানাং বলাদিব। কিন্তু জোর করে যে নয় তার প্রমাণ দিলেন স্বয়ং তার বাবা। ক্রুদ্ধ শ্বেতকেতুকে দেখে তাঁর বাবা বললেন—এত রাগের কি হয়েছে বাছা! এই তো চিরকালের ধর্ম—মা তাত কোপং কার্ষীঃ ত্বমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।[২২] তুমি কি জান না বাবা, মেয়েরা হল সব ছাড়া-গরুর মত—যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত। যখন যে ইচ্ছে, যে কোন বর্ণের পুরুষ-পুঙ্গব যে কোন স্ত্রীলোককে ভোগ করতে পারে—অনাবৃতা হি সর্বেষাং বর্ণানাম্ অঙ্গনা ভুবি। শ্বেতকেতুর বাবা উদ্দালক যে যৌন ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন সেটা বোঝা যায়। কেননা এই উদ্দালক উপায় থাকা সত্ত্বেও শিষ্যকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সুযোগ দিয়ে শ্বেতকেতুর জন্ম দিয়েছিলেন—উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুং জনয়ামাস শিষ্যতঃ।

শ্বেতকেতু সব শুনলেন বটে কিন্তু সেদিন থেকেই তিনি এই নিয়ম বেঁধে দিলেন যে, কোন মেয়েই তার স্বামীকে অতিক্রম করে অন্য পুরুষের সঙ্গ করতে পারবে না। পাণ্ডু বললেন—শ্বেতকেতুর এই বচনের পর থেকেই সমাজে এটা পাপ বলে গণ্য হচ্ছে—অদ্য প্রভৃতি পাতকম্। নচেৎ পাণ্ডুর ভাবটা এই যে, অন্য পুরুষের সঙ্গ কিছু দোষের নয়। বিশেষত পুত্রার্থে। বিশেষত স্বামীই যখন এই নিয়োগে অনুমতি দিচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কি, পাণ্ডু যেখানে কুন্তীকে উত্তরকুরু দেশের রমণীকুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে আপন স্ত্রীর পতিব্রতা-বাতিক ভাঙার চেষ্টা করছেন, তাতে বেশ বুঝি তাঁর কালে এই ধরনের সামাজিক শিথিলতা ছিল।

আমাদের আলোচ্য প্রধান পুরাণগুলির মৌলাংশও যেহেতু মহাভারতের যুগের বেশি পরে লেখা নয়, তাতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে পারে যে, পুরাণের যুগেও সামাজিক শিথিলতা ছিল যথেষ্ট, যদিও সাধারণ মেয়েমানুষকে পতিব্রতার দীক্ষা দিতে পৌরাণিকেরা ছিলেন শুধুমাত্র মৌখিকভাবে দায়বদ্ধ। পুরুষ মানুষেরা স্ত্রীসংক্রান্ত বিষয়ে নিজেরা দায়হীন, আচরণহীন, অথচ স্ত্রীলোকের কর্তব্য বিষয়ে তাঁদের এই যে মৌখিকতা—এ মৌখিকতার একমাত্র কারণ হল—তাঁরা নিজেরা বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের স্ত্রীরা অন্য পুরুষের মোহগ্রস্ত হলে মানসিক স্থিরতা নষ্ট হয় বটেই। তবু বলব এই যে শিথিলতা—এর বেশির ভাগটাই দেবতা, ঋষি বা পৌরাণিক রাজাদের নিজের কালের নয়, এ তাঁদের পূর্বকালের। মৎস্যপুরাণ থেকে একটি কাহিনী উদ্ধার করলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মৎস্যপুরাণের এই ঘটনা মহাভারতে আছে, এমনকি ঋগ্বেদেও আছে। কাজেই এই শিথিলতা পৌরাণিকদের পূর্বকালের, যা তাঁরা তাঁদের কালেই পুরাণো ঘটনা বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা একই বংশে পর পর দুটি শিথিলতার উদাহরণ দেব। তবে সামজ এখন সেই পর্যায়ে নেই যেখানে রমণীরা গাভীর মত উন্মুক্ত। সমাজে এখন বিবাহাদি চালু হয়ে গেছে এবং পরপুরুষের আনাগোনায় নারীরাও বিব্রত বোধ করতে আরম্ভ করেছে। দেবতা, মুনি এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা সকলেই এখন বিবাহ ব্যাপারটা বোঝেন, কিন্তু সময় বুঝে মানুষ দেখে রমণীরা হৃদয় বা শরীর লাভের জন্য তাঁরা এখনও সাধারণ মানুষের মতই নিয়ন্ত্রণহীন। ঘটনাটা বলি।

উশিজ মুনির স্ত্রীর নাম মমতা আর উশিজের ছোট ভাই স্বনামধন্য বৃহস্পতি। বিবাহিত মহিলা হলেও মমতার চেহারা ভারী সুন্দর—মমতা বরবর্ণিনী। একদিন

বড়দাদা উশিজের অনুপস্থিতিতে উতলা বাতাস আর যৌবনের অভিসন্ধিতে বৃহস্পতি মমতার মিলন কামনা করলেন—মমতামেত্য কামতঃ। মমতা-বৌদি বললেন—সে কি কথা ঠাকুর পো, আমি তোমার বড় ভায়ের বৌ না! তার ওপরে এখন আমি গর্ভবতী, এখন তুমি ক্ষ্যামা দাও—অন্তর্বত্ন্যস্মি তে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য তু বিরম্যতাম্। যতখানি অনভিলাষে তার থেকেও অনেক বেশি গর্ভপাতের ভয়ে মমতা ভাবী ছেলের গুণরাশি কীর্তন করে বললেন—জান! ছেলে আমার গর্ভে থেকেই সাঙ্গ বেদ উচ্চারণ করছে। ঠিক এই অবস্থায়, না, না, তোমার শক্তিও যে অমোঘ বৃহস্পতি। এই সময়টা তুমি পার হতে দাও, তার পরে আমার যা ইচ্ছে কোর তুমি—অস্মিন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে বিভো।[২৩]

মহাতেজা বৃহস্পতি শুনলেন না মমতার অনুনয়, কারণ মহাত্মা হলেও সেই মুহূর্তে তিনি কামাত্মা হয়ে পড়েছেন—কামাত্মা সা মহাত্মাপি। মনকে দমন করতে না পেরে তিনি মমতার তাৎক্ষণিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। চরম মুহূর্ত যখন এগিয়ে এল তখন বাধা দিল স্বয়ং মমতার গর্ভস্থ সন্তান। গর্ভেই যে বেদ উচ্চারণ করেছে, সে গর্ভ থেকেই বলে উঠল—ওগো বাক্যে বৃহস্পতি—বাচামধিপ—এই গর্ভে দুজনের স্থান হবে না। আপনার শক্তিক্ষয় বৃথা হবে না নিশ্চয়, কিন্তু আমি যে এখানে পূর্বের অতিথি—পূর্বঞ্চাহমিগতঃ। বড় ভায়ের ছেলের ছোট মুখে বড় কথা শুনে ক্রুদ্ধ বৃহস্পতি যা বললেন তা পঞ্চানন তর্করত্ন মশায়ের বঙ্গানুবাদে শুনুন। বৃহস্পতি বললেন, "তুই গর্ভে থাকিয়া যখন আমার ঈদৃশকালে বীর্যপাত করিতে নিষেধ করিতেছিস; তখন তুই দীর্ঘ তমোরাশির মধ্যে প্রবেশ করিবি।"[২৪] মৎস্যপুরাণ বলেছে—বৃহস্পতির এই শাপে মমতার ছেলেটি দীর্ঘতমা নামে জন্ম নিল। শাপের ফলে ঋষির নাম দীর্ঘতমা হল—শুধু এইমাত্র হতে পারে না। আমরা বেদ, মহাভারত ইত্যাদির প্রমাণে জানি—এই ঋষি অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে অন্ধকার ছাড়া কিছু ছিল না বলেই তিনি দীর্ঘতমা।

দীর্ঘতমা বড় হয়ে বৃহস্পতির মতই হয়ে উঠলেন। তবে গর্ভাবস্থাতেই যিনি বেদমন্ত্রের সঙ্গে কামপ্রবৃত্তিও দেখেছেন তাঁর পরবর্তী জীবনে কিছু বিকার ঘটবে এইটেই স্বাভাবিক। পুরাণকার অবশ্য এই বিকারের জন্য একটি গল্প বলেছেন। দীর্ঘতমা তখন ছোট ভায়ের আশ্রমে থাকেন। হঠাৎ সেখানে একদিন একটি ষাঁড় এসে উপস্থিত হল এবং যজ্ঞের কুশ-টুশ মাড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিল। দীর্ঘতমা ষাঁড়ের শিংদুটো ধরে টানতে থাকলেন এবং ষাঁড় যখন আর কোনক্রমেই এঁটে উঠতে পারল না তখন সে বলল—আমি তোমায় বর দেব। দীর্ঘতমা বললেন—নচ্ছার কোথাকার, পরের বাড়িতে খাওয়া ষাঁড়, তোকে কিছুতেই ছাড়ব না। ষাঁড় বলল—আমাদের কোন পাপ নেই, চুরির দোষও আমাদের গায়ে লাগে না। ধর্ম জিনিসটা তোমাদের ব্যাপার, যারা দু'পেয়ে প্রাণী। চতুষ্পদ জন্তুর ধর্ম অধর্ম, খাওয়া-দাওয়ার বিধিনিষেধ মৈথুনের বিচার কিছুই নেই। দীর্ঘতমা তখন সেই ষাঁড়ের কাছে আচ্ছা করে গো-ধর্ম শিখে নিলেন। গো-ধর্ম মানে ষাঁড় বা গরু যেভাবে জীবন-যাপন করে, সেই ধর্ম শিখে নিলেন এবং এই বিদ্যা তাঁর বেশ পছন্দ হল।

গোধর্ম-শিক্ষার প্রথম প্রয়োগের জন্য দীর্ঘতমা বেছে নিলেন তাঁর ছোট ভাইগের বৌকে, যিনি মহর্ষি গৌতমের পত্নী। ভ্রাতৃবধূর মিলন কামনা করলে সে তো ভারী

ক্ষুব্ধ হল। সে কোনমতে ভাসুর-ঠাকুরকে প্রত্যাখ্যান করল বটে কিন্তু যে দীর্ঘতমা ষাঁড়ের ব্যবহার শিখেছেন, তিনি করলেন কি, যেখানেই ভাই-বৌ যায়, সেখানেই ষাঁড়ের কায়দায় উপস্থিত হতে লাগলেন—সো'নড্বানিব।[২৫] গৌতমের বৌ তখন তাঁকে খুব একচোট গালাগালি দিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর হাত দুটো ধরলেন চেপে। বললেন—তুমি এ রকম উল্টো ব্যাভার করছ কেন, আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই আমার পেছন পেছন ধাওয়া করছ ষাঁড়ের মত—অনড্বানিব বর্ত্তসে। তোমার কি গম্যাগমের ভেদবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে যে, মেয়ের সমান ভাইবৌয়ের সঙ্গ কামনা করছ—গোধর্মাৎ প্রার্থয়ন্ সুতাম্। উত্ত্যক্ত, বিরক্ত গৌতমপত্নী শেষ পর্যন্ত রেগে বললেন—দাঁড়াও তোমায় দেখাচ্ছি মজা, বদমাশ! তোকে আজকে ঘরছাড়া করব—দুর্বৃত্তং ত্বাং ত্যজাম্যদ্য। বেটা কানা, বুড়ো! দুরবস্থায় ঘরে বসে খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি—যস্মাৎ ত্বমন্ধো বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যো দুরধিষ্ঠিতঃ—তার এই ব্যাভার! গৌতমপত্নী এবার গোধর্মী দীর্ঘতমাকে ধরে একটা প্যাঁটরার মধ্যে পুরে ফেলে দিলেন গঙ্গায়। দীর্ঘতমা ভাসতে ভাসতে চললেন।

এই পুরাকাহিনীতে একটা ঘটনা বেশ প্রমাণ হল। প্রমাণ হল—যে সমাজে রমণীরা ছাড়া-গরুর মত বলে পুলকিত বোধ করছিলেন উদ্দালক ঋষি, সেই সমাজে পুরুষেরাও অনেকে ছিলেন ষাঁড়ের মত। বোঝা যাচ্ছে রমণীরা কেউ বিব্রত বোধ করছে, কেউ বা সাংঘাতিকভাবে বাধা দিচ্ছে তবু ষাঁড়ের মত পুরুষ মানুষও সমাজে থাকেই। দেবতা হোন আর ধর্মপ্রাণ তপোধনই হোন, কারোরই এই ষণ্ড-স্বভাব যায় না। দেবতা-মুনির মনুষ্যায়ণে আপনাদের আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু ষণ্ডায়ণে আপত্তি করবেন কি করে? ঋষি-মুনিদের মধ্যেও অন্তত দু-একজন যে কতখানি ষাঁড়ের মত ব্যবহার করতে পারেন, তার প্রমাণ মিলবে ওই দীর্ঘতমারই পরবর্তী আচরণে। গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে দীর্ঘতমা কোথাও তীরে এসে ঠেকলেন। তাঁকে তুলে নিলেন প্রহ্লাদের নাতি দৈত্যরাজ বলি।

এইবার লক্ষ্য করে দেখবেন—ঋষি-মুনির দৈত্য-দানব-রাক্ষসদের কী সুন্দর ইন্ট্যার্যাক্শন হচ্ছে। দৈত্যরাজ বলির স্ত্রী সুদেষ্ণা, তাঁর ছেলে হয় না। তখনকার দিনে ছেলে না হলে, যেন তেন প্রকারেণ ছেলে অবশ্যই চাই। আর কে না জানে নিয়োগ প্রথায় ছেলে জন্মাবার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ বড়োই উপাদেয়। বলি ভাবলেন, ব্রাহ্মণ উপস্থিত, এই সুযোগ। আমরা বলি, প্রবলপ্রতাপ দৈত্যরাজের রাজ্যের ভেতরে বাইরে আর কি কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তবে এ কথা ঠিক, যে কোন কালের যে কোন পুরুষ মানুষই স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কাছে পুত্রার্থে নিয়োগ করুন না কেন, তাঁর মনে কিঞ্চিৎ বিকার হবেই। এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কানা বলে রাজা হয়তো ভেবেছিলেন যৌবনবতী স্ত্রীর রূপই সে দেখতে পাবে না, উপরন্তু যে বৃদ্ধ তাঁকে দিয়েই কর্তব্য-নিষেকটুকু করা ভাল। কিন্তু গোধর্মী দীর্ঘতমা অত বোকা নন। চোখ না থাকলে তার অন্য ইন্দ্রিয় বেশি সজাগ থাকে, বিশেষত সে অনুভবে সব পেতে চায়—রূপ, রস, যৌবন—সব।

নিয়োগ প্রথার নিয়ম হল—যে পুরুষ গর্ভাধান করবেন তিনি রাতের আঁধারে এই কাজ করবেন, দিনে নয়। তার ওপর তিনি নিজের গায়ে বেশ খানিকটা ঘি মেখে নেবেন এবং মৌনী থাকবেন—ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।[২৬] এ সব নিয়মের কোন

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা বুঝি যে, ঘিয়ে জ্যাবজ্যাবে পুরুষের সঙ্গে রতিতে কোন স্ত্রীই যাতে আনন্দ না পায় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। তার ওপরে তার সঙ্গে প্রেম সম্ভাষণও যাতে সম্ভব না হয় তার জন্যই বোধহয় পুরুষটির মৌনী থাকার ব্যবস্থা। যাতে তার রূপ দেখে ভাল না লাগে সেই জন্য রাত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু এত নিয়ম সত্ত্বেও স্ত্রীরা পুরুষের চেহারা বুঝে ফেলত, কথাও যে হত না, তা নয়।

রাজমহিষী সুদেষ্ণা কানা-বুড়ো দীর্ঘতমাকে দেখেই আর তাঁর কাছে ঘেঁসলেন না—অন্ধং চ বৃদ্ধং তং জ্ঞাত্বা ন সা দেবী জগাম হ।[২১] তিনি দীর্ঘতমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন শূদ্রা ধাত্রীকে। ঋষি শূদ্রা-সঙ্গে বেশ কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করলেন যাঁরা পরবর্তীকালে ব্রহ্মবাদী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে পরিচিত। রাজা বলি ঋষিধর্মে প্রবীণ এতগুলি ছেলেপুলে দেখে পরম পুলকিত হয়ে দীর্ঘতমাকে বললেন—বাঃ! তাহলে এইগুলিই আমার ছেলে। দীর্ঘতমা বললেন—মোটেই নয়, এগুলি আমারই ছেলে। রাজমহিষী সুদেষ্ণাকে পাননি বলে দীর্ঘতমার মনে বা কিছু ক্ষোভও ছিল। রাজাকে তিনি তাই দগ্ধ হৃদয়ে বললেন—তোমার স্ত্রী আমাকে অন্ধ-বুড়ো জেনে অপমান করেছে, তোমার নিয়োগমত রানী সেখানে আসেননি, এসেছিল তার শূদ্রা ধাত্রী। এগুলি তাই আমারই ছেলে।

দানব রাজা তো মুনির কথা শুনে সুদেষ্ণাকে খুব বকলেন—ভার্যাং ভর্ৎসয়ামাস দানবঃ। রাজা আবার তাঁকে সালংকারে মনোমোহিনী সাজে সাজিয়ে ঋষির কাছে পাঠালেন। সজ্জিতা রমণীকে অনুভবে কাছে পেলেন ঋষি। নিয়োগের প্রথামত মুনির দেহ কিন্তু ঘিয়ে ভেজানো দেখছি না। তাঁর দেহে লেপন করা হয়েছে দই, একটু লবণ এবং মধু দিয়ে—দধ্না লবণমিশ্রেণ ত্বভ্যক্তং মধুকেন তু। অর্থাৎ পঞ্চামৃতের দুই অমৃতে একটু নুন পড়েছে। গোধর্মে শিক্ষিত ঋষি চোখে দেখতে পান না বটে তবে প্রতি অঙ্গে রানীকে অনুভব করবার জন্য সুদেষ্ণাকে তিনি কি বললেন জানেন? মুনি বললেন—আমার এই দই-লবণ আর মধুমাখা দেহখানি একটুও ঘেন্না না করে সব জায়গায় চাটতে থাক দেখি—লিহ মাম্ অজুগুপ্সন্তী আপাদতলমস্তকম্।[২২] যদি এইভাবে লেহন করতে পার তবেই পুত্র পাবে তুমি।

পুত্র জন্মানোর নিয়োগে বৃত হয়েছেন বলে এত ঘৃণিত আচরণ আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এটা অবিশ্বাস্য নয় এই জন্যে যে, ঋষি অন্ধ এবং গোধর্মী বলেই এত বিকার সম্ভব হয়েছে। তখনকার সামাজিক কাঠামোয় যে স্ত্রীলোককে নিয়োগের ঢেঁকি গিলতে হচ্ছে, তিনি রাজরানী হলেও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না বিকৃত রুচির এই ঋষিকে বারণ করার। অতএব সুদেষ্ণা মুনির দেহ চাটতে থাকলেন। চাটতে চাটতে সুদেষ্ণা কোন অঙ্গই বাদ দিলেন না, বাদ দিলেন শুধু মুনির উপস্থদেশ—লজ্জায় অথবা ঘেন্নায়। মুনি বললেন—তুমি যখন এই অঙ্গ বাদ দিলে, তখন তুমি গুহ্যদেশহীন এক পুত্র পাবে।

সুদেষ্ণা বললেন—আপনি এ কি বললেন মুনিবর! আমি যথাসাধ্য যথাশক্তি আপনাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি, আপনি প্রসন্ন হোন। রানীর অনুনয়ে মুনি প্রসন্ন হলেন। হবেনই বা না কেন, ভাইবৌয়ের সঙ্গে গোধর্ম করতে গিয়ে লাথি-ঝাঁটা খেয়েছেন, সেই মানুষের গা চেটে আনন্দ দিয়েছেন রাজারানী। মুনি বললেন—ঠিক আছে আমার কথাটা তোমার ছেলের ব্যাপারে না লেগে তোমার নাতির ক্ষেত্রে লাগবে

এবং গুহ্যহীন হলেও তার কোন অসুবিধে হবে না। এবারে পুলকিত হয়ে বললেন—তুমি যখন আমার লিঙ্গটি ছাড়া আর সব অঙ্গই লেহন করেছ—প্রাশিতং যৎ সমগ্রেষু ন সোপস্থং শুচিস্মিতে—অতএব তুমি দেবতাদের মত পাঁচ ছেলে পাবে—ধার্মিক সুচরিত্র।[২৮] এই ছেলেরাই নাকি অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ এবং পুণ্ড্র।

বাংলাদেশ এবং তার চারপাশের ভাগ্য মূল থেকেই এই বিকৃতরুচি মুনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, থাকুক। কিন্তু এই বিকৃতি এসেছিল সেই দিন থেকে, যেদিন শ্বেতকেতুর দাম্পত্য আইন চালু হয়েছিল। পুরাণে এবং মহাভারতে নিয়োগ ব্যবস্থার অন্ত নেই, কিন্তু মনুর সময়েই দেখছি ধর্মশাস্ত্রকারেরা আর নিয়োগের পক্ষপাতী নন। একেবারে নিরুপায় অবস্থায় মনু নিয়োগের কার্যকারিতা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু সব সময় মনু মহারাজ এই প্রথার বিপক্ষে। হয়তো মনুর সময়ে এর প্রয়োজনও ছিল না। আর্যায়নের প্রথম পর্যায়ে পুরুষ-বৃদ্ধির প্রয়োজন যত ছিল, পরবর্তী সময়ে তা ছিল না। এই কারণেই সমাজে শৃঙ্খলা, বিশেষত নারী-পুরুষের দাম্পত্য শৃঙ্খলা, বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক শিথিলতা নিন্দিত হতে আরম্ভ করে।

অবশ্য পুরাণকারদের মৌখিক উপদেশে শৃঙ্খলার কথা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাঁদের সমাজের বাস্তবতা ছিল অন্যরকম। তাঁরা তত্ত্বগতভাবে যে জিনিসটা হওয়া উচিত বলে মনে করতেন তার সঙ্গে মিল ছিল না, যা ঘটত তার। অবশ্য সেজন্য পৌরাণিকের মিথ্যাবাদিতার দায় নেই, কেননা যে কোন সমাজেই এটা হয়। এমনকি আজকের দিনেও যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিন্যাস আমাদের ঈপ্সিত, যে সব সংস্কারের জন্য আমরা আন্দোলন করি, লেখালেখি করি, বক্তৃতা দিই, সেগুলির সঙ্গে প্রায়ই যোগ থাকে না, যা বাস্তবে ঘটে, বা ঘটে চলেছে—তার। পুরাণকারদের সমাজ ব্যবস্থা বুঝতে গেলেও এই বাস্তববোধটুকু থাকা দরকার।

এ কথাটা প্রথমে বোঝা প্রয়োজন যে, সমাজ বলে যে কথাটা প্রচলিত, সেটা সব সময়েই একটা সচল ব্যাপার। এই সচলতার কারণেই সমাজকে ধরে রাখার জন্য যে নিয়মগুলি করা হয়, তার বিপর্যয়ও ঘটে। নিয়ম এবং তার বিপর্যয়—এইটাই সুস্থ এবং সচল সমাজের লক্ষণ। যাঁরা মনে করেন এই কলিযুগে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে, ত্রেতা যুগে কিংবা দ্বাপর যুগে বড়ো ভাল সময় ছিল, তাঁরা ভুল ভাবেন। যাঁরা ভাবেন দ্বাপর-ত্রেতায় বর্ণাশ্রম ধর্ম একেবারে নিখুঁতভাবে মানা হত, পুরুষেরা সব সদাচার পালন করত আর মেয়েরা ছিল সব সতী-সাধ্বী, কোন অনাচার কু-আচার কিচ্ছু ছিল না—তাঁরাও ভুল ভাবেন।

সত্যি কথা বলতে কি—এই অনাচারহীন সদাচার-পরায়ণ যুগকল্পনা একটা 'উটোপিয়া' মাত্র, সুস্থ সমাজ কখনও কাল্পনিক সমাজের কায়দায় চলে না। বস্তুত যে ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচলন হয়, সেই ত্রেতাযুগেই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বারোটা বেজে গিয়েছিল। বায়ুপুরাণ সাক্ষী দিয়ে বলবে—ব্রহ্মা লোকহিতার্থে ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রমের নিয়ম তৈরি করলেন বটে কিন্তু জনসাধারণ তা মোটেই মানল না—এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা। যদাস্য ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাত্মিকাঃ।[২৯]

কাজেই যাঁরা ভাবছেন, ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুকের তপস্যায় বর্ণবিধির লঙ্ঘন দেখে তাঁকে হত্যা করলেন আর বর্ণ এবং আশ্রম সব একেবারে ঠিকঠাক হয়ে গেল—তাঁরাও ভুল ভাবছেন। পুরাণের মধ্যে দেখবেন বার বার ব্রহ্মা মানসী প্রজা

সৃষ্টি করছেন। এই মানসী প্রজা সৃষ্টি কাল্পনিক বর্ণাশ্রম বিভাগের তাগিদে। বাস্তবে সব সময় বর্ণবিপর্যয়, বর্ণসংকর ঘটেছে। একটা জিনিস লক্ষ করবেন। পৌরাণিকেরা বার বার বলছেন সত্যযুগে যে মানুষেরা ছিলেন, ত্রেতাতেও তাঁরাই আছেন, দ্বাপরেও তাঁরাই থাকেন এবং কলিতেও তাঁরাই থাকবেন। পুরাণের ভাষায় প্রলয়কাল পরিপক্ক হলে প্রজাপতি ব্রহ্মা আবার বসেন তাঁর তপস্যায়। সেই তপস্যা থেকেই উত্তম আর অধম কর্মের ফল পাবার জন্য কেউ দেবতা, কেউ অসুর, কেউ বা কীট হয়ে জন্মায়। পূর্বকল্পে যাঁরা জনলোকে ছিলেন, তাঁরাই আবার অন্যকল্পে দেবতা ইত্যাদি হয়ে জন্মান। এরা সবাই প্রজা, সবাই মানুষ—দেবাদ্যাস্তু প্রজা ইহ। কি প্রথম কি শেষ, সমস্ত মন্বন্তরেই মানুষের সুকর্ম কুকর্ম, সুখ দুঃখ, খ্যাতি প্রতিপত্তি এমনকি রূপ-গুণও একই রকম থাকে—কুশলাকুশলপ্রায়ৈঃ কর্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ।[৩০] অতএব মহাশয়! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে দেবতারা ছিলেন, যে ঋষিরা ছিলেন, যে রাজারা ছিলেন, যে রাক্ষসেরা ছিলেন, অথবা আরও স্পষ্ট করে বলি—যে মানুষেরা ছিলেন, তাঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে।

॥৩॥

সাধারণ তত্ত্বগুলিকে এই নিরিখে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, মুনি, অথবা দেবতা বলে পরিচিত মানুষরা যে অপকর্মগুলি করেছেন সেগুলি সচল সমাজের অঙ্গ। অর্থাৎ এখন যেমন আছে, তখনও তেমনি। আর এই তো স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি কোন ঋষি হলেই শূদ্র বর্ণের পরমা সুন্দরী কন্যাকে তাঁর পছন্দ হবে না, কিংবা সাময়িক ধৈর্যচ্যুতিতে তাকে বলাৎকার করবেন না—এ তো সচল সমাজের মনুষ্যধর্মের লক্ষণ নয়। ঠিক এই কারণেই পরাশর-সত্যবতী কিংবা বশিষ্ঠ-অক্ষমালাকে আমরা ক্ষমা করব। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁরা বেশি তেজী বলে তাঁদের দোষকে 'জাস্টিফাই' করার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

লোভ, হিংসা, লোকঠকানো, মেয়ে মানুষের রূপে মজা, পরস্ত্রী ধর্ষণ—এ সব যেমন এখনও চলছে, তখনও চলত। তাই বলে কি ভাল কিছুই ছিল না? হ্যাঁ তাও ছিল। বার বার যে পুরাণের ঋষিরা আচরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ করেছেন—সেও তো বৃথা নয়। বেশির ভাগ মানুষই সে কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করে গেছেন—আবার মনুষ্য ধর্ম অনুসারে তার থেকে চ্যুতিও ঘটেছে। কাজেই আদর্শ এবং বিচ্যুতি—এই দুইয়ে মিলে সে কালের সমাজটা এখনকার মতই সজীব, এখনকার মতই কৌতূহল-জনক। এই অল্প পরিসরে পৌরাণিকের সব টুকিটাকি, মানুষের সব ইচ্ছে-অনিচ্ছে, কাজ-অকাজ, রস-রসাভাস—সব এক জায়গায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু যাগ-যজ্ঞ, দেবতা, ব্রাহ্মণ্য ছাড়াও সেকালের সমাজে আরও যা কিছু ছিল, তার সামান্য স্বাদ-গন্ধ আমরা পেতেই পারি। এই স্বাদ-গন্ধ সামান্য পেলেই এটা বোঝা সহজ হবে যে, দেবতা, রাক্ষস, মুনি অথবা রাজা—এঁরা কেউই অলৌকিক বা অবাস্তব কোন জগতের বাসিন্দা নন। আঁধার-আলোয়, ভাল-মন্দে তাঁরা এই জগতেরই মানুষ।

ধরুন আপনি যদি পুরাণের কালে জন্মাতেন, তাহলে সকালে উঠেই আপনাকে কিছু

পূজার্চনা করতে হত। হ্যাঁ, পুরাণকারেরা হোম-যজ্ঞ ইত্যাদির কথা অনেক শোনাবেন বটে, তবে ওসব ঝামেলা তাঁদের যুগে অত ছিল না। পুরাণ মানেই এক এক দেবতার মাহাত্ম্য এবং ব্রত, উপবাস। শিব, কৃষ্ণ কিংবা দেবী দুর্গার কথা যখন পুরাণে শুনি তখন দেখা যাবে এঁদের এক একজনের নাম করলেই শত যাগ-যজ্ঞের পুণ্য হত। কাজেই একটু পূজার্চনা এবং হরির নাম স্মরণ করেই পৌরাণিক গৃহস্থ কিন্তু দিনের কাজে নেমে পড়তে পারতেন।

পুরোনো দিনের মানুষ হলে কি হবে, পৌরাণিক গৃহস্থ কিন্তু সৌখিন কম ছিলেন না। স্বয়ং বিষ্ণুপুরাণ তাকে উপদেশ দিয়েছে ছেঁড়া কাপড় না পরতে—সদানুপহতে বস্ত্রে চ। উত্তমাঙ্গে একটি উত্তরীয় এবং অধমাঙ্গে একটি কাপড়—এই দুই খণ্ড বস্ত্রের জন্য পুরাণের দেবতা ব্রহ্মাকে কাপাস তুলো তৈরি করতে হয়েছে, যেন কাপাস গাছও ছিল না আমাদের দেশে। অবশ্য কাপাস তুলো নাকি প্রথম সৃষ্টি করতে হয়েছিল ব্রাহ্মণের পৈতে বানানোর জন্য—কার্পাসিমুপবীত্যর্থং নির্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।

কূর্মপুরাণ বড় আশা করে বলেছে—ব্রহ্মচারী যুবক যেন রঙে না ছুপিয়ে, সাদা কাপড় পরে ; আর কাঁধে যেন জড়ায় কৃষ্ণসার হরিণ-চামড়ার চাদর। কিন্তু এতে কি ব্রহ্মচারীর মন মানে ? গুরুগৃহের হাজারো কাজকর্মের ফাঁকে সে যদি কোনদিন একটি নীল কাপড় পরে ফেলে তাহলেই পুরাণের গুরু ঠাকুর আদেশ দেবেন—দেখ বাপু মেয়েদের গায়ে ছোঁয়া লাগলে অথবা নীল কাপড় পরলে—স্ত্রীণামথাত্মনঃ স্পর্শে নীলীং বা পরিধায় চ—জল কিংবা ভূমি স্পর্শ করে শুদ্ধ হবে।[৩১] নিয়ম ভেঙে কোনদিন নীল-কাপড় পরলেই রঙিন কোন আকর্ষণে রসবতী রমণীর স্পর্শদোষ ঘটত কিনা—এসব বাজে খবরে আমাদের দরকার নেই, কেননা পুরাণ-গুরু গুরুগৃহে-থাকা যুবককে বলছেন—বৎস, মেয়েদের দেখে কটাক্ষ করা, কিংবা তাদের জড়িয়ে ধরা—স্ত্রীপ্রেক্ষালম্ভনং তথা—খবরদার, খবরদার, এসব যেন কখনো কোর না—প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।

আমাদের দেশের পৌরাণিক গৃহস্থ জীবনে সব 'ডোজ'গুলিই অত্যন্ত বেমানানভাবে কড়া। কোন অবস্থাতেই উশুম-কুশুমভাবে মানিয়ে নেবার ব্যবস্থা নেই। এই তুমি ব্রহ্মচারী আছ, তো অমুক করবে না, তমুক করবে না অর্থাৎ ব্রহ্মচারী যুবকের যা যা ভাল লাগবে, তা করবে না। গান-বাজনা নয়, নাচ নয়, তাস-পাশা নয়, এমনকি যুবকের যা কিছু সহজ ধর্ম তা সব করা বারণ। রমণীর সঙ্গে কথা বলা বারণ, কটাক্ষ বারণ। এমনকি গুরুপত্নী যুবতী হলে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা পর্যন্ত বারণ—গুরুপত্নীহ যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।[৩২] অথচ একই বাড়িতে, যেখানে ছাত্র-শিষ্য প্রায় পশুর মত খাটবে, সেখানে গুরু থাকবেন রাজার মত। তাঁর আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁর আচার ব্যবহার, ক্ষমতা সবই রাজোচিত।

বেশির ভাগ পুরাণ-প্রমাণে বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ গুরুর স্ত্রী থাকত একাধিক। ধর্মরক্ষার জন্য তিনি একটি সবর্ণা ব্রাহ্মণী বিবাহ করতেন বটে কিন্তু কামপূর্তির জন্য অন্য জাতের সুন্দরী রমণী বিয়ে করে আনা ছিল তাঁদের অভ্যাস। স্বয়ং মনু এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু গুরুর সংসারে এই অসবর্ণা রমণীদের দিয়ে তাঁর কামপূর্তি হলেও, তাঁদের সম্মান বলে কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ শিষ্য পর্যন্ত তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত না, গুরুর স্ত্রী বলেই তাঁরা শুধু অভিবাদন লাভ করতেন

মাত্র—অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ। [৩৮]

এই যে একই গুরুগৃহের মধ্যে ভিন্নধর্মী চরম আচরণ—গুরু সব করতে পারতেন, শিষ্য স্বেচ্ছায় কিছুই পাবে না—এই আচরণ বহু জায়গায় বহু জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বিশেষত রমণী বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অনেকক্ষেত্রেই শিষ্যদের রসান্বিত করে তুলত গুরুপত্নীর সঙ্গ লাভ করতে। ইন্দ্র তাই অহল্যার সর্বনাশ করেছিলেন, চন্দ্র গুরু বৃহস্পতির স্ত্রীকে হরণ করেছিলেন—এ সব উদাহরণ পুরাণেই সবিস্তারে লেখা আছে। সমাজের বড়মানুষ এবং তেজী লোকের যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধিকার থাকায় সাধারণের মানসিকতা কি হত, তার একটা উদাহরণ আছে পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে।

পূর্বকালে যমের মেয়ে সুনীথা অরণ্যবাসী এক গন্ধর্ব-তপস্বীর তপস্যায় বিঘ্ন করেছিল। তপস্যা করার সময় গন্ধর্ব সুশঙ্খকে সুনীথা মাঝে মাঝেই গিয়ে খোঁচাত। এতে রেগে গিয়ে সুশঙ্খ শাপ দেন যে, সুনীথার ছেলে হবে দস্যি, পাপাচারী। সুনীথা ভয় পেলেন এবং বাবা যমকে গিয়ে সব নিবেদন করলেন। যম বললেন, তুমি খুব অন্যায় করেছ, একমাত্র পরম সত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই তোমার।

সুনীথা সব শুনে নির্জন বনে তপস্বিনী হলেন। নবীনা তপস্বিনী দেখে সুনীথার অল্পবয়েসী বন্ধুরা মনে বড়ো দুঃখ পেল। সখীরা খেলতে এসে তাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বনেই তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তারা বলল—কি হয়েছে তোর, এত চিন্তা কিসের? কি হয়েছে, আমাদের খুলে বল্। সুনীথা সুশঙ্খের অভিশাপের কথা বললেন। বললেন—তবুও আমার বাবা সব চেপেচুপে দেবতা, মুনি সবাইকে অনেক সাধ্যসাধনা করেছেন আমার বিয়ের জন্য। কিন্তু মুনির শাপ মাথায় রেখে কেউই আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কারণ পাপচারী পুত্রের জন্ম হলে সমস্ত কুল মজবে—এই ভয়ে তাঁরা সবাই আমার বাবাকে বলেছেন—অন্য কোথাও এর বর খুঁজনগে, যান—অন্যস্মৈ দীয়তাং গচ্ছ দেবৈরুক্তঃ পিতা মম। [৩৪] সুনীথা বললেন—আমার আর কোন উপায় নেই, তপস্যার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া।

সব শুনে সুনীথার সখীরা এবার যে কথাটি বলল, সেইটেই হল তৎকালীন বাক্যবাগীশ সমাজের প্রতি যুবক-যুবতীর আসল মনোভাব। সখীরা বলল—বংশ, কুল—এসব বড় বড় কথা রাখ্ তো। কার বংশে দোষ নেই একটু বলবি—দেবতারাও কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়—নাস্তি কস্য কুলে দোষো দেবৈঃ পাপং সমাশ্রিতম্। তুই কি জানিস না, স্বয়ং ব্রহ্মা একবার ভগবান শ্রীহরির সামনে ফালতু মিথ্যে কথা বলেছিল, তাতে কি সমস্ত দেবতারা তাকে ত্যাগ করেছে, নাকি দেব-সমাজে তার পরম পূজ্য স্থানটি চলে গেছে—দেবৈশ্চাপি ন হি ত্যক্তো ব্রহ্মা পূজ্যতমো'ভবৎ? সুনীথার সখীরা এবার বলল—স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের কথাটাই ধর না। ব্রহ্মহত্যার পাপ করেও দিব্যি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল শাসন করে যাচ্ছে। তাছাড়া গুরু গৌতমের প্রিয়া পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেও সেই পরস্ত্রীকামী ইন্দ্র দিব্যি দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত, সবাই তাকে এখনও দেবরাজ বলেই জানে। পরস্ত্রীগমন করে তার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে কি—পরদারাভিগামী স দেবত্বে পরি বর্ত্ততে? স্বয়ং মহেশ্বর শিব ব্রহ্মহত্যার মত পাপ করে এখনও বহাল তবিয়তে আছেন—দেবতারাও তাঁকে নমস্কার করেন, ঋষিরাও করেন—দেবা নমন্তি তং দেবম্ ঋষয়ো বেদপারগাঃ। [৩৫]

সুনীথার বন্ধুরা কাউকেই ছাড়লে না। তারা বলল—অন্যায় করে সূর্য দেবতার তো কুষ্ঠ রোগ ধরেছিল, তাতে কি তার সম্মান কমেছে ? জগতে কার দোষ নেই বল তো ? এই তো কৃষ্ণ ঠাকুর ভার্গব ঋষির শাপ ভোগ করে চলেছে। জগতের এত আহ্লাদ জন্মায় যে চাঁদ, সেও গুরুপত্নীর বিছানায় উঠে পড়েছিল। তার জন্যেই নাকি তার রাজ-যক্ষ্মা হয়ে কলাক্ষয় আরম্ভ হয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? আবার তো সে পূর্ণিমায় জ্বল জ্বল করে তেজী হয়ে ওঠে। অত বড় মানুষ যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, সেও গুরুকে মারবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিল। কাজেই বড় মানুষদের কথা আর বলিস না, সুনীথা ! দোষ ছাড়া মানুষ নেই, দেখাতে পারবি না এমন বড় মানুষ, যার গায়ে নোংরার দাগ লাগেনি একটুও—বৈগুণ্যং কস্য বৈ নাস্তি কস্য নাস্তি চ লাঞ্ছনম্।[৩৬] সুনীথার সখীরা এবারে স্ত্রীলোকের গোপন রহস্যটি বলল। বলল—সুনীথা ! যাঁদের কথা বললাম, তাঁদের দোষ তো অনেক বেশি। সে আন্দাজে তোর দোষ তো এইটুকুনি। আর ছাড় তো ওসব বড় বড় কথা, মেয়েছেলের গতর আছে, তো সব আছে। রূপ আছে তো সব আছে—রূপমেব গুণঃ স্ত্রীণাং প্রথমং ভূষণং শুভে।

সুনীথার সখীরা বলল—তোকে পুরুষের মন-মজানো একটা বিদ্যা দেব। এতে দেবতা থেকে আরম্ভ করে সবাইকেই তুই মোহিত করে দিতে পারবি। সুনীথা কি বিদ্যা পেলেন জানি না, তবে যে-বিদ্যায় তাঁর কাজ হয়েছিল, সে তার রূপ। তাঁর বীণার গান শুনে আর রূপে মজে তপস্যা ছেড়ে উঠে এলেন সূর্যের মত রূপবান ব্রাহ্মণ অঙ্গ। তিনি কাম-ক্রোধ ত্যাগ করে ভগবান্ জনার্দনকে ধ্যান করছিলেন : সেই অবস্থায় সুনীথার রূপ-লাবণ্য দেখে তাঁর এমন মোহ হল যে, ধ্যান-জপ মাথায় উঠল। ঘেমে, কেঁপে, হাই তুলে ঋষিপুত্র অঙ্গ কেবলই সুনীথাকে কাছে পেতে চাইলেন, বিয়ে করতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, অঙ্গ বললেন—কন্যে, তুমি যা চাও তাই দেব, তোমার সঙ্গে সঙ্গমের প্রতিদান হিসেবে যা মানুষকে দেওয়া যায় না—তাও দিতে রাজি আছি—দেয়ং বাদেয়মেবাপি তস্যাঃ সঙ্গম-কারণাৎ।[৩৭]

পুরাণের রাজ্যে এই এক অদ্ভুত জিনিস। আমরা বলেছিলাম—গুরুগৃহের অতিরিক্ত কড়াকড়ি অনেক সময় ব্রহ্মচারী শিষ্যের মনে নানা জটিলতা তৈরি করত। ফলে অনেক সময়ে তাঁরা স্বয়ং গুরু-মার ওপরেই আসক্ত হয়ে পড়তেন এবং রুক্ষ গুরুর সংসার-ঠেলা উপবাসিনী গুরুপত্নীরাও যে স্বেচ্ছায় শিষ্যের বাহু-বন্ধনে ধরা দিতেন, তার প্রমাণও আমরা অন্য প্রবন্ধে দিয়েছি। বস্তুত পুরাণ-প্রবন্ধের সমাজটি কিন্তু এক অদ্ভুত উপদেশ এবং ততোধিক বিপ্রতীপ বাস্তবতার সূত্রে বাঁধা। তাঁরা যা উপদেশ দেন, তা ঘটে না। বরঞ্চ যা ঘটে, তা থেকে কেবল আরও একটি মৌখিক উপদেশ তৈরি হয়—এমনটি কিন্তু কোর না। বিপদে পড়লেই তাঁদের ব্রহ্মশাপ আছে, প্রারব্ধ কর্ম আছে, আছে দেব-দ্বিজের কাছে অন্যায়।

এই যে সুনীথা ঋষিপুত্র অঙ্গকে রূপে মজাল, পুরাণে এমনিতর কাহিনী তো হাজারো আছে। অথচ পুরাণজ্ঞ ঋষিরা সব সময়েই স্ত্রীলোকের রূপে মজতে বারণ করেছেন। আবার দেখুন ওই যে সুনীথা আর অঙ্গের মিলনে একটি ছেলে জন্মাল আমরা প্রাচীন পুরাণ থেকে আগেই তার পরিচয় দিয়েছি—তার নাম বেণ। বেণ এমনিতেই দুষ্টপ্রকৃতির ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালের পুরাণ পদ্মপুরাণে বেণকে দুষ্ট প্রমাণ করার জন্য প্রথমে তো সুশঙ্খ ঋষির শাপ লেগেছে। কিন্তু সে শাপ সত্ত্বেও বেণ

নাকি ভালই ছিলেন, এমনকি বেশ ধর্মপ্রাণ। কিন্তু এইবার বেণের গায়ে লাগল পদ্মপুরাণের নিজের কালের হাওয়া। সে আমলে জৈনধর্মের প্রকোপ বেড়েছিল অতএব পদ্মপুরাণে ঋষির শাপে এবং কালবশে জৈনরা এসে উপস্থিত হল ধর্মানুরাগী বেণের রাজসভায়। বেণ মহারাজ তাঁদের ধর্ম এবং দার্শনিক প্রস্তাব শুনে পাপাচারী হলেন। দেব-দ্বিজে ভক্তি উচ্ছন্নে গেল।

ব্যাপারটা এইরকমই। পৌরাণিকেরা নিজের কালের হাওয়া সব সব সময় লেগেছে তাঁর কালের পুরোনো গল্পে। ফলে পুরোনো, আরও পুরোনো কালের বৃত্তান্ত বিভিন্ন পুরাণকারের কালের গন্ধে নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে। তবে একটি ব্যাপারে সর্বত্র বড়ো মিল, সে রমণী। আমার এক নতুন পরিচিত বন্ধু আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—তোমরা যে সব সময় প্রাচীন ভারতের তাবৎ রমণী-কুলের ওপর পুরুষ মানুষের অত্যাচার দেখতে পাও, তাই নিয়ে আবার প্রবন্ধ লেখ—এ ভারী অন্যায়। আমি বললুম—কেন, কেন, এই তো গবেষণা লব্ধ জ্ঞান, তুমি বললে তো হবে না। প্রাচীন ঋষি, মুনি, নাগরিকেরা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কিই না বলেছেন—নরকের দ্বার থেকে আরম্ভ করে ছলা-কলার সবচেয়ে বড় যন্ত্র। বন্ধুবর বললেন—রাখো তোমার গবেষণা! প্রাচীন ভারতের পুরাণ-ইতিহাসের বৃত্তান্ত থেকে এইটেই প্রমাণ হবে যে, মেয়েরাই ছিল বেশি শক্তিশালী, তারাই ছেলেদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত এবং প্রচুর রজ্জু-ভ্রমণের পর ছেলেরা বলত—মাগী ছলাকলায় আমাকে ভুলিয়ে এতকাল ঘুরিয়েছে; আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু রূপের নেশায় আমি ছিলাম নাচার। অতএব শুন ভাই সাধু, তোমরা মেয়েছেলে দেখে ভুলো না, নারী নরকের দ্বার। পুরুষ শুনত, আবার ভুলত।

বন্ধুর কথা শুনে আমি ভাগবত পুরাণের কলিকালের বর্ণনা স্মরণ করলাম। আমি বললাম—ধুর, আপনি যা বলছেন, স সব ঘটবে কলিকালে। ঋষিরা বলেছেন—কলিকালে পুরুষেরা হবে সব মেনিমুখো স্ত্রৈণ—দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ।[৩৮] কলির পুরুষেরা সব বাপ-ভাই ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে—পিতৃ-ভ্রাতৃ-সুহৃদ্-জ্ঞাতীন্ হিত্বা—বৌয়ের আঁচল ধরে শুধু শালা-শালীর খোঁজ নিয়ে বেড়াবে—ননান্দৃ-শ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ। বন্ধু বললেন—বেড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আপনার ঋষি। কেন, দ্বাপর-ত্রেতার চেহারাটা কি অন্যরকম ছিল! খোঁজ নিয়ে দেখুন তো দ্বাপর যুগের পুরুষেরা কি শালা-শালীর খবরই রাখতেন না। মনে করতে পারেন কি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহামতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেনা-বাহিনীর প্রথম এবং প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? গাণ্ডীবধারী ভাই অর্জুনও নয়, গদাধারী ভাই ভীমও নয়। সেনাপতি ছিলেন পাঁচ ভায়ের এক শালা ধৃষ্টদ্যুম্ন। তাছাড়া বিরাট-রাজার শালা কীচকের প্রতি বিরাট রাজার কিরকম প্রীতি ছিল, অর্জুনের শালা কৃষ্ণের ওপর অর্জুনের কিরকম গদ্‌গদ ভাব ছিল, সেটাও কি বলে দিতে হবে! আর কথা বাড়াবেন না। এত বড় মানুষ, অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুটা পর্যন্ত বাবার বাড়িতে মানুষ হয়নি, হয়েছে তার মামা-বাড়িতে। কেন হস্তিনাপুরে কি আর পাঁচটা ছেলে মানুষ হয়নি, তার বাপেরা মানুষ হয়নি। যাই বলুন, এও শালা-প্রীতি। আর কথা বাড়াবেন না।

আমি আর কথা বাড়াইনি। ভাবলাম শালা-শালীর কথাটা ও যুগেও সত্যি হতে

পারে। কিন্তু স্ত্রৈণতা ? কিংবা ভাগবত পুরাণ যে বলেছে—কলিকালে শুধু কামনার কারণেই মেয়েদের সঙ্গে মিশবে পুরুষেরা—সৌরতসৌহৃদাঃ—এ ব্যাপারটা ? মনে মনে ভেবে প্রমাদ গণলাম। বিভিন্ন পুরাণের পাতায় পাতায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা এবং কাম-লোভ বর্জিত মুনিদের স্ত্রীসঙ্গ পাবার জন্য যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, তা ভাবতে ভয় করে। আর তাঁদের কামনা জানাবার যে ভাষা, সে ভাষার মধ্যে ভালবাসার কোন ব্যঞ্জনা নেই, আছে শুধু রমণীর প্রত্যঙ্গ-স্তুতির সঙ্গে দুর্বার সঙ্গমেচ্ছা—সে ভাষা আর উচ্চারণ করে কলিকালের কচি-কাঁচাদের পাকিয়ে তুলতে চাই না। কবিবর যে লিখেছিলেন—'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল'—এ শুধু উর্বশীর একার ক্ষমতা নয়, পুরাণ কাহিনীতে যে কোন রমণীর রূপ দেখে কাম-গন্ধহীন দেবতা-মহাপুরুষেরাও মুহূর্তে কামোন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কাজেই শুধুমাত্র যৌন সম্বন্ধের ইচ্ছাতেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশামেশি—এ কিন্তু যতখানি পৌরাণিক যুগের বৈশিষ্ট্য, কলিকালের ততটা নয়। পুরাণকারেরা তাঁদের কালের দুষ্কর্মগুলি চাপিয়ে দিয়েছেন কলিকালের কাঁধে। চাপিয়ে দিতে পেরেছেন শুধু মানুষ বলেই, ঠিক যেমন বৃদ্ধ স্থবির বলেন—আমাদের কালে কী ছিল আর এখন কী হল ?

এই যে উর্বশীর কথা বললাম, সে তো স্বর্গের বেশ্যা বলে পরিচিত। স্বর্গের বেশ্যা মানেই কিন্তু তার রূপ, যৌবন, ক্ষমতা—কোনটাই সাধারণ বেশ্যার মত নয়। বিশেষত 'কালচার', বিদগ্ধতা, শিক্ষা—এ সব গুণ তখন শুধু গণিকাদেরই থাকত। তার ওপরে উর্বশী হলেন স্বর্গের বেশ্যা, তাঁর খানদানই আলাদা। পুরাণগুলির মধ্যে উর্বশীকে একাধিকবার পাঠানো হচ্ছে শুধু ইন্দ্রিয় সংযত সিদ্ধবর্গের সুপ্ত কামনায় সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য। আর কি আশ্চর্য, তিনি সব সময়ই সফল। এই যে সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশ, যে বংশের অধস্তন কৌরব-পাণ্ডবেরা কত পুরাকীর্তি স্থাপন করে গেলেন, ভাবতে পারেন, সে বংশের মূলেও বংশ বংশ ধরে রমণী-দর্শনমাত্রে কাম-সম্বন্ধ ঘটেছে। ভাবতে পারেন সে বংশের এক মহদ্ গ্রন্থিতেও জড়িয়ে আছেন স্বর্গ-বেশ্যা উর্বশী। চন্দ্রবংশের প্রথম পুরুষ চন্দ্র শুধু গুরুপত্নীকেই ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হননি। গুরুপত্নীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র হয়েছিল এবং সে পুত্র সুস্থ সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। যদিও ধর্ষণজাত এই পুত্রটির সামাজিক স্বীকৃতি পুরাণগুলিতে লেখা হয়েছে নক্ষত্র-জন্মের প্রতীকে, তবু গুরু বৃহস্পতির সামনেই তাঁর স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা স্ত্রী একটুও বলতে লজ্জা বোধ করেননি যে, তাঁর পুত্র বুধ ধর্ষণকারী চন্দ্রের জাতক। আবার পরবর্তী সময়ে বুধ যখন এক রমণীকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করেছেন, তখন তিনি নিজের কুল পরিচয় দিচ্ছেন বৃহস্পতির ছেলে বলে—পিতা মে ব্রাহ্মণাধিপঃ। [৩১]

কাজেই দেখুন ভাগবত পুরাণ যে বলেছিল—সঙ্গম বাসনাতেই কলিকালে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশি করবে লোকেরা, সে 'ট্র্যাডিশন' বহু কালের। চন্দ্র তো গুরুপত্নীর গর্ভে বুধের জন্ম দিলেন, কিন্তু বুধ কি করলেন ? তিনি মোহিত হয়েছিলেন এমন এক মহিলা দেখে, যে মহিলা পূর্বে পুরুষ ছিলেন। পুরাকালে 'সেক্স-চেঞ্জ' করার কোন শৈলী বা শৈল চিকিৎসা চালু ছিল কিনা জানি না, কিন্তু মনুর ছেলে ইল রাজা মহাদেব আর পার্বতীর ক্রীড়াকানন শরবনে ঢুকে স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন। মহাদেব নাকি এই নিয়ম করেছিলেন যে, পুরুষ মানুষ তাঁর বিহারস্থানে ঢুকলেই মেয়ে হয়ে

যাবে। মহারাজ তাই মেয়ে হয়ে গেলেন, তাঁর নাম হল ইলা। পাঠক! এই ইলার নাম থেকেই আমাদের সেই ইলাবৃতবর্ষ, যে দেবতাদের আবাসভূমি, মহাত্মা বলির যজ্ঞস্থান। মৎস্য পুরাণ লিখেছে, মেয়ে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্তন যুগল হয়ে উঠল পীনোন্নত, জঘনদেশও তাই—সাভবন্নারী পীনোন্নতঘনস্তনী।[৪০] চাঁদের মত মুখে এল বিলোল কটাক্ষ; ইলার দেহে এল আরও সব অস্ত্র, যা রমণীর দেহ-তূণে থাকে। রমণী হবার সঙ্গে সঙ্গে ইলার মনে হল—কেই বা আমার বাবা, কেই বা মা, কোন স্বামীর হাতেই বা আমি পড়ব? এত সব চিন্তা করতে করতে মোহময়ী রমণী যখন নির্জন বনপথে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকল, তখনই সে চন্দ্রপুত্র বুধের চোখে পড়ে গেল। এই মুহূর্তে মৎস্যপুরাণের ভাষা হল—রমণীকে দেখামাত্র বুধের মন জর্জরিত হয়ে উঠল এবং তিনি কামপীড়িত হয়ে, কি করে এই রমণীকে লাভ করা যায় সেই উপায়ে মন দিলেন—বুধঃ তদাপ্তয়ে যত্নম্ অকরোৎ কামপীড়িতঃ।[৪১] এর পরেই বুধের ব্রাহ্মণবেশ। ইলার হঠাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্তিতে থতমত ভাবটা তিনি জানতেন বলে, কৌশল করে আচমকা তাকে বললেন—আমার অগ্নিহোত্রের কাজকর্ম ফেলে কোথায় পালিয়েছিলে, সুন্দরী! এখন সন্ধে হল, এই তো রমণীয় বিহারের সময়—ইয়ং সায়ন্তনী বেলা বিহারস্যেহ বর্ত্ততে। তুমি ঘরদোর মুক্ত করে ফুল-সজ্জা কর আমার ঘরে। আর কি, ইলা বুধের মায়া-ভবনে ঢুকলেন। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল রসে, রমণে—রেমে চ সা তেন সমম্ অতিকালম্ ইলা ততঃ।

তাহলে ভাগবত পুরাণের কলিকালের ভবিষ্যদ্বাণী খাটল গিয়ে অতীত কালে। চন্দ্র গেল, বুধ গেল, তার ছেলে পুরূরবাও মুগ্ধ হলেন স্বর্গ-সুন্দরী উর্বশীকে দেখে। ভাগবত পুরাণের মন্তব্য বিরুদ্ধভাবে সপ্রমাণ করার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণের টিপ্পনীটা বজায় রাখব। বলব—দুজনে দুজনকে দেখা মাত্রই মোহিত হলেন। বিশেষত রাজা, যাঁর পক্ষে অন্য দরকারী কাজ ফেলে রাখা চলে না, তিনি সব বাদ দিয়ে প্রগলভতায় ভরপুর উর্বশীকে বললেন—সুভ্রূ, আমি কামনা করি তোমাকে—ত্বামভিকামোঽস্মি। তাই আশা করব তুমিও অনুরাগ উপহার দেবে আমাকে! পুরূরবা এবং এই স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর ব্যাপারে পারস্পরিক কামনার ব্যাপার যাই থাকুক, একথা কিন্তু মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষের উপন্যাস, নাটক, বা রোমান্টিক প্রেমের আরম্ভবিন্দু হল এই পুরূরবা-উর্বশীর মিলন কাহিনী, যে কাহিনীর আরম্ভ ঋগ্বেদে এবং পরিণতি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে আমি অল্পক্ষণের জন্য মৎস্যপুরাণ স্মরণ করব, কারণ অন্যান্য পুরাণের চেয়ে মৎস্যপুরাণের কাহিনীতেই রোমান্টিকতার সুবাস লেগেছে বেশি। সেই সঙ্গে আবারও দেখুন—দেবতা, দানব আর মানুষের ঘনিষ্ঠতা, 'ইনটার‍্যাকশন'। এর পরেও কী দেবতা, অসুর আর মানুষকে একাত্মতার নিরিখে দেখা যাবে না।

দানবরাজ কেশী স্বর্গ আক্রমণ করে স্বর্গের শোভা উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় পুরূরবার চোখে পড়েন। বহুবার স্বর্গে যাতায়াত করার ফলে পুরূরবা উর্বশীকে চিনতেন এবং উর্বশীকে হারালে স্বর্গের কি ক্ষতি হবে, দেবরাজের মন কতটা ভেঙে পড়বে তাও তিনি বুঝতেন। পুরূরবা মাঝপথে কেশীকে আক্রমণ করে উর্বশীকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দেন দেবরাজের কাছে। কৃতজ্ঞ দেবরাজের সঙ্গে পুরূরবার বন্ধুত্ব আরও বেড়ে যায়। উর্বশী উদ্ধারে সমস্ত দেবতারও দারুণ খুশি। এমন একটা ঘটনা

'সেলিব্রেট' করার জন্য স্বর্গমঞ্চে একটি নাটক করার কথা হল যার নাম লক্ষ্মীস্বয়ংবর, পরিচালক স্বনামধন্য নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি। বহু নাটকের নায়িকা উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল। প্রথম থেকেই নাটকের যেখানে সেখানে সে পুরূরবার কীর্তিকথা গান করতে থাকে, এবং স্বয়ং পুরূরবা তখন দর্শকাসনে উপবিষ্ট। পরিচালক ভরতমুনি তবুও কিছু বলেননি। পুরূরবাকে দেখে নৃত্যপরা উর্বশী ভরতমুনির শেখানো লক্ষ্মীস্বয়ংবরের পার্ট ভুলে গেল। নেমে আসল অভিশাপ, বিজন বনে লতা হয়ে থাকার অভিশাপ।

কালিদাস এই অভিশাপকে কাজে লাগিয়েছিলেন কবিকল্পে, উর্বশীর জন্য বিরহী পুরূরবার বিলাপে। কিন্তু আমরা জানি উর্বশীর ওপর আরও একটা অভিশাপ ছিল, যা তাকে সাহায্য করেছিল পুরূরবাকে পেতে। মিত্র আর বরুণ—এই যমজ দেবতা বদরিকাশ্রমে বসে তপস্যা করছিলেন। সেই অবস্থায় আশ্রমের বাগান থেকে নানা ভঙ্গিতে ফুল তোলা আরম্ভ করল উর্বশী। প্ররোচনার জন্য যথেষ্ট ছিল উর্বশীর অঙ্গে জড়ানো রাঙা বসনখানি। বসনের সূক্ষ্মতায় উর্বশীর দেহ-সৌষ্ঠব এমন এক স্ফুটাস্ফুট সীমারেখায় এসে পৌঁছেছিল যে তপস্যারত দুই দেবতা আর তাকে না দেখে পারছিলেন না—সুসূক্ষ্মরক্তবসনা তয়োর্দৃষ্টিপথং গতা। ফলে ভাগবত পুরাণের কলিকাল মিথ্যা করে দুই দেবতা মোহিত হলেন, এবং তাঁদের তেজ পতিত হল ত্রেতা কিংবা দ্বাপরযুগের তপস্যার আসনে—তপস্যতোঃ স্তয়োবীর্যম্ অস্খলচ্চ মৃগাসনে।[৪৩] মৎস্যপুরাণ লিখেছে—দুই দেবতাই পরস্পরের শাপভয়ে নিজেদের সামলালেন বটে কিন্তু উর্বশীর ওপরে শাপের কথাটা এখানে পুরাণ বলেনি। বিষ্ণুপুরাণ কিংবা বায়ুপুরাণে দেখছি মিত্রাবরুণের শাপের কথা উর্বশীর মনে আছে এবং বিদগ্ধা রমণী ভাবছে—শাপের ফলে যখন মর্ত্যলোকেই বাস করতে হবে, তবে সেই মর্ত্যরাজা পুরূরবার সঙ্গেই থাকব। বিষ্ণুপুরাণ লিখেছে পুরূরবাকে দেখেই উর্বশী তার স্বর্গের অহংকারে জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত স্বর্গসুখ পায়ে ঠেলে—অপহায় মানম্, অপাস্য স্বর্গসুখাভিলাষং—উর্বশী আত্মনিবেদন করল রাজার কাছে। আর পুরূরবা! তিন ভুবনের সেরা স্বর্গসুন্দরীর রূপ, বিলাস আর হাসি দেখে মুগ্ধ পুরূরবা বললেন—আমি তোমাকেই চাই—ত্বাম্ অভিকামো'স্মি। লজ্জায় যেন নুয়ে পড়ে স্বর্গের গণিকা জবাব দিল—থাকতে পারি তোমার সঙ্গে, কিন্তু শর্ত আছে! মোহিত রাজা তখন যে কোন শর্তেই রাজি। উর্বশী বলল—আমার বিছানার কাছে দুটি মেষ-শাবক থাকবে, যাদের আমি ভালবেসে পালন করি; ও দুটিকে কখনও সরানো চলবে না। দ্বিতীয় শর্তে উর্বশী বলল—মহারাজ! আমি যেন আপনাকে কখনও উলঙ্গ না দেখি—ভবাংশ্চ ময়া নগ্নো ন দ্রষ্টব্যঃ। স্বর্গের সংস্কৃতিতে এই হয়তো বিদগ্ধা নায়িকার রুচি কিন্তু বায়ু-পুরাণ বিপদ বুঝে উর্বশীকে শুধরে দিয়ে বলেছে—মহারাজ! মৈথুনের সময় ছাড়া অন্য সময় যেন আপনাকে নগ্ন না দেখি—অনগ্নদর্শনঞ্চৈব অকামাৎ সহ মৈথুনম্।[৪৪] উর্বশীর তৃতীয় শর্ত ছিল, যতদিন সে রাজার কাছে থাকবে, ততদিন তার আহার হবে শুধু ঘি—ঘৃতমাত্রং তথাহারঃ।

শুধুমাত্র ঘি খেয়ে জীবনধারণ! এ আমরা কলিকালের লোকেরা হয়তো ভাবতে পারব না, কিন্তু পুরাণের অঙ্কে রাজা নাকি ভোগে, সুখে উর্বশীর সঙ্গে ষাট হাজার বছর কাটিয়েছিলেন। আর মাটির রাজার রতিসুখে উর্বশী, স্বর্গবেশ্যা উর্বশী নাকি

ভেবেছিল—ছাই অমন স্বর্গের মুখে, আর স্বর্গে ফিরে যাব না—প্রতিদিন-প্রবর্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসে'পি ন স্পৃহাং চকার। এর পরের সব ঘটনা আর ব্যক্ত করতে চাই না। মোট কথা স্বর্গের চাতুরিতে উর্বশী রাজাকে উলঙ্গ দেখতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও রাজার প্রেমের টানে উর্বশীকে প্রতি বছর একরাত অন্তত পুরূরবার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে হত।

আমি অবশ্য এখানে পুরূরবা-উর্বশীর প্রেমকাহিনী শোনাতে বসিনি। আমি চন্দ্রবংশের তিন মূল পুরুষের কাহিনী উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, সুন্দরী রমণীর দর্শনমাত্রেই পুরুষের যে বাঁধ-ভাঙা উন্মাদনা, সে যদি কলিকালেও সত্যি হয়, তবে তা দ্বাপর-ত্রেতাতের আরও বেশি সত্যি। সে দেবতার ক্ষেত্রেও সত্যি দানবের ক্ষেত্রেও সত্যি এবং মানুষের ক্ষেত্রেও সত্যি। তবু কলিকালের ভদ্রলোকেরা যা করে, রয়ে সয়ে করে, কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীতে হঠাৎ করেই, অথবা যাচ্ছেতাইভাবে সবই করা যেত। দেখামাত্রই সেখানে স্পৃহা এবং স্পৃহামাত্রই চ্যুতি, ধৈর্যচ্যুতি থেকে আরম্ভ করে সর্বচ্যুতি। আসল কথা মানুষের মূল চরিত্র কখনও বেশি পরিবর্তিত হয় না। পুরাণকারেরা ঘোর কলি বলে যা যা বলেছেন, তা সব তাঁদের কালেও একভাবে ছিল। অন্যদেশীয় চালে কথাবার্তা বলা আধুনিক বিনোদিনীকে নাই বা দেখলেন তাঁরা, কিন্তু হালকা কাপড়-পরা উর্বশী-রম্ভাই বা কম কিসে ? বড় ঘরের অতিযৌবনা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শীর্ণকায় সাধারণ মানুষের প্রেম দেখলে, আমরা যেমন সদুপদেশ দিই—দেখ্ ভাই, এ সব বস্তু আমাদের জন্যে নয়, এদের জন্যে তৈরি বরপুরুষ আছে অন্য জায়গায়, আমাদের মত সাধারণ ঘরে নয়, তেমনি সে যুগের কবিরাও রব তুলেছেন—আরে, রম্ভার মত স্বর্গসুন্দরীর সঙ্গে সম্ভোগ করতে কত ক্ষমতা লাগে, সে জানেন শুধু দেবরাজ। যারা সব সময় ছোঁক ছোঁক করছে, চেড়ির মত মেয়েদের পছন্দ করে যে সব বিট্‌লে পুরুষেরা, তারা কি ক্ষমতায় বুঝবে স্বর্গসুন্দরীর স্বাদ—ঘটচেটীবিটঃ কিংস্বিদ্ জানাত্যমরকামিনীম্ ?[৬৪] মিত্রাবরুণের মত দেবতা, দানবরাজ কেশী আর তথাকথিত মানুষ পুরূরবার কাণ্ড দেখে কলিকালের মানুষ এটুকু রসিকতা করবেই।

আমাদের বলা পুরাণকাহিনীর এই সব নমুনা থেকে এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, সেকালে কোন সজ্জন পুরুষ ছিলেন না, ছিলেন না সতী-সাধ্বী মহিলারা। বরঞ্চ তাঁরা এতই ছিলেন এবং এতকালের সমস্ত আলোচনায় তাঁরা এত বিপুলভাবেই সম্বর্ধিত হয়েছেন যে, আলাদা করে এই মুহূর্তে তাঁদের স্মরণ করার প্রয়োজন বুঝি না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে সেকালের দুনিয়াটা যদি শুধু সাধু, সজ্জন আর সাধ্বী মহিলায় ভরে থাকত, তাহলে সমাজটা স্থাণু হয়ে যেত। আমি বলতে চেয়েছি কলিকালের সব দোষই কোন না কোনভাবে পৌরাণিক সমাজেও ছিল এবং সে সমাজটাও ছিল ভাল-মন্দে সচল। শুধু বড় ঘরের মেয়ে সম্বন্ধে কৌতূহলই নয়, শুধু পছন্দসই মেয়ে দেখামাত্র স্পৃহালুতা নয়, বিদগ্ধা সুন্দরীর হালকা প্ররোচনামূলক পরিধানই নয়, সে কালের অনেক কিছুর মধ্যেই পাব কলিকালের আধুনিক চলন-বলনের ভঙ্গি, যদিও সে ভঙ্গি পুরাতন সরল সমাজে অবশ্যই অন্যরকম। কিন্তু তাঁরা জানতেন, সবই জানতেন। প্রাক্‌বিবাহ পর্বে প্রেম করাও জানতেন, লুকিয়ে দেখা করাও জানতেন, আবার বিয়ের পর 'হনিমুনে' যাওয়ার কথাটাও জানতেন। তবে হ্যাঁ বিয়ের আগে

প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের সুবিধে ছিল অনেক বেশি। শত শত কুঞ্জ বন আর রেবা-নর্মদার তীরভূমি ছেড়েই দিলাম, ছেড়েই দিলাম ভাঙা দেউল আর হাজারো নির্জন স্থান। স্বয়ং কৃষ্ণ ঠাকুর যে জায়গাটি দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রেম করার জন্য, সে জায়গার হদিশ পেলে আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রমাদ গণবেন। নররূপী ভগবান কৃষ্ণ সহস্র প্রেমিকাকে সুখী করার জন্য শ্মশানে নিয়ে গেছেন নির্জনে রসাস্বাদন করতে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই পৌরাণিক ক্ষেত্রটি আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকারা স্মরণে রাখতে পারেন, কেননা আধুনিক জনসংকুল শহরগুলিতে শ্মশান জায়গাটিতে অন্যলোকের ভিড় থাকলেও নেহাত আপনার আত্মীয়-গুরুজন গতায়ু না হলে ধরা পড়ার কোন ভয় নেই। বিয়ের পরে যে 'হনিমুন', তারও কিছু নমুনা পাওয়া যাবে পুরাণে। সেই যে পুরূরবা, তিনি উর্বশীকে বিয়ে করে কত জায়গায় ঘুরেছিলেন জানেন? কখনও চৈত্ররথ বনের মত 'রিজার্ভ ফরেস্ট', কখনও মন্দাকিনীর তীরে, কখনও কামনার মোক্ষধাম অলকায় কখনও ঐতিহাসিক নগরী বিশালায়—অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে।[৪৬] রাজার ভ্রমণসূচিতে গন্ধমাদন পাহাড়ের নিম্নভূমি কিংবা নাম করা 'হিল-স্টেশন' মেরুশৃঙ্গও বাদ যায়নি। অর্থাৎ স্বর্গলোক। বাদ যায়নি দূরপাল্লার দেশ উত্তর কুরু অর্থাৎ বিষ্ণুলোক। কিংবা ছায়া-সুনিবিড় কলাপ গ্রাম। এই সব জায়গায় রাজা উর্বশীকে নিয়ে পরম সুখে রমণ করেছেন—উর্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা।

॥ ৪ ॥

পরাশর বলেছিলেন— কলিকালের বিয়ে-করা বউরা যদি একটুও অনাদর পায় তাহলে নাকি তারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে অনায়াসে স্বামীদের কথা উড়িয়ে দেবে— উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃ কণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ।[৪৭] কুর্বন্ত্যো গুরুভর্তৃণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যনাদৃতাঃ ॥ আহা, পরাশর-ব্যাসের যুগে বোধ হয় অনাদর পেলে মেয়েরা যেন সব স্বামীদের মাথায় চুমো খেত। সেই যযাতি রাজা ক্ষণিকের কামনায় ভুলে শর্মিষ্ঠার একটু গর্ভ উৎপাদন করেছিলেন বলে (যা সে যুগের এমন কিছু অপকর্ম নয়) তাঁর নিজের স্ত্রী দেবযানী বাব্যকে বলে তাঁর দেহে হাজার বছরের বার্ধক্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। বোকা যযাতি জানতেন না যে, সমস্ত পুরাণগুলি একযোগে ব্যবস্থা দিয়েছে যে শ্বশুর-শাশুড়িকে পিতা-মাতার মত, গুরু-গুরুপত্নীর মত সম্মান করবে। তাও আবার দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মত ক্ষমতাবান শ্বশুর। যযাতি শ্বশুরের কথা শোনেননি, তার ফলও ভোগ করেছেন।

তবে এও মানতে হবে এই শুক্রাচার্য পুরাণগুলির মধ্যে এক বিচিত্র চরিত্র। আমাদের বিশ্বাস সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজে শুক্রাচার্যের ব্রাহ্মণ আরও অনেকেই ছিলেন, যদিও তাঁর চরিত্রটি পুরাণ-কথিত ব্রাহ্মণ-সমাজের আচরণীয় চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। যেমন ধরুন ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা পান একেবারে বারণ। এমনকি যে ব্রাহ্মণ সুরা পান করে ফেলেছেন তাকে শাস্ত্রমতে দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। শাস্ত্রীয় শাস্তির বহর থেকেই বুঝি মদ্যপানের অপরাধ তখনকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই করতেন। আমাদের শুক্রাচার্য কিন্তু ভালরকম মদ্যপান অভ্যাস

করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান বিভূতিযোগে নিজেকে শুক্রাচার্যের মত পণ্ডিত বলে কল্পনা করেছেন, অথচ অসুরগুরু হওয়ার সুবাদে প্রতিদিনই সেই পণ্ডিতের মদ না চলে চলত না। এই অভ্যাস ছিল বলেই অসুরেরা একদিন বৃহস্পতি-পুত্র কচকে পুড়িয়ে গুঁড়ো করে তাঁর পানপাত্রে মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং শুক্রাচার্য প্রেমানন্দে সেই মদ পান করে কচকে গলাধঃকরণ করেছিলেন। কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে গুরুর পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আবার শুক্রাচার্যকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু মদ খেয়ে তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল সে অবস্থাটার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন পুরাণকার। মৎস্যপুরাণ লিখেছে তিনি অসুরদের প্রবঞ্চনায় মদ খেয়ে একেবারে মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন— সুরাপানাদ্ প্রবঞ্চনং প্রাপয়িত্বা, সংজ্ঞানাশং চেতসশ্চাপি ঘোরম্।[৪৮] পুরাণকার শেষ পর্যন্ত এক কৌশল করেছেন। ব্রাহ্মণদের যেহেতু মদ খাওয়া বারণ এবং শুক্রাচার্য যেহেতু মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছেন, অতএব পরবর্তী সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে বাঁচানোর জন্য মৎস্যপুরাণ বলেছে যে শুক্রাচার্যই রেগে-মেগে নিয়ম করলেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে এর পর থেকে সুরাপান নিষিদ্ধ হল। যেন তার পরে আর কোন ব্রাহ্মণ সুরাপান করেনি।

পুরাণগুলিতে আপ্ত মুনি-ঋষিদের উপদেশাবলী শুনলে মনে হবে যে, সেকালের দেবতা এবং আর্যপুরুষেরা মানুষের ছল, জুয়োচুরি, রাহাজানি এসব কিছুই যেন জানতেন না। কিন্তু এক এই শুক্রাচার্যের কাহিনীতেই এই সমস্ত অপরাধের অনেকগুলি উদাহরণ পাব। এমনকি শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত দেবসমাজ, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও এই ছলনায় এমনভাবে অংশ নিয়েছিলেন যে, আজকাল হিন্দি সিনেমার অনেক চিত্রাংশ এই কাহিনীর কাছে ঋণী থাকবে। দেবতা আর তাঁদের সৎভাই দৈত্যদের যুদ্ধ-বিগ্রহ তখন প্রায়ই লেগে ছিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য আরও সিদ্ধাই পাওয়ার জন্য ধূমব্রত পালন করে মহাদেবের তপস্যা করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বভাবতই প্রমাদ গণলেন। কিন্তু বিপদ-মুক্তির জন্য বড় ঘরের ব্যবসাদারের মত কাজে লাগালেন নিজের মেয়ে জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর উদ্দেশে পিতার উপদেশ ছিল—শুক্রাচার্যকে হাত করতে হবে তোমায়—গচ্ছ সংসাধয়স্বৈনম্। তার মনে যেমনটি চায় সেই সমস্ত স্ত্রীলোকের উপচারে সেবা করতে হবে তোমায়। জয়ন্তী গেলেন। প্রথমে মধুর কথা, সেবার ইচ্ছে দিয়ে কাজ আরম্ভ হল, পরে তপঃক্লান্ত মুনির গা-হাত-পা টিপে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শসুখও দিতে থাকলেন জয়ন্তী—গাত্রসংবাহনৈঃ কালে সেবমানা ত্বচঃ সুখৈঃ।[৪৯] শুক্র কিন্তু তপস্যা ছাড়েননি, মহাদেবের বরলাভও সম্ভব হল তার ফলে। জয়ন্তী ততদিনে শুক্রাচার্যের প্রেমে পড়ে গেছেন। বরলাভও করার সঙ্গে সঙ্গেই শুক্র ফিরে তাকিয়েছেন জয়ন্তীর দিকে। বললেন— তুমি কে, কি চাও, কেনই বা এত কষ্ট করছ আমার জন্যে, তোমার ভালবাসায় আমি খুশি, বল কি চাই—স্নেহেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতোঽস্মি বরবর্ণিনি।[৫০] শুক্রের কথা শুনে সলজ্জে জয়ন্তী বললেন— আমার মনে কি আছে, তা তুমি ধ্যানযোগেই জেনে নাও, মুনি— তপসা জ্ঞাতুমর্হসি। আমি বলতে পারব না।

জয়ন্তী পুরো দশ বছর শুক্রাচার্যের সঙ্গে বিহার করতে চেয়েছিলেন। এতকাল তপস্যার পরিশ্রমের পর এমন মধুর নিবেদন শুনে শুক্র সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলেন। বললেন— 'এবমস্তু' সুন্দরী, আমাদের ঘরে চল। পুরাণকার লিখেছেন—তারপর শুক্রাচার্য জয়ন্তীকে বিয়ে করে দশ বচ্ছর ধরে মায়াবৃত হয়ে সকলের অদৃশ্য হয়ে

থাকলেন—অদৃশ্যঃ সর্ব ভূতানাম্। আমরা জানি— নিয়মব্রতে এতকাল উপবাসী শুক্রাচার্য প্রায়ই আর ঘরের দরজা খোলেননি। তবে এই দশ বছর অদৃশ্য থাকার ফল হল পুরাণের অন্যতম নায়িকা দেবযানীর জন্ম— সময়ান্তে দেবযানী তদোৎপন্না ইতি শ্রুতিঃ।[৫১]

কিন্তু আসল মাথাব্যাথাটা দেবযানীর জন্ম নিয়ে নয়। অসুরেরা শুনেছিল, তাদের গুরু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, কিন্তু বাড়ি গিয়ে তারা তাঁকে পেল না। মায়া-ফায়ার ব্যাপার যে কিছু ছিল না তা কিন্তু পুরাণের একটা খবর শুনেই বোঝা যায়। পুরাণ লিখেছে, মায়াবৃত গুরুকে দেখতে না পেয়ে তাঁর ভাবগতিক বুঝে—লক্ষণং তস্য তদ্ বুধ্বা—অসুরেরা ফিরে এল। এই যে 'ভাবগতিকের' ব্যাপারটা—এটা শুক্রাচার্যের ক্ষেত্রে বড়ো বেশি সত্যি। তিনি বড্ড মেজাজী মানুষ ; তিনি ইচ্ছে করেছেন দশ বছর ফূর্তিতে কাটাবেন, অতএব কারও সাধ্য হবে না, তাঁকে ফেরাবে। তিনি ইচ্ছে করেছিলেন শত্রুপক্ষের ছেলে কচকে বিদ্যা শেখাবেন, সেখানে অসুরদের হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি টলেননি। অসুর গুরু শুক্রাচার্যের মধ্যে এই খাঁটি ব্যাপারটা ছিল, তাঁর পাঠশালাতে এখনকার ছাত্রদের নিয়মে পাঁঠার ইচ্ছেয় কালীপুজো হত না, যা দেবসমাজে হত। যেমন অসুর গুরুর দশ বছরের নেশা বুঝেই ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে পাঠালেন কার্যসিদ্ধি করতে। দেবগুরু নির্দ্বিধায় চলে এলেন অসুরদের ছলনা করার জন্য। পুরাণকারও পরমানন্দে জানালেন— বোকা অসুরেরা কিভাবে ছলিত হল। কিন্তু আমাদের ধারণা দেবসমাজের বিরুদ্ধপক্ষে থাকতে হত বলেই যা কিছুই অসুরদের আয়ত্ত করতে হয়েছে, তা নিষ্ঠাভরেই আয়ত্ত করতে হয়েছে। ছলনা ব্যাপারটা তাদের শুক্রাচার্যের পাঠ্যক্রমে ছিল না বলেই তারা দেবগুরুর ছলনা বুঝতে পারল না। দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের বেশ ধরে এলেন এবং অসুরদের পটিয়ে পাটিয়ে উল্টো বিদ্যা শেখাতে থাকলেন।

এদিকে দশ বছর শেষ হয়েছে। স্ত্রী জয়ন্তীকে বিদায় জানিয়ে শুক্রাচার্য উপস্থিত হলেন তাঁর যজমান, ভক্ত অসুরদের কাছে। শুক্রাচার্য এসে দেখলেন দেবগুরু তাঁর অনুপস্থিতিতে আসর জমিয়ে নিয়েছেন এবং অসুরেরা কিছুই বুঝতে পারছে না, শুধু প্রতারিত হচ্ছে। দৈত্যগুরু হাঁক দিয়ে বললেন— তোরা করেছিস কি ? আমি হলাম শুক্রাচার্য, আমিই তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে এসেছি। অসুরেরা একবার এদিক তাকায় ওদিক তাকায়, কিন্তু কিছুতেই বোঝে না, কোনটা আসল শুক্রাচার্য। শুক্র বললেন— ওরে আমিই তোদের গুরু, কবির কবি শুক্রাচার্য। আর এই যাকে দেখছিস, ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি। তোরা আমার পথে আয় ; বঞ্চিত না হতে চাস তো বৃহস্পতিকে ত্যাগ কর।

অসুরেরা আবার তাকিতুকি শুরু করল, কিন্তু আসল শুক্র আর নকল শুক্রের মধ্যে কোন তফাত বুঝতে পারল না। ঠিক এই সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি কি করলেন জানেন ! তিনি শুক্রাচার্যের মেজাজ নিয়ে বললেন— ভাই সব, আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য। আর এই যে আজকে যিনি উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছেন—ইনিই আসলে দেবগুরু বৃহস্পতি, শুক্রাচার্যের রূপে আমাদের সবাইকে প্রতারণা করতে চাইছেন। বৃহস্পতির প্রত্যয়-মাখানো কথা শুনে অসুরেরা পুরো দেহাতি কায়দায় বৃহস্পতির দিকে আঙুল দেখিয়ে শুক্রকে বলল— ইনিই দশ বছর ধরে শিক্ষা দিচ্ছেন,

ইনিই আমাদের অন্তরের গুরু। অসুরেরা এবার চোখ লাল করে শুক্রাচার্যকে বলল—ভাগুন আপনি এখান থেকে, আপনি মোটেই আমাদের গুরু নন—গচ্ছ ত্বং নাসি নো গুরুঃ।[৫২] ইনি বৃহস্পতিই হোন আর শুক্রই হোন, ইনিই আমাদের গুরু, আপনি মানে মানে কেটে পড়ুন এখান থেকে—সাধু ত্বং গচ্ছ মাচিরম্।

দেবতা, দেবগুরু এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি প্রবঞ্চনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত টেকেনি, মহামতি প্রহ্লাদের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা মিটে যায় ; কিন্তু অসুরদের প্রতারণা করে দেবগুরু যে আপনার কৌশলে মুগ্ধ হয়েছিলেন—কৃতার্থঃ স তদা হৃষ্টঃ— এই ছলনা বিভিন্নভাবে ঢুকে পড়েছে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সে ছলনাও যদি বৃহস্পতির মত সোজাসুজি হত, তা হলেও আমাদের বলার কিছু ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের নিজের ওপর আস্থা যত কমেছে, ত্যাগের আসন থেকে ব্রাহ্মণ যখনই নামতে আরম্ভ করেছে, এই কৌশলে ছলনা বেড়েছে তত বেশি। পরবর্তীকালে এই ছলনার কৌশল বড়ো অদ্ভুত। অশিক্ষিত জনসাধারণকে শুধু পরলোকের ভয় দেখিয়ে, শাস্ত্রের নামে অদ্ভুত অদ্ভুত নিয়ম করে এমন কতগুলো ব্রত-উপবাস লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা ভাবলে ভয় করে।

ক্রমাগত সামাজিক মূল্য পেতে পেতে ব্রাহ্মণেরা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন যখন সভ্যতার চোখে ব্রাহ্মণের মূল্য কমতে আরম্ভ করেছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তৈরি হয়ে গিয়েছিল এমন এক বিভাগ যাতে এক ভাগ তাঁদের শিক্ষা, দীক্ষা, উদারতা এবং কর্মগুণে সবার সম্মান পেতেন। আরেকভাগ, বেদ-উপনিষদ, ব্রহ্মভাবনা সব ভুলে শুধু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি বলে গর্ব করতেন। আর তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলসখানি গলায় ঝুলিয়ে শুধু সম্মান পেতে চাইতেন দানসামগ্রীর স্বার্থে।

একটা গল্প বলি বিষ্ণুপুরাণ থেকে। এক সময়ে ঋষিরা এক জায়গায় এসে একটা সমাজ কিংবা এখনকার ভাষায় একটা 'ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করলেন। ইউনিয়নের নাম 'মহামেরু' ইউনিয়ন। ব্রাহ্মণেরা সিদ্ধান্ত করলেন— যে ঋষি এই মহামেরু সমাজে আসবেন না, তিনি সাত রাতের পর ব্রহ্মহত্যার পাতকে পাতকী হবেন। ইউনিয়নের ভয় কার না থাকে! সমস্ত ঋষিরাই কোন কোন সময়ে মহামেরু সমাজে তাঁদের নাম লিখিয়ে গেছেন। শুধু মহর্ষি বৈশম্পায়ন এই ইউনিয়নের ধার ধারেন না, তিনি আসেনও না। ফল, মেরুসমাজের ঋষিদের শাপ এবং তারও ফলে তিনি তাঁর বাচ্চা-বয়েসী ভাগনেকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন এবং সে মারা গেল। কিন্তু বালক হলে কি হবে সেও তো ব্রাহ্মণ বটে, অতএব ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগল। বৈশম্পায়ন তখন শিষ্যদের ডেকে বললেন— বাপু হে, আমার ব্রহ্মহত্যার পাপ যাতে নষ্ট হয়, তার জন্য নির্দিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করো। মজা হল এই শিষ্যদের মধ্যে ঠোঁটকাটা যাজ্ঞবল্ক্যও ছিলেন। তিনি বললেন—গুরুমশাই! খুব তো বললেন ব্রত কর, কিন্তু এই ফালতু বামনগুলোকে দিয়ে ব্রত করিয়ে কি হবে— কিম্ এভি র্ভগবন্ দ্বিজৈঃ। এদের ক্ষমতা খুব কম, একটু আধটু ব্রত-নিয়ম করলেই এরা মুষড়ে পড়ে— ক্লেশিতৈ রল্পতেজোভিঃ... কিমেভি র্ভগবন্ দ্বিজৈঃ।[৫৩] তার চেয়ে আমি একাই এই ব্রত পালন করছি। বৈশম্পায়ন নিশ্চয় ভাবলেন—একবার মেরুসমাজের ব্রাহ্মণদের চটিয়ে ভাগনে মারা পড়েছে, আবার শিষ্য ব্রাহ্মণ চটানো! তিনি রেগে যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন— শিষ্য হয়ে তোর এত বড় কথা! তুই এত সব ব্রাহ্মণদের নিস্তেজ

বলছিস। দে, আমায় ফিরিয়ে দে, এতকাল ধরে তোকে যা পড়িয়েছি, বেদবিদ্যা সব ফিরিয়ে দে, এতকাল ধরে তোকে যা পড়িয়েছি, বেদবিদ্যা সব ফিরিয়ে দে। যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বৈশম্পায়নকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, কেননা পুরাণ তাঁর আখ্যা দিয়েছে—শিষ্যঃ পরমধর্মজ্ঞঃ গুরুবৃত্তিপরঃ সদা। সেই যাজ্ঞবল্ক্য যখন দেখলেন যে তাঁর গুরু কতগুলি ফালতু ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণপুঙ্গব বলে ঘোষণা করেছেন— নিস্তেজসো বদস্যেতান্ যস্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্, তখন যাজ্ঞবল্ক্যও ভীষণ রেগে বললেন—দেখ ঠাকুর! যা বলেছি, তোমার ওপর যথেষ্ট ভক্তি ছিল বলেই বলেছি—ভক্ত্যৈতত্তে ময়োদিতম্। এখন তুমি যদি বিদ্যে ফিরিয়ে নিতে চাও, তাহলে বলছি— তোমার মত গুরুতেও আমার প্রয়োজন নেই, যা এতকাল শিখেছি এখনই নাও ফিরিয়ে—মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ। এই বলে সাঙ্গ যজুর্বেদ তিনি রক্তবমি করে উগরে দিয়ে সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন— ছর্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ।[৫৪] বেদের মত জিনিস উগরোনোর জন্যই যাজ্ঞবল্ক্যের বমির সঙ্গে একটু রক্ত পড়েছিল হয়তো। কিন্তু এই ঘটনাটা হল অল্পবীর্য নিষ্কর্মা, নিস্তেজ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিবাদ। প্রতিবাদ যে ঠিক ছিল, তার প্রমাণ তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে সূর্যোপাসনা করে যজুর্বেদের পাঠ এতটাই রপ্ত করেছিলেন, যা তাঁর গুরুও জানতেন না—যানি বেত্তি ন তদ্ গুরুঃ।[৫৫] বস্তুত বামুনের কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও বৈশম্পায়ন যেন তাঁদের মাথায় তুলে দিয়েছেন।

এই মাথায় তোলার ব্যাপারটা পুরাণকার এবং ধর্মশাস্ত্রকারদের যুগেই ঘটেছে বেশি। ব্রাহ্মণদের গুণ এবং বিশিষ্ট কর্ম না থাকা সত্ত্বেও জন্মসূত্রে পাওয়া ব্রাহ্মণ্যকে সম্মান দিতে হবে— এই তাগিদ থেকেই ব্রাহ্মণকে বউনির খদ্দের হতে হয়েছে বেশ্যাব্রতে, আবার একই তাগিদে ব্রাহ্মণ ঠাট্টা-মস্করার পাত্র হয়েছে প্রাচীন কাল থেকেই। মনে রাখবেন গো-ব্রাহ্মণের চরম পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণের ঘরেই ব্রাহ্মণদের নিয়ে মস্করা হয়েছিল। যদুকুলের কুমারেরা শাম্বকে গর্ভবতী মেয়ে সাজিয়ে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করেছিল— বলুন তো ঠাকুর, এর ছেলে হবে না মেয়ে? ব্রাহ্মণেরা মুষল প্রসবের শাপ দিয়েছিলেন। আমরা বলি— ইয়ার্কি-ঠাট্টা কি লোকে করে না। ব্রাহ্মণেরা সব কথাতেই বাণী দিতেন, প্রচুর ভবিষ্যৎ ঘোষণা করতেন, সেই নিরিখে ফাজিল ছেলেরা হয়তো একটু ঠাট্টাই করেছে, তাতেই বংশধ্বংসের অভিশাপ! আমরাও তো জ্যোতিষীকে পরীক্ষা করার জন্য কত মিথ্যে মস্করা করি। কিন্তু বংশধ্বংসের অভিশাপেও স্বয়ং কৃষ্ণের মতামত কি বলুন তো! প্রথমত ভাগবত পুরাণকার লিখেছেন—ঈশ্বর হওয়ার কারণে তিনি ইচ্ছে করলে কিছু করতেও পারতেন অথবা অন্যথাও করতে পারতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপ সত্য করার জন্যই তিনি নাকি এক্ষেত্রে চুপচাপ রয়ে গেলেন। কারণ তাঁর মত হল—বামুনেরা যদি রেগে যায়, রেগে গিয়ে যদি শাপও দেয়, এমনকি হত্যাও করে তবু তাঁকে নমস্কার করে যেতে হবে— ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ।[৫৬] এই নমস্কারের ফল হয়েছে এই যে পদ্মপুরাণে দেখি— মন্দিরে ধ্যানমগ্ন এক পরমহংস ব্রাহ্মণ যখন সন্ধ্যাকালে অভিসারিণী পতিব্রতা যুবতীকে দেখে কামার্ত হয়ে ওঠেন, পুরাণকার তখনও সেই ব্রাহ্মণের বিশেষণ দেন— ভগবান্ বিপ্রঃ। যদিও শ্লোকের অন্য অর্ধে পৌরাণিককে বলতেই হয়—এই ভগবান বিপ্র এক যুবতীকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়লেন— দৃষ্ট্বা তাং ভগবান্ বিপ্রো

মন্মথস্য ভয়ার্দিতঃ। পরে যে ঘরে ওই রমণী আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই অর্গলরুদ্ধ ঘরের গবাক্ষপথে ঢুকতে গিয়ে ব্রাহ্মণ পরমহংস মারা যান—প্রবিষ্টং ন পুনশ্চৈতি পঞ্চত্বমগমত্তদা। উদ্দেশ্য পরিষ্কার জলবৎ।

আজ থেকে একশ বছর আগে যখন ব্রাহ্মধর্মের রমরমা চলছে, তখন আমরা বলেছি— বেদ ব্রাহ্মণ সব গেল। পঞ্চদশ-ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে যখন চৈতন্যদেব বৈষ্ণব-ধর্মের জোয়ার এনেছিলেন তখনও আমরা শ্লোক বেঁধে বলেছি— কলির প্রকোপ ভীষণ বেড়ে গেছে— বলী কলিপরাক্রমঃ। নিত্যানন্দের কীর্তনরসে বেদ-ব্রাহ্মণ সব গেল—বিগতবেদবাদো'ধুনা।[৫৭] আবার দেখুন দশম-একাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য লিখেছেন— ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা এখন কামনা-বাসনা আর ক্রোধ-লোভের শত কাঁটায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে—কোমক্রোধাদি কন্টকশতজর্জরঃ। সর্বত্রই আচার্য নৈয়ায়িক কেবলই স্খলন দেখতে পাচ্ছেন— ইতস্ততঃ স্খলান্নিব উপলভ্যতে।[৫৮] অর্থাৎ তিনিও বলছেন—বেদ-ব্রাহ্মণ সব গেল। আমরা তিন যুগের সন্ধিতে এই যে গেল গেল রব শুনলাম, এই রব পুরাণগুলির মধ্যেই বহুবার শোনা গেছে। যে দ্বাপরযুগের শেষ অংশে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ জন্মেছিলেন বলে, লোকে বলে সেই দ্বাপর যুগের আদিতেই নাকি 'সব গেল গেল' হয়েছিল। বেদ এক ছিল তাকে চারভাগ করতে হয়েছে দ্বাপরযুগে, কেননা ব্রাহ্মণেরা আর বেদ ধরে রাখতে পারছিলেন না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দ্বাপরযুগে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে—দ্বাপরেষু প্রবর্তন্তে ভিন্নবৃত্তাশ্রমা দ্বিজা।[৫৯] ধর্ম হয়ে পড়েছে ব্যাকুল তার ওপর বেদের ওপর এত ব্যাখ্যা, এত টীকা-টিপ্পনী চালু হয়ে গেছে যে, মানুষ ধর্ম বলে কোনটা মানবে, তা ভেবেই পাচ্ছে না—মতিভেদাস্তথা নৃণাম্। ভেদ, প্রভেদ, আর বিকল্পে মানুষ দ্বাপরেই জর্জর। ফলে বর্ণাশ্রম ধ্বংস হয়ে গেছে—বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসাঃ।[৬০] কামনা, লোভ, অধৈর্য, যুদ্ধ এমন কি ধর্মের মধ্যে পর্যন্ত সংকর এসে গেছে। আমাদের বক্তব্য দ্বাপর যুগের অবস্থাই যখন এই রকম, তখন আর কলিযুগে বেশি কি হবে।

ইতিহাস-পুরাণে যেমনটি দেখেছি বা শুনেছি, তাতে দ্বাপর-ত্রেতায় দেবতারা আর ঋষিরা মর্ত্যভূমির মানুষের সঙ্গে দিন-রাত ওঠা-বসা করতেন। সেই সময়েই মানুষ যখন দেবকল্প ঋষি-ব্রাহ্মণ এবং বৃহত্তর মনুষ্যসমাজের স্খলন নিয়ে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তখন আজকের এই ঘোর কলির অস্থিরতার মধ্যে দেবতা, ঋষি বা রাজাদের আর নতুন করে বিপর্যস্ত করতে চাই না। বরঞ্চ আমাদের চেয়ে তাঁদের সরলতা অনেক বেশি ; যেহেতু নিজেদের স্খলন পতন-ত্রুটিগুলি তাঁরা অসীম সৎসাহসে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁরা কিছুই লুকোননি।

আমরা সম্পূর্ণ অবহিত আছি যে ব্রাহ্মণেরাই এককালে তাঁদের ত্যাগ এবং শৌচাচারের নিরিখে সমাজের মূর্ধণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠি ছিলেন। আমরা অবহিত আছি ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। আমরা এও জানি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা না থাকলে ভারতের দার্শনিক, মানবিক এবং সাহিত্যিক চিন্তাধারা অন্যরকম হত। মহামতি কৃষ্ণ এই ব্যাপারটা বুঝেছিলেন এবন বুঝেছিলেন বলেই তাঁর কথাটাই আমাদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। হাজার দোষ থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ যে বলেছেন ব্রাহ্মণদের হেয় কোর না, তার একটা কারণ আছে। কারণ, কৃষ্ণ

বুঝেছিলেন— কাম, ক্রোধ, লোভ— এই সব মানবিক দুর্বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা এবং ত্যাগের মাহাত্ম্যে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের এত সহজে নস্যাৎ করে দেওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে আমরা এটাও মনে রাখব যে, চরম মাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং কৃষ্ণের পুত্রেরাই যেখানে তৎকালীন ভূদেব ব্রাহ্মণঋষিদের সঙ্গে নিতান্ত রসিকতায় মেতে উঠছেন, সেখানে আমরা কলিকালের লোকেরা পিতামহোপম দেবতা ঋষি বা রাজার সঙ্গে যে প্রশ্রয়যুক্ত হয়েই কথা বলব— তাতে আশ্চর্য কি ?

সূত্র

১ 'মৎস্য-পুরাণম্', ৩. ৩৩
২ তদেব, ৩. ৪৩
৩ তদেব, ৪. ৩১
৪ R. C. Hazra, *Stdies in the Puramic Records on the Hindu Rites and Customs*, p. 207
৫ 'বিষ্ণু-পুরাণম্', ৬. ১. ১৭
৬ 'কূর্ম-পুরাণম্', পূর্বভাগ, ২৯. ১২
৭ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্', ১. ১৭. ২
'বৃষং মৃণাল-ধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতম্।'
(এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)।
৮ তদেব, ১. ১৭. ৩৯
৯ 'হরিবংশ', বিষ্ণুপর্ব, ৫৭. ৫৮
১০ তদেব, ৫৭. ৬২
১১ 'বিষ্ণু-পুরাণম্', ৪. ১. ৩৬
১২ 'কূর্ম-পুরাণম্', পূর্বভাগ, ২৮. ৩০ ; 'বায়ু-পুরাণম্', ৮. ৮৩
১৩ তদেব, পূর্বভাগ, ২৮. ৩৫, 'বায়ু-পুরাণম্', ৮. ৯৩
১৪ তদেব, পূর্বভাগ, ২৮. ৪২
১৫ তদেব, পূর্বভাগ, ২৮. ৪৪
১৬ এ ছাড়াও অন্য একটি পাঠ পাওয়া যায় "স্বধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভেষবর্তত।" হরিবংশে হরিবংশ-পর্ব, ৫. ৩
১৭ 'বিষ্ণু-পুরাণম্', ১. ১৩. ২০
১৮ 'বায়ু-পুরাণম্', ৬২. ১৭২
১৮ক 'কূর্ম-পুরাণম্' পূর্বভাগ, ২৮. ৪৬
১৯ 'বায়ু-পুরাণম্' ৮. ৪১. ৪৩
২০ 'মহাভারত', ১. ১২২. ৭
২১ গিরীন্দ্রশেখর বসু, 'পুরাণ-প্রবেশ', পৃ. ২৩৪
২২ 'মহাভারত', ১. ১২২. ১৪
২৩ 'মৎস্য-পুরাণম্', ৪৮. ৩৬
২৪ তদেব, বঙ্গানুবাদ ৪৮. ৪১
২৫ তদেব, ৪৮. ৫৩
২৬ 'মনুসংহিতা' ৯. ৬০
২৭ 'মৎস্য-পুরাণম্', ৪৮. ৬২
২৭ক তদেব, ৪৮. ৬৯
২৮ তদেব, ৪৮. ৭৫
২৯ 'বায়ু-পুরাণম্', ৮. ১৯৯
৩০ তদেব, ৮. ২০৭
৩১ 'কূর্ম-পুরাণ', উপরিভাগ, ১৩. ৭

৩২ 'মনুসংহিতা', ২. ২১২
৩৩ তদেব, ২. ২১০
৩৪ 'পদ্ম-পুরাণ', ভূমিখণ্ড, ৩৪, ১১
৩৫ তদেব, ৩৪. ২২
৩৬ তদেব, ৩৪. ২৬
৩৭ তদেব, ৩৬. ৩২
৩৮ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্', ১২. ৩. ৩৭
৩৯ 'মৎস্য-পুরাণম্', ১১. ৬১
৪০ তদেব, ১১. ৪৮
৪১ তদেব ১১. ৫৪
৪২ তদেব, ১১. ৬০
৪৩ তদেব, ২০১. ২৭
৪৪ 'বায়ু-পুরাণম্', ৯১. ১০
৪৫ 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্' পৃ. ২৪৫. ১০
৪৬ 'বায়ু-পুরাণ', ৯১. ৬-৮
৪৭ 'বিষ্ণু-পুরাণ', ৬. ১. ২৯
৪৮ 'মৎস্য-পুরাণম্', ২৫. ৫৯
৪৯ তদেব, ৪৭. ১২১
৫০ তদেব, ৪৭. ১৭৩
৫১ তদেব, ৪৭. ১৮৬
৫২ 'বায়ু-পুরাণম্', ৯৮. ৩৩ ; 'মৎস্য-পুরাণম্', ৪৭. ১৯৯
৫৩ 'বিষ্ণু-পুরাণম্', ৩. ৫. ৭
৫৪ তদেব, ৩. ৫. ১১
৫৫ তদেব, ৩. ৫. ২৭
৫৬ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্', ১০. ৬৪. ৪১
৫৭ 'বঙ্গে নব্য-ন্যায়চর্চা', পৃ ১০৩
৫৮ উদয়নকৃত 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি', ২. ৩. ৩. পৃ. ৩১৭
৫৯ 'বায়ু-পুরাণম্', ৫৮. ১৫
৬০ তদেব, ৫৮. ২৭

চতুর্থ অধ্যায়

দেব, দানব এবং মানব—দার্শনিক স্থিতি

॥ ১ ॥

আমি প্রথমেই অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা ঘুলিয়ে দিতে চাই না। অর্থাৎ দেবতা-রাক্ষস এবং মানুষকে একই মঞ্চে উপস্থিত করে আমি এখনই এক মহান সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। তবে আমাদের দিক থেকে কিছু সুবিধেও আছে। আজকের সমাজে মানুষ যেহেতু যথেষ্ট সমাজে সচেতন এবং ততোধিক রাজনীতি-সচেতন, তাই আজকের রাজনীতি মাথায় রাখলেই আপনারা দেবতা-রাক্ষস এবং মানুষের সম্পর্ক বুঝতে পারবেন।

প্রথমেই খেয়াল রাখবেন মানুষের যত সম্পর্ক, সব কিন্তু দেবতার সঙ্গে, অসুর-রাক্ষসের সঙ্গে নয়। দেবতা হলেন মহান রাজনৈতিক নেতার মত। তিনি জনগণের জন্য ভাবেন। লোক-সৃষ্টির মধ্যে যাতে উচ্ছৃংখলতা না আসে, উত্তম-অধমের যাতে স্থিতি-পরিবর্ত না ঘটে তার জন্য দেবতাদের চিন্তা আছে। এমনকি মনুষ্যলোকে অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, উত্তম ফসল—এগুলির ব্যাপারেও দেবতাদের হাত আছে। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেবতাদের একেকজনকে কিন্তু সম্পূর্ণ স্বার্থহীন, কাম-ক্রোধ-লোভহীন এক মহান সাধু ব্যক্তি বলে ভাবার কোন কারণ নেই। রাজনৈতিক নেতা যেমন নিজের স্বার্থ ব্যাহত হলে, তাঁর দলীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হলে, তখন আর জনগণের কথা ভাবেন না, অপিচ জনগণের দোহাই দিয়েই জনগণের ওপরেই অবিচার করেন, দেবতারাও কিন্তু ঠিক সেইভাবেই চলেন।

অবশ্য এক্ষেত্রেও দলের মুখ্য নেতা যদি কথঞ্চিৎ সৎ হন, তাহলে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে প্রবঞ্চনা করা সত্ত্বেও তিনি যেমন খানিকটা জনগণকে তুষিয়ে-পড়িয়ে সামলে নেন, দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ সেটাও পারেন। অন্যদিকে, আগেই বলেছি, অসুর-রাক্ষসদের অবস্থা অনেকটা বিরোধী দলের জঙ্গী নেতাদের মত। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা যায়। গণতন্ত্রের খাতিরে বিরোধী নেতারা অবশ্য জনগণের দোহাই দেন, কিন্তু আদতে জনগণকে নিয়ে তাঁদের ভাবার সময় নেই। অসুর-রাক্ষসরা যেহেতু আধুনিক গণতন্ত্রের শরিক নন, অতএব পুরাণে-ইতিহাসে তাঁদের আর কষ্টকর জনগণকে নিয়ে মিথ্যের বেসাতি করতে হয়নি। তাঁরা অত্যন্ত স্থূলভাবে এবং স্পষ্টভাবে স্বর্গের রাজনৈতিক দখল নিতে চেয়েছেন।

অসুর-রাক্ষসের ব্যাপারটা আরও একভাবে প্রকাশ করা যায়। আমরা এখন যেমন

প্রায়ই বলে থাকি—আরে ! অমুক দলের নেতার সঙ্গে তমুক দলের নেতার ব্যক্তি-চরিত্রে বা দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন পার্থক্যই নেই। এদের দলের নামটা শুধু আলাদা। বস্তুত কোন দল প্রথম যখন ক্ষমতায় আসে, তখন তাঁদের নেতা-মন্ত্রীদের আশ্বাসবাণী হয় দেবতার বরদানের মত। তারপর দিন যত যায়, ক্ষমতা যত বাড়ে, লোভ-লালসা আর প্রাপ্তিতে যখন ক্ষমতাসীন নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, তখন পূর্বের বরদ দেবতা মানুষের কাছে অসুর-রাক্ষসে পরিণত হন।

আমাদের বিষ্ণু-পুরাণ বলেছে ভাল। দেবতারাই সেখানে বিষ্ণুর স্তব করছিলেন। দেবতারা বললেন—হে ঈশ্বর ! আমরা যারা এই ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি ভেদে তোমার স্বরূপে আছি—সেই দেবস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি—বয়মেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ।[১] দেবতারা আবার বললেন—তোমার মূর্তির মধ্যে যেখানে শুধুই দম্ভ-অহংকার, শুধুই বিবেকশূন্যতা আর ক্ষমাহীনতা—আমরা সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার করি—তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ।[২]

একই সঙ্গে এটাও বলতে হবে—দেবতারা যেমন কেউ অন্তরীক্ষ লোকের বাসিন্দা নন এবং তাঁরা মানুষই, তেমনই অসুর-রাক্ষসরোও কেউ অন্য জগতের আলাদা কোন বিশিষ্ট জীব নন, তাঁরাও মানুষই। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যাচ্ছে—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে ব্রতী হয়েছেন। এদিকে তখন রাত্রি হয়ে গেছে। হয়তো ঘুমও পাচ্ছে খুব। রাত্রির তমসায় তাঁর মধ্যে তমোগুণ উদগ্র হয়ে উঠল। ঠিক এই অবস্থার মধ্যে তাঁর জঘন-দেশ থেকে অসুররা উৎপন্ন হলেন। অসুররা তাই তমঃস্বভাব। ব্রহ্মা যোগবলে তমঃশরীর ত্যাগ করলেন এবং দিনের বেলায় সত্ত্বোদ্রিক্ত অবস্থায় জন্ম হল দেবতাদের। সেদিক দিক দিয়ে অসুরেরা দেবতাদের বড় ভাই।[৩]

ব্রহ্মা সত্ত্ব থেকেই পিতৃগণের জন্ম দিলেন। কিন্তু সৃষ্টি করতে বসা এক ব্যক্তির মধ্যেও বা সত্ত্ব-ভাব কতক্ষণ বজায় থাকে ? তাঁর মন একটু চঞ্চল হল, রজোগুণ প্রধান হয়ে উঠল ব্রহ্মার মনে। সৃষ্টি হল মানুষের। ব্রহ্মা আবার শরীর ত্যাগ করার চেষ্টা করলেন। যোগ-প্রভাবে অন্য শরীর পেলেনও, কিন্তু সেই শরীরেও রজঃ-স্বভাবটা গেল না। এদিকে আবার রাত্রি হয়ে গেছে। সারাদিন সৃষ্টির ধকলে প্রচণ্ড ক্ষিধেও পেয়ে গেছে, এবং ক্ষিধের সময় খাবার না পেয়ে বেশ একটু রাগও হল তাঁর। ঠিক এই অবস্থায় অন্ধকারে ব্রহ্মার ক্ষুধা থেকেই সৃষ্টি হল রাক্ষসদের। তাঁদের চেহারা হল উৎকট এবং তাঁদের দাড়ি-গোঁফও খুব বড় বড়—বিরূপাঃ শ্মশ্রুলাঃ জাতাঃ।[৪]

জন্মেই তাঁরা ক্ষিধের চোটে ব্রহ্মাকেই খেয়ে ফেলেন আর কি। এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে যাঁরা বললেন—অ্যাই ! এরকম খায় নাকি ? এঁকে রক্ষা কর। এই রক্ষার প্রবৃত্তি থেকেই তাঁরা রাক্ষস আর যাঁরা বললেন—না, সে হবে না, আমরা খাবই, তাঁরা হলেন যক্ষ। যক্ষণ মানে ভক্ষণ, সেই প্রবৃত্তির জন্যই তাঁরা যক্ষ।

অসুর, দেবতা, মানুষ, রাক্ষস—যেভাবেই এঁদের 'ক্যাটিগোরি' ভাগ করা হোক না কেন, মূল ব্যাপারটা কিন্তু সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, আর তমোগুণের। আসলে এঁরা সবাই মানুষ। মানুষের মধ্যেই যাঁরা সত্ত্বপ্রধান, তাঁরা দেবতা। যাঁরা উৎকটভাবে রজঃপ্রধান তাঁরা রাক্ষস, আর যাঁরা তমঃপ্রধান তাঁরা অসুর। মহামতি গিরীন্দ্রশেখর বসু দেবতা-মানুষ-রাক্ষসের সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ দিয়ে যা বলেছেন, আমি তা চলিত

ভাষায় বলি—

পুরাণের শ্লোক বিচার করলে দেখা যায়—সভ্য মানুষের শত্রু দুই রকমের সমাজবহির্ভূত দল ছিল, এক রাক্ষস, দ্বিতীয় যক্ষ। রাক্ষসরা বিরূপ, শ্মশ্রুল এবং সব সময়েই খিদের জ্বালায় জ্বলছে। মানুষ মেরে, লুটপাট করে এরা জীবনযাপন করত। হয়ত আগে শুধু অনার্যদের মধ্যেই রাক্ষসের দল দেখা যেত। যজ্ঞাদি কার্যের জন্য ধনসামগ্রী এবং প্রচুর খাদ্য সংগৃহীত হলে রাক্ষসরা সব লুটপাঠ করে নিয়ে যাবে—এই ভয়ে ঋষিরা সবসময় শঙ্কিত থাকতেন। ঋগ্‌বেদেও বহু জায়গায় যজ্ঞপণ্ডকারী রাক্ষসদের উল্লেখ আছে। রাক্ষসরা অন্ধকারে প্রবল হয়ে উঠত। তাই রাক্ষসের অন্য নাম নিশাচর। এরা 'ক্ষুৎক্ষাম' অর্থাৎ সবসময়ই অভাবগ্রস্ত। আমরা এখন ডাকাত, চোর, গুণ্ডা বললে যা বুঝি, সেকালে রাক্ষস বললে তাই বোঝাত। আর্যদের মধ্যেও অনেকে রাক্ষস-বৃত্তি অবলম্বন করতেন। রাজা কল্মাষপাদ কিছুকাল রাক্ষস হয়ে নরহত্যা এবং লুটপাট করেছিলেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। রাবণ ব্রাহ্মণ এবং রাজা হওয়া সত্ত্বেও সীতাকে হরণ করেছিলেন। তিনি নিজের রাজ্যে রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু পরের রাজ্যে রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করে লুটপাট করতেন। এখন যেমন কেউ কেউ গুণ্ডা বা ডাকাত লাগিয়ে শত্রুপক্ষের মানুষকে মারতে চেষ্টা করেন, সেকালেও সেইরকম ছিল। বিশ্বামিত্র রাক্ষস লাগিয়ে পুরাণকার পরাশরের বাবাকে হত্যা করিয়েছিলেন, এবং পরাশরও ক্রোধের বশে অনেক রাক্ষস দগ্ধ করেছিলেন—সে প্রমাণও আছে পুরাণে।

কাজেই দেখুন, আমি যে অসুর-রাক্ষসদের গণতান্ত্রিক মতে বিরোধী দলের মর্যাদা দিয়েছিলাম, গিরীন্দ্রশেখর তাঁদের ডাকাত, গুণ্ডা অথবা মাস্তানের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। আমরা অবশ্য অসুর রাক্ষস কিংবা দৈত্যদের এই পর্যায়ে নামিয়ে আনতে রাজী নই, কারণ রাক্ষস অসুর-দৈত্যদের মধ্যে অসাধারণ গুণসম্পন্ন প্রহ্লাদ, বৃত্র, বিরোচন, বলি অথবা রাবণকেও আমরা পেয়েছি। শুধুমাত্র অহংকার এবং স্ত্রী-দোষের জন্য আমরা তাঁদের গুণ্ডা-বদমাশদের পর্যায়ভুক্ত করতে চাই না, এবং তা করলে দেবতাদেরও অনেক সময় ওই পর্যায়েই নামিয়ে আনতে হবে। অতএব দেবতাদের অনন্ত সম্মানের নিরিখেই আমরা অসুর-রাক্ষসদেরও যথেষ্ট উন্নত স্তরের জীব বলে মনে করি। আসলে দেবতা এবং অসুর—এঁরা একই মুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ, এবং দেবতাদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই তাঁদের কোন পার্থক্য নেই। এমনকি কোথাও কোথাও তাঁদের বুদ্ধি-বল-কৌশল এবং মহত্ব দেবতাদের থেকেও বেশি।

আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে দেখেছি—প্রজাপতি যেমন দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন, তেমনই অসুর-রাক্ষসদেরও সৃষ্টি করেছেন। দুই পক্ষই তাঁর সন্তান—উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ।[৫] অসুর আর দেবতাদের সম্পর্ক সাপ-নেউলের। জন্মের পর থেকেই তাঁদের শত্রুতা চলছে, একেবারে শাশ্বতিক বিরোধ। কিন্তু শতপথের বিবরণে দেখছি—অসুরেরা একসময় সবই জিতে নিয়েছিলেন এবং জেতার পর নিজেদের মধ্যে একটা ভাগাভাগি করে নেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন।

নানা ভাবনা-চিন্তা করে পৃথিবীর মাপ-যোক আরম্ভ করে দিলেন অসুরেরা। দেবতারা তো প্রমাদ গণলেন। তারা ঠিক করলেন—ওই ওদের ভাগাভাগি করার সময়ই অসুরদের কাছেই যেতে হবে এবং গিয়ে বলতে হবে—বেশ তো ভাগাভাগি

করে নিচ্ছ, আমাদের যদি এখানে কিছুই না থাকে, তাহলে আমাদের কী হবে—তদেষ্যামো যত্রেমামসুরা বিভজন্তে, কে ততঃ স্যাম যদস্যৈ ন ভজেমহীতি।[৬] দেবতারা যজ্ঞপতি বিষ্ণুর শরণ নিলেন—একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। অসুরদের এই ভাগাভাগির মধ্যেই নিজেদের একটা হিস্সে করে নিতে হবে।

এবারে দেখুন, অসুররা কত ভাল মানুষ। দেবতারা যদি পুরো পৃথিবীর অধিকার পেতেন, তাহলে সূচ্যগ্র মেদিনীর অধিকারও অসুরদের দিতেন না। কিন্তু অসুররা সমগ্র পৃথিবীর অধিকার পেয়েও—অস্মাকমেবেদং খলু ভুবনমিতি—যথেষ্ট ভদ্রলোকের মতই দেবতাদের বললেন—তা তো বটেই। জায়গার ভাগ তোমাদের কিছু দিতে পারি ঠিকই, তবে তোমাদের এই বিষ্ণুর শুতে যতখানি জায়গা লাগে, ততটুকুই দেব, তার বেশি নয়—যাবদেবৈষ বিষ্ণুরভিশেতে তাবদ্বো দদ্ম ইতি।[৭]

এই কথাই অসুরদের কাল হয়ে গেল। বামন-বিষ্ণু আর বলি রাজার গল্প যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝতেই পারছেন—কীভাবে বিষ্ণু শুয়ে, ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে অসুরদের রাজ্য দখল করে নিলেন। টলস্টয়ের ছোট গল্পের নীতি—How much land does a man require—এ ক্ষেত্রে কাজ করল না। দেবতারা অসুরদের সঙ্গে তঞ্চকতা করলেন এবং অসুর-জিত সমগ্র পৃথিবী দখল করে নিলেন।

দেখুন, শতপথ ব্রাহ্মণ কি কাঠক সংহিতাকে আমাদের শাস্ত্রকারেরা বেদের সম-মূল্য দিয়ে থাকেন। সৃষ্টির প্রথম কল্পে এই গ্রন্থগুলি যা বলেছে, পুরাণ-ইতিহাস তার অনুবাদ করেছে মাত্র। তা আমরা যদি বেদের মধ্যেই দেবতাদের লোভ-হিংসা তঞ্চকতার পরিচয় পাই, তো মনুষ্যলোকেও তার ছায়া পাব। কাঠক সংহিতায় দেখা যাবে—দেবতারা এবং অসুরেরা একই সঙ্গে যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। দেবতারা যা যা করছিলেন, অসুররাও তাই তাই করে যাচ্ছিলেন। এমনকি কাঠক-সংহিতার মতে অসুরেরা ছিলেন দেবতাদের থেকে অনেক ভাল এবং অনেক বড় এবং জ্যেষ্ঠও বটে। বরঞ্চ কনিষ্ঠ দেবতাদের মধ্যে অন্যায় বেশি ছিল এবং তাঁরা ছিলেন ছোট ভাইদের মতই উচ্ছৃঙ্খল—কিন্তু এরই মধ্যে অঘটন ঘটিয়ে দিল শুধু সোমাহুতির হিসেব। দেবতারা এটা আগে দেখেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সোমের অধিকার ছিনিয়ে নেন। আর কি, এর পরে দেবতারাই অসুরদের চেয়ে বড় বলে গণ্য হলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—অসুরেরা পূর্বে বড় ছিলেন, কি ভাল ছিলেন—সেটা কিন্তু বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। উল্লেখযোগ্য কথা হল—অনেক ক্ষেত্রেই অসুর-রাক্ষসেরা ভালই ছিলেন কিন্তু স্বয়ং দেবতারা তাঁদের ভাল থাকতে দেননি। তঞ্চকতা, মায়া, ছলনা—ইত্যাদি সমস্ত অন্যায় করে দেবতারা অসুর-রাক্ষসদের তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। সমুদ্র-মন্থনের সময় অসুরদের শক্তি-সামর্থ্য দেবতাদের প্রয়োজন ছিল। তাঁরা সেই শক্তির ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু অমৃত উঠে এলে কী অসামান্য সঙ্কীর্ণতায় এবং নৃশংসতায় অসুরদের বঞ্চিত করা হল!

নারায়ণ মোহিনী মূর্তি ধারণ করে দেব-দানবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মোহন সৌন্দর্যে অভিভূত অসুরেরা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে, তাঁদের মন একেবারে বিবশ হয়ে গেল। তাঁরা মোহগ্রস্তের মত অমৃত-কলশ তুলে দিলেন সেই মায়ামূর্তি মোহিনীর হাতে—স্ত্রিয়ৈ দানব-দৈতেয়াঃ সর্বে তদ্গত মানসাঃ।[৮]

আসলে এইটাই অসুর-রাক্ষসদের গণ্ডগোল। তাঁরা ইন্দ্রিয় বশে রাখতে পারেন না। সমুদ্র-মন্থনে এত যে মহামূল্য বস্তু উঠল, সেদিকে তাঁদের একটুও মন নেই। তাঁদের বিবাদ এবং প্রতিবাদ ছিল শুধু দুটি বস্তু নিয়ে। একটা তো অমৃত। দ্বিতীয়টা লক্ষ্মীদেবী, আরও স্পষ্ট করে বলা ভাল সৌন্দর্যের সারভূতা এক রমণী, স্ত্রীলোক—অমৃতার্থে চ লক্ষ্ম্যর্থে মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ।[১] তাঁদের এই মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য ভগবান হওয়ার দরকার হয় না। কেননা ভগবান নারায়ণ রীতিমত মানুষের মতই দেবস্বার্থে শুধু এক মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ করলেন। ব্যাস! কেল্লা ফতে। তিনি ঠকিয়ে দিলেন অসুরদের।

লক্ষ্মী এবং অমৃতের জন্য অসুরদের যে যথেষ্ট ক্ষোভ এবং অভিযোগ ছিল সে কথা আমরা আগেও বলেছি। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে তাঁরা যে সংযম রাখতে পারেন না, শুধু সেই দোষটুকু তাঁদের মনে থাকে না। ঋষি-মুনিরা মহামতি রাবণ সম্বন্ধেও কম প্রশংসা করেননি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের বিষয়ে রাবণের অসংযম এবং অহংকারই যে তাঁকে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, এ কথা তাঁরা বলতে দ্বিধা করেননি।

আমার বক্তব্যটা কিন্তু এর চেয়েও গভীরে। পুরাণে ইতিহাসে দেবতাদের যত লাভ এবং প্রাপ্তির বর্ণনা আছে, সেই লাভের বেশির ভাগটাই কিন্তু অসুর-রাক্ষসদের ফাঁকি দিয়ে। যদি বা ধরে নিই শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিয়ম দেবতারা কিছু মানতেন, অথবা বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ব্যাপারে তাঁদের সমীহ ছিল, অথবা গো-ব্রাহ্মণ পালন, শম-দম-তপস্যার কীর্তিতে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী, তা হলেও বলতে হবে ভারতীয় ইতিহাস এবং পুরাণগুলি তাঁদের অন্যায়-অকর্তব্যগুলি মার্জনা করেনি। ঠিক যেমন মুনি-ঋষিরাও বিভিন্ন সাত্ত্বিক গুণে ভূষিত হলেও, তপস্যার শক্তিতে তাঁরা সমাজের মূর্ধণ্য-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও পুরাণকারেরা তাঁদেরও লোভ, মোহ এবং অহংকার সম্পূর্ণ মানবিকভাবেই ঘোষণা করেছেন।

আমরা বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রে যেভাবে দেবতারে বিভিন্ন মানবিক দোষ-গুণ লক্ষ্য করব, পুরাণ-ইতিহাসেও তার পূর্বরূপ আছে এবং সাংখ্য-বেদান্তের মত দর্শনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এমনকি সত্য, ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগের নানা মাহাত্ম্য ঘোষণা করে তাঁরা সেইসব যুগের শম-দম এবং তপঃশক্তির জন্য বিস্ময়-মুকুলিত হন, তাঁদেরই জানাই—এই বিস্ময় এবং আকুলতার কোন কারণ নেই। কারণ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ইত্যাদি আমাদের পূর্ব-পূর্বতর কলিযুগেরই পর্বভাগ বা নামান্তরমাত্র। সাধারণ্যে দেবতা, মুনি-ঋষি, অসুর-রাক্ষস, অথবা স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে যে দূরত্ব-বোধ আছে, সেই দূরত্ব-বোধের জন্যই মানুষের মধ্যে একটা সম্মান বা ভীতি তৈরি হয়েছে। একইভাবে সময়ের একটা বিশাল দূরত্বই মানুষের মনে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ইত্যাদি যুগ সম্বন্ধে একটা অসামান্য তথা বিশিষ্টতার বোধ এনে দিয়েছে। অবশ্য, বড় বড় মতামত ব্যক্ত করে নানা নতুন সিদ্ধান্ত করার আগে দেবতা, মুনি-ঋষি অসুর-রাক্ষস এবং অবশ্যই মানুষের সম্বন্ধে পুরাণকারদের ভাবটা একটু বুঝে নিই। তাতে যেমন দর্শনের কথা বোঝবার সুবিধে হবে, তেমনই একান্ত মানবায়নের মাধ্যমে দেবতাদের সম্বন্ধে চরম রসিকতাগুলিও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

তবে হ্যাঁ, পুরাণগুলি থেকে কয়েকটা জবর জবর শ্লোক উদ্ধার করে এখন যদি বেশ জোর দিয়ে বলি—দেবতারা সব মানুষই ছিলেন, আর কিছু নয়, তাহলে দার্শনিক স্থিতির দিক থেকে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যাবে। বিশেষত ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বর-দেবতা, অসুর-রাক্ষস এবং অবশ্যই মানুষ—এঁদের প্রত্যেকের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি দার্শনিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে—ভারতবর্ষে দেবতত্ত্বের যে বিবর্তন ঘটেছে তাতে সব সময় দেবতাদের দার্শনিক স্থিতি একরকম থাকেনি। অবশ্য শুধু ভারতবর্ষে কেন, গ্রীক-রোমানদেরও অবস্থা এ বাবদে একইরকম। বৈদিক কালে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য—এঁদের প্রত্যেককে যখন যজ্ঞভাগ দিয়েছি তখন আলাদা করে এঁদের প্রত্যেককেই চরম স্তুতি করেছি। হয়তো সভ্যতার প্রথম কল্পে মানুষ যখন নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর ভীতিতে কখনও বিস্মিত, কখনও কম্পমান, তখন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেবতার চরম স্তুতি করেছে। অর্থাৎ অগ্নিকে যখন আবাহন করছি, তখন অগ্নিই চরম, আবার যখন সূর্যের উদ্দেশে মন্ত্র পড়ছি, তখন যেন সূর্যের থেকে বড় কিছু নেই। এইভাবে কখনও বরুণ, কখনও অগ্নি, কখনও সূর্য, কখনও বায়ু বৈদিক ঋষির মন্ত্র-কল্পনায় চরম উপাস্য হয়ে উঠেছেন। এরই মধ্যে ইন্দ্রকে যে আমরা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছি, তার কারণ এই নয় যে, তিনি দার্শনিকভাবে অন্যান্য দেবতাদের মূর্ধণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন ; তার কারণ সম্ভবত ইন্দ্রের স্বভাব এবং বোধহয় যেহেতু সবচেয়ে বেশি বৈদিক মন্ত্র তাঁরই উদ্দেশে কীর্তিত বলে।

কিন্তু পর্যায়ক্রমে একেক সময় একেক দেবতার এই যে চরম স্তুতি—এই জিনিস কতদিন চলে ? সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের মধ্যে যখনই দার্শনিক মনন পরিণত হতে আরম্ভ করেছে, তখনই ঋষিদের মধ্যে এক দার্শনিক ক্লান্তি এসেছে। খোদ বেদের মন্ত্রের মধ্যেই এই ক্লান্তি ধরা পড়েছে হিরণ্যগর্ভ সূক্তে। ঋষি বলেছেন—এত ঘি পুড়িয়ে কোন্ দেবতার পূজা করব—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ? সৃষ্টির আদিকল্পে শুধু হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। জন্মেই তিনি সর্বভূতের অধীশ্বর। তিনিই এই পৃথিবী আর আকাশকে ঠিক ঠিক জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব তিনি ছাড়া আর কোন দেবতার উদ্দেশে ঘি পুড়িয়ে পুজো করব ?

স্পষ্ট বোঝা যায়—অন্তত পণ্ডিতেরা তাই বোঝান যে, নানা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করতে করতে ঋষিরা এবার বহুর মধ্যে একের সন্ধান আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই একের সন্ধান মানেই দর্শনশাস্ত্রের চরম অন্বেষণ—সবার অন্বেষণ। সে অন্বেষণ বৈদিকদের বলতে বাধ্য করেছে—বাপু হে! পাখী হল গিয়ে ওই একটাই, কবি-পণ্ডিতেরা আপন কল্পনায় তাঁর নানা রূপ কল্পনা করেন—সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।[১০]

বেদের মধ্যে এই একত্বের অন্বেষণ একদিকে যেমন আমাদের উপনিষদের চরম এবং পরম একক ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে, অন্যদিকে এই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বই বৈদিক দেবতাদের প্রাচীন স্থিতি এবং সম্মান অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে।

ঔপনিষদিক জ্ঞানমার্গ অথবা ব্রহ্মতত্ত্বের বিস্তারিত বিচারের মধ্যে না গিয়েও যে গ্রন্থটিকে সমস্ত উপনিষদের সারাৎসার বলা যায়—সেই গীতার মধ্যে যখন বেদের মহান যাগ-যজ্ঞকে স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির পুষ্পিত, অতিরঞ্জিত বাক্যরাশিতে পরিণত করা হল—যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতাঃ[11]—সেই দিন থেকেই ফলদাতা এবং যজ্ঞাধিপতি দেবতাদেরও কপাল পুড়ল। ইন্দ্র-অগ্নি, মিত্রাবরুণ অথবা সূর্য-সোমের পরিবর্তে পরবর্তী কালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মত দেবতা-ত্রয়ীর আবির্ভাব হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু উপনিষদের সূক্ষ্ম আবহমণ্ডলের মধ্যে দিয়েই এই দেবতাদের সৃষ্টি। ফলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে অন্তত দুইজন, অর্থাৎ বিষ্ণু এবং শিব সব সময়েই পুরাণগুলির মধ্যে পর-ব্রহ্মের মহিমায় কীর্তিত। বিষ্ণু-নারায়ণ-কৃষ্ণ অথবা শিব-রুদ্র-মহেশ্বর-মহাদেবকে এমনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেন তত্ত্বগতভাবে তাঁরা নির্বিশেষ নির্বিকল্প হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যেন ঔপনিষদিক ব্রহ্মেরই সাকার এবং শারীরসংস্করণ।

উপনিষদের মধ্যেও যেখানে যেখানে—তিনি দেবতাদেরও দেবতা, তিনি বহু ঈশ্বরের মধ্যেও পরম ঈশ্বর—তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে সেখানেই কিন্তু পুরাণকারেরা এক বিরাট পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন। অর্থাৎ পরব্রহ্ম এখানে সাকার ঈশ্বরে রূপান্তরিত। বৈদিক পুরুষ-সূক্ত থেকে তাঁর মূল বিবর্তন আরম্ভ হয়েছে, উপনিষদের সর্বগত ব্যাপ্ত ব্রহ্মের কল্পনায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আর পৌরাণিকের উদার শ্লোকরাশিতে তিনি সর্বত্র পরিচিত হয়েছেন ঈশ্বর বলে, ভগবান বলে।

বস্তুত এই ওপরের পরিচ্ছেদটি নিয়ে আরও পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লেখা এখানে অপেক্ষিত ছিল। কিন্তু তা করতে গেলে আমার পাঠকেরা আপাতত বিরক্ত বোধ করবেন। তবু ঈশ্বরের কথাটা তুললাম এইজন্য যে, ঈশ্বর আর দেবতার বেশ বড় রকমের একটা ভেদ আছে। ঈশ্বরের কল্পনায় আমরা রীতিমত গম্ভীর, ঠাট্টা-মশকরা দূরে থাকুক, পরম ঈশ্বরের কথায় আমরা সেই সব গভীর-কঠিন শব্দের আশ্রয় নিয়েছি যা আমরা ব্যবহার করেছি পরব্রহ্মের কল্পনায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মনুষ্য-সমাজ বড় রসিক, বড় কৌতুকপ্রবণ। যে মুহূর্তে পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান মনুষ্যরূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই মুহূর্তেই কিন্তু সেই বিরাট পুরুষ একান্ত মনুষ্যোচিত নব-রসের বিষয় হয়ে উঠেছেন এবং অবশ্যই হাস্যরসও তার মধ্যে একটি।

তবু দেবতাদের নিয়ে কবিদের কটাক্ষ-কৌতুকের বিস্তার শুরু হবার আগে এটা পরিষ্কার মনে রাখা ভাল যে, দেবতা আর ঈশ্বর তত্ত্বগতভাবে এক বস্তু নয়। এ কথাটা বুঝলে পরে একদিকে যেমন ঈশ্বরের ওপর শ্রদ্ধারও অভাব ঘটবে না, তেমনই অন্যদিকে দেবতাদের নিয়ে, এমনকি ঈশ্বরকে নিয়ে রসিকতাটাও অনেক সহনীয় হয়ে উঠবে।

কথাটা যাস্ক থেকেই আরম্ভ করা দরকার। কেননা, তিনিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি দেবতার চেহারা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। বেদের সমস্ত শব্দরাশিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তিনি দুটি বিকল্প স্থাপন করেছেন, অর্থাৎ দেবতাদের চেহারাটা মানুষের মত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। দেবতাদের শরীর আছে—এই বাবদে তাঁর প্রথম যুক্তি হল—

বেদে দেবতাদের যত স্তুতি-প্রশংসা আছে সেগুলির ভাব এমনই যেন এক অতি চেতনধর্মী ব্যক্তির কাছে আমাদের আবেদন নিবেদন পেশ করা হচ্ছে। অতএব দেবতার আকারটা হয়তো চেতন পুরুষের মতই হবে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে যেমন নামকরণ প্রথা চালু আছে, তেমনই দেবতাদেরও তো কত নাম। ইন্দ্র, যম, বরুণ, সোম এমনকি যমজ দেবতারও নাম আছে। অতএব দেবতারাও মানুষের মতই।

তৃতীয়ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হাত, পা, মাথার বিশেষত্বে আমরা যেমন মানুষের কল্পনা করি, তেমনই বেদের এক দেবতাকে আমরা বলেছি—কেমন সুন্দর গো হাত দুটি তোমার—ঋষ্বাত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ ;[১২] দৃঢ়মুষ্টিতে তুমি এই দ্যুলোক-ভূলোক ধারণ করে আছ ? অথবা ইন্দ্রের কথা ছেড়েই দিলাম, তাঁর চোয়াল থেকে আরম্ভ করে হাত, পা, পেট—সবকিছুই কবি-ঋষির দর্শন-বর্ণনের বিষয়। এছাড়া সূর্যের সোনার বরণ হাত, আদিত্যের মুখ-মণ্ডল, মিত্রের চোখ আর সবার ওপরে—তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং—এসব দেখে পূর্বমীমাংসার দার্শনিক শবরস্বামী তাঁর প্রতিপক্ষের যুক্তি সাজিয়ে বলেছেন—হ্যাঁ, শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এত বর্ণনা দেখে এরকম কথা মনে হতেই পারে যে, দেবতার শরীর মানুষের মতই হবে। নইলে, এই যে ইন্দ্রের ডান হাত, বাঁ হাত—এতসব বলছ, মানুষের চেহারা থাকলেই না তার ডান হাত, বাঁ হাত সম্ভব—পুরুষবিগ্রহস্য হি দক্ষিণঃ সব্যশ্চ হস্তো ভবতি ! তারপর এই যে গলা পেট, চোখ, পা—এগুলিও মানুষের চেহারাই প্রমাণ, অতএব দেবতার শরীর আছে—এইটাই তো মানা উচিত—তস্মাদ্ বিগ্রহবতী দেবতা।

চতুর্থত, মন্ত্রবর্ণের মধ্যে ঋষি সোমরস প্রস্তুত করে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললেন—তাড়াতাড়ি এস বাপু ! তোমার দুটি ঘোড়া আছে, দুটি ঘোড়া রথে যুতে চলে এস তুমি। তাড়াতাড়ির জন্য চারটি ছটি, আটটি এমনকি দশটি ঘোড়াও রথে যুতে চলে আসতে পার।[১৩] এই যে ইন্দ্রের দুই ঘোড়া থেকে দশ ঘোড়ার রথ, অথবা ঘোড়ায় চড়ে অথবা রথে করে পৃথিবী পরিপক্রমণ অথবা এই যে একেক জনের একেক রকম অস্ত্র, কারও বজ্র, কারও পাশ, কারও দণ্ড—এগুলিও তো দেবতাদের মানুষের কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

পঞ্চমত, ক্রিয়াকর্ম যেগুলি আছে, যেমন ধরুন—খাওয়া, পান করা, যুদ্ধ করা, বধ করা, ঘোড়া চালানো, গর্জন করা, শোনা, দয়া করা, ঘুরে বেড়ানো, ক্রুদ্ধ হওয়া, খুশি হওয়া, হতাশ করা, বিয়ে করা—এই সমস্ত ক্রিয়াই যেমন মানুষের জীবন চালনা করে, তেমনই এইরকম আরও কত শত ক্রিয়া দেবতাদেরও জীবন চালনা করে।

পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার দার্শনিক-প্রবর শবরস্বামী প্রতিপক্ষের নানা যুক্তির অবতারণা করে সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে দেবতাদের খাওয়ার যুক্তিটাই খুব জব্বর করে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—বেদে আছে—এই বিশ্ব তোমার জঠরে। অথবা ওই যে ভাষা—একেক বারে তিনি তিরিশ জালা সোমপান করেছেন—এসব তো দেবতার খাওয়ারই প্রমাণ। হ্যাঁ, প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে—বেদের ওসব কথা বাড়াবাড়ি—অর্থবাদ। দেবতারা মোটেই খান না—ন দেবতা ভুঙ্‌ক্তে। যদি খেতেন তাহলে তো প্রতিদিনের আহুতি-দেওয়ার ঘিও তো কমে কমে যেত, তা তো হয় না—যদি চ ভুঞ্জীত, দৈবতায়ৈ হবিঃ প্রত্তং ক্ষীয়েত।[১৪] ওঁরা বলেন—হয় হয়, জানতি

পার না। দেবতারা হলেন মধুকরীর মত—ফুল থেকে মধু খেয়ে গেল মৌমাছি, বাইরে থেকে দেখলে ফুলের কিচ্ছুটি হল না ; যেমন সুন্দর, সুগন্ধী, তেমনই থাকল। আসলে কিন্তু ফুলের অন্তঃসার নিয়ে গেল মৌমাছি। দেবতারাও তেমনই অন্নপানের রসটুকু খেয়ে যান, আমরা সাক্ষাতে বুঝতে পারি না—দেবতারা খেলেন—অন্নরসভোজিনী দেবতা মধুকরীবদবগম্যতে।[১৫]

শবরস্বামীর কাছে এসব কিন্তু প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তর। নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরের ঝামেলা আগেই মিটিয়ে নিচ্ছেন। হাইকোর্টে আইনের লড়াইতে দুঁদে উকিল যেমন তাঁর প্রতিপক্ষের যুক্তি নিজেই সাজিয়ে নেন এবং তারপর সে সব যুক্তি কেটে দেন, আমাদের পূর্বমীমাংসার উকিল শবরস্বামীও এতক্ষণ তাই করেছেন। বস্তুত শবরস্বামীর মত মীমাংসক-দার্শনিকদের যুক্তিতে দেবতার মূল্য খুব বেশি কিছু নয়। মীমাংসকদের কাছে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের কর্মকাণ্ডটাই বড় কথা, দেবতাদের মূল্য তত নেই। এখানে যজ্ঞ-কর্মই প্রধান, দেবতা অপ্রধান, গুণীভূত।

মীমাংসকরা বলেন—মন্ত্রময়ী দেবতা। অর্থাৎ বেদে যেভাবে যখন যেটা করতে বলা হয়েছে, সেইভাবে যদি ঠিকঠাক সবকিছু করা যায়, মন্ত্র যদি পড়া যায় নির্ভুল উচ্চারণে, তাহলে নির্দিষ্ট ফলও হতে বাধ্য, দেবতার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই মন্ত্রের ফল আটকান। মীমাংসকদের এই বিশ্বাস অনেকটা 'চণ্ডালিকা'র প্রকৃতি মত—

> পড় তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র—
> পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়ায়ে ধরুক ওর মনকে।
> যেখানেই যাক, কখনো এড়াতে আমাকে
> পারবে না, পারবে না॥

মুশকিল হল, দেবতাদের নানান ক্রিয়াকাণ্ড বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে এত বেশি মাত্রায় উচ্চারিত, যে প্রতিপক্ষের যুক্তিও সেখানে মীমাংসকদের জর্জরিত করে।

প্রতিপক্ষ বলেন—ও আবার কেমন কথা ! তোমার যজমান দেবতার উদ্দেশ্যে কত ঘি পোড়াচ্ছেন, পুরোডাশ দিচ্ছেন—সে সব কী কিছুই নয় ? তাছাড়া দেবতার উদ্দেশ্যে যজমানের দ্রব্যত্যাগই তো যাগ-যজ্ঞের অর্থ। যজমানের দেওয়া জিনিসগুলোই যে দেবতার ভোগে লাগে, সেটাই তো যাগ শব্দের অর্থ—ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ।[১৬]

প্রতিপক্ষের উদাহরণ দিয়ে মীমাংসককে আরও বোঝান—কেন রে বাবা, বাড়িতে অতিথি আসলে কী হয়, কেমন হয় ? তুমি টাকা-পয়সা খরচা করে নানা জিনিস কিনে অতিথি যেমনটি ভালবাসেন, তেমনটি রান্না করলে। তো, এই রান্না-বান্নার জন্য তোমার যে এত মেহনত, এত আয়োজন এত ত্যাগ—তার কারণটা কী ? অতিথিই তো বটে। তাই যদি হয়, তবে অতিথিই তো প্রধান। সেটা মানতেই হবে বাপু। তেমনই এই অতিথির মত তোমার যাগ-যজ্ঞেও দেবতাই প্রধান, তাঁর জন্যই না যজ্ঞ। আর মীমাংসক ! তোমার যেমন কথা বাপু, যদি দেবতার চেয়েও যজ্ঞটাই তোমার কাজে বড় হয়, তাহলে তো বলতে হবে—এই রান্না-বান্না পা-ধোয়ার জল, আর

তেল-তাম্বূলের জোগাড়-যন্ত্রটাই বড় কথা, অতিথি লোকটা যেন কিছুই নয় ?

মীমাংসক এত কথা শুনে চুপ করে থাকবেন না মোটেই। তিনি বলবেন—যজ্ঞটাই বড়, না, দেবতা বড়—সে ব্যাপারে তুমি কথা বলার কেউ নও। যা বলবে, শাস্ত্র বলবে। শাস্ত্র বলেছে—'যজেত স্বর্গকামঃ' অর্থাৎ পরলোকে স্বর্গ চাও তো যাগ-যজ্ঞ কর। এখানে যাগ করলে স্বর্গ পাবে—এ কথার মানে হল যাগের ফল স্বর্গ। কোন দেবতা এখানে ফলদাতা নন। বেদবিহিত যাগ নিয়ম-কানুন মেনে করে যাও, স্বর্গ তোমার হাতের মুঠোয়।

প্রতিপক্ষ বলবেন—এ আবার কেমন ধারা কথা ? যাগ-যজ্ঞে ঠাকুর-দেবতার তো কোন অপেক্ষাই রইল না—এমন অহংকার ধম্মে সইবে না বাপু। তাছাড়া, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রও তো একটা আছে। তাঁরা বলেছেন—দেবতারা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমার বিপক্ষে দাঁড়ান, তবে ঈপ্সিত বস্তু তোমার হাতের মুঠোয় এসেও হাত গলে বেরিয়ে যাবে—

সুরেষু বিঘ্নৈকপরেষু কো নরঃ
করস্থমপ্যর্থমবাপ্তুমীশ্বরঃ ॥ [১৭]

আর এই যে তুমি অত করে বললে—স্বর্গে যাবার বাসনা থাকলে যাগ-যজ্ঞ কর। তো সেই স্বর্গের রাজা তো ইন্দ্র। তিনি যদি তুষ্ট হন, তবে তো কেল্লা ফতে। স্বয়ং ঋক্‌বেদের ঋষি বলেছেন—জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, স্বর্গলোক—সব জায়গাতে ইন্দ্রেরই আধিপত্য, এমনকি যাগ-যজ্ঞেও তাঁরই প্রভুত্ব এবং ফল দেবার, ক্ষমতাও তাঁরই সবচেয়ে বেশি—ইন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ। ইন্দ্রের যখন এতই ক্ষমতা, সেখানে তাঁরই পূজা আরাধনা করা, তাঁরই উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পন্ন করা দরকার। সব ব্যাপারে যখন দেবতারই প্রভুত্ব, তিনি যখন ফলদাতা, সেখানে দেবতাকে না মেনে যাগ-যজ্ঞকে বড় করে দেখি কী করে ?

মীমাংসক এবার জোর গলায় বলবেন—দেখ বাপু ! শাস্ত্র। বেশি বোঝারও চেষ্টা কোর না। বেশি বোঝানোরও চেষ্টা কোর না। বেদ-ব্রাহ্মণ বলেছেন—ফল দেবে যাগ-যজ্ঞ, কর্ম, দেবতা নিমিত্তমাত্র। দেবতা ফল দিচ্ছেন—এমন কোন শ্রুতিপ্রমাণ নেই ; কিন্তু যাগ-যজ্ঞের ফলে এটা হয়েছে, কি, ওটা হবে—সেটা শ্রুতিসিদ্ধ অর্থাৎ বেদ বলেছে—হবে, অতএব হবে। বেদ নিয়ে আলোচনা করবে, অথচ শব্দ-প্রমাণ মানবে না, তা তো হয় না। অতএব বাপু, যুক্তি-উদাহরণ বেশি দেখিও না। শব্দ-ব্রহ্ম, শাস্ত্র। তাছাড়া অত দেবতা-দেবতা করছ, হাত, মুখ, পা দেখিয়ে তাঁদের শরীর বানিয়ে দিচ্ছ, তাঁদের আবার ফল দেবার ক্ষমতাও স্বীকার করছ, তাহলে বলি—বেদে তো কত সব অচেতন দেবতার কথাও আছে। এই যে বলা হয়েছে—"বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা", "মূলেভ্যঃ স্বাহা"—এখানে এই বনস্পতি, অথবা গাছের শেকড়—এসব তো দেবতা হিসেবে কল্পিত। তাহলে এদেরও ফল দেওয়ার ক্ষমতা স্বীকার করতে হয়। অথবা স্বীকার করতে হয়, তাঁদের এক একটি দেব-শরীর আছে যা চেতনও বটে। [১৮]

মীমাংসাকরা দেবতার শরীর, ক্ষমতা, চৈতন্য—সবই উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের আরও একটা বড় যুক্তি হল—দেবতার ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, কি, ভক্তের ইচ্ছাপূরণ—ওসব কল্পনামাত্র। বেশ তো, দেবতার অতই যদি ক্ষমতা, তবে বিভিন্ন জায়গায় একই সঙ্গে

বেশ কয়েকটা যজ্ঞ আরম্ভ করা যাক। বিভিন্ন যজমান, বিভিন্ন স্থান, কিন্তু যজ্ঞ এক, দেবতাও এক। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হয়ে একই দেবতার পক্ষে সশরীরে এসে বিভিন্ন যজমানকে যজ্ঞ-ফল দেওয়া সম্ভব কিনা—এমন কথা সুধীদেরই বিচার্য। অর্থাৎ মীমাংসকরা দেবতার এত মাহাত্ম্য স্বীকার করলেন না। কারণ, প্রমাণ নেই। এমন প্রমাণ নেই যে, একই দেবতা বিভিন্ন যজ্ঞস্থলে আহূত হয়ে যজমানের ঈপ্সিত ফল দান করছেন। তাঁরা বললেন—বেদের মন্ত্রই বড় কথা, যজ্ঞ-কর্মই আসল। মন্ত্রই দেবতার শরীর, মন্ত্রের বলেই যজমানের ইচ্ছাপূরণ। তবে যে বেদের মধ্যে এত শত দেবতার নাম, মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা—এগুলি অর্থবাদ, অতিশয়োক্তি। যজ্ঞে দেবতা গৌণ, নিমিত্তমাত্র।[১৯]

॥৩॥

মীমাংসকদের এইসব তর্ক-যুক্তিতে মহা-মুশকিলে পড়ে গেছেন বৈদান্তিকরা। আর শুধু বেদান্তী কেন, অনেকেই এই বিপদে তাঁদের যুক্তি-তর্ক শানিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া এটাও ভাবুন একবার, ভারতবর্ষে মত দেশ—যেখানে বেদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত শত দেবতাদের রাজত্ব, যেখানে তাঁদের প্রত্যেকের শরীর তো অতি সহজ কথা, যেখানে, তাঁদের গায়ের রঙ, চেহারার খুঁত, মায় কে কীরকম জামা-কাপড় পড়েন—তা পর্যন্ত পৌরাণিকদের কণ্ঠস্থ, সেখানে পাঁচ-ছটা জৈমিনির সূত্র আর তার ওপরে ভাষ্য রচনা করে দেবতাদের শরীর, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য—সবই উড়িয়ে দিলাম—এই কী ভারতবর্ষের ধাতে সয় ?

বেদান্তীরা, এমনকি শঙ্করাচার্যের মত কট্টর অদ্বৈত-বেদান্তী পর্যন্ত মীমাংসকদের এইসব কথায় একেবারে ফুঁসে উঠেছেন। ওঁদের বক্তব্য—জৈমিনি, কী শবরস্বামী বললেই কী শেষ কথা হল নাকি ? বেদ-ব্রাহ্মণ কী কিছুই নয়। তাছাড়া এই যে এতকালের ইতিহাস-পুরাণ—বেদ-মূলক বলেই না এই সব গ্রন্থকে সবাই এত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে শাস্ত্রের মর্যাদা দেয়। সেগুলি কী এতই ফেলনা নাকি ?

শঙ্করাচার্য তো সোজাসুজি মহাভারতের সেই সূর্য-কুন্তীর মিলন-দৃশ্যটাই নিজের লেখার মধ্যে উদ্ধার করেছেন। সেই যে দুর্বাসার সেবা করে কুন্তী বর পেলেন নিজের ইচ্ছামত দেব-পুরুষের সঙ্গ লাভ করার। আর বর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তী তাঁর মন্ত্র পরীক্ষার জন্য আহ্বান করলেন আকাশে উদীয়মান রক্তিম সূর্যকে। একলা ঘরে নির্জন অলিন্দে বসে আকাশ-লম্ব সূর্যের করস্পর্শ লাভ করে কুন্তী সূর্যের মধ্যে প্রথম প্রেমিক পুরুষের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন—সোনার বরণ বর্ম-পরা, দিব্য কুণ্ডলে শোভমান। কুন্তীর বড় ভাল লেগেছিল। তিনি দুর্বাসার বশীকরণমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন দেবপুরুষকে।

হঠাৎ আকাশ থেকে মর্ত্য মানবীর সাদর আহ্বান শুনে দেব-পুরুষ কী করেছিলেন ? তিনি নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে একভাগে আকাশে থাকলেন আলোক বিকিরণ করার জন্য, আরেকভাগে দিব্য পুরুষের মনোমোহন রূপে ধরা দিলেন কুন্তীর বাহুপাশে। আর এই দৃশ্য দেখে শঙ্করাচার্য বলে উঠলেন—সম্ভব। নিশ্চয় সম্ভব। মীমাংসকেরা যতই বলুন, এক দেবতার পক্ষে বহুজনের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। আমরা

বলি—সম্ভব। দেবতা আপন ঐশ্বর্যবলে যেমন একদিকে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান করতে পারেন, তেমনই ইচ্ছে অনুসারে শরীরও ধারণ করতে পারেন—অস্তি হি ঐশ্বর্য-যোগাদ্ দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিশ্চাবস্থাতুং, যথেষ্টং চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম্। মহাভারতে আছে—সূর্য যোগবলে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে কুন্তীর কাছেও এলেন আবার আকাশ থেকে তাপও বিকিরণ করলেন—যোগাৎ কৃত্বা দ্বিধাত্মানমাজগাম ততাপ চ। শঙ্করাচার্য এই 'যোগ' কথাটাতেই স্পষ্ট করে বললেন—'ঐশ্বর্যযোগাৎ' অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তিতেই সূর্য পুরুষের রূপ ধরে এলেন কুন্তীর কাছে—আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগাম হ।[২০]

বলা যায়—এসব তো ভাই ইতিহাস-পুরাণের কথা। মানুষের রচনায় ভ্রম-প্রমাদ থাকে। অতএব অপৌরুষেয় বেদে এসব পাবে না। শঙ্কর বললেন—কেন পাবে না। বেদের ব্রাহ্মণভাগে দেখ—ইন্দ্র মেষ হয়ে কাণ্বায়ন গোত্রের ঋষি মেধাতিথিকে হরণ করেছিলেন—মেধাতিথিং হি কাণ্বায়নম্ ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহার।

সত্যি কথা বলতে কি, শুধু এই একটা লাইন বলেই মহামতি শঙ্করাচার্য দেবতাদের শরীর স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি একটু আগে আমরা যে বেদের প্রমাণে ইন্দ্রের হাত, মুষ্টি ইত্যাদি প্রত্যঙ্গের কথাবলেছি, তাঁর বৃত্র-হত্যার কথা বলেছি অথবা যজমানের দেওয়া আহুতি স্বীকার করার কথা বলেছি—এগুলি মীমাংসকরা স্বীকার না করলেও শঙ্করাচার্য স্বীকার করেন। মীমাংসকের কথা শুনে শঙ্কর ভারী আশ্চর্য হয়েছেন। শঙ্কর বলেন—রূপ ছাড়া আবার দেবতা হয় নাকি? যার কোন রূপ, নেই, মূর্তি নেই—তার কথা ভাবব কী করে, ধ্যান করব কী করে—ন হি স্বরূপ-রহিতা ইন্দ্রাদয়ঃ চেতসি আরোপয়িতুং শক্যন্তে? দেবতা যদি ভক্তজনের মানসলোকে আরূঢ় না হন, তাহলে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ারই বা মানে কী—ন চ চেতসি অনারূঢ়ায়ৈ তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে।[২১]

শঙ্করের এইসব কথার জবাব দেওয়া মীমাংসকদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শঙ্কর এটা মানেন যে, ইন্দ্র, যমের মত বৈদিক দেবতারা মানুষের মত জীবই বটে, তবে তাঁরা উন্নত শ্রেণীর জীব। মানুষ থেকে তৃণ পর্যন্ত যে সজীব পরম্পরা আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে জীবত্ব সমান হলেও তাদের জ্ঞান এবং ক্ষমতার তারতম্য আছে। অর্থাৎ মানুষ-জীবের থেকে নিম্নস্তরের জীব যারা, তাদের জ্ঞানও কম, ক্ষমতাও কম এবং একেবারে তৃণ পর্যন্ত গেলে প্রত্যেকের মধ্যে তারতম্যটাও যথেষ্ট চোখে পড়বে। ঠিক একইভাবে মানুষ-জীবের থেকে ওপরের দিকে যখন তাকাব, তখন দেখব মানুষ থেকে সেই সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত প্রত্যেকেরই একের থেকে অন্যের জ্ঞান এবং ক্ষমতা পর পর বেশি—জ্ঞানৈশ্বর্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ ন শক্যং নাস্তি ইতি বদিতুম্।[২২]

আসলে মানুষের যেমন পুণ্যকর্ম, ভাল কাজের মাধ্যমে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, দেবতাদেরও তেমনই। মহাভারত-পুরাণে হাজারো উদাহরণ আছে, যেখানে অন্যায় এবং অনিয়মের ফলে দেবতাদের স্থানভ্রষ্ট হতে দেখছি, আবার অনেক মানুষকেও দেখছি অসাধারণ সংযম-নিয়মে অথবা সুকর্মে নিজেকে দেবতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে। পাণ্ডব-কৌরবের বহুপূর্ব পুরুষ নহুষকে মনে আছে তো? সেই যিনি বনপর্বে অজগরের চেহারায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন ভীমকে। তিনি শাপগ্রস্ত হয়েই

সর্পে পরিণত হয়েছিলেন—এই পতনের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হল—তিনি আপন যোগ্যতায় স্বর্গের ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন।

আসলে ইন্দ্রত্ব একটা উপাধি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখেছি স্বর্গের দেবতাদের হঠিয়ে দিয়ে মহিষাসুরই ইন্দ্র হয়ে স্বর্গের সিংহাসনে বসেছে। একইভাবে আরও অনেক অসুর-রাক্ষসকেও আমরা ইন্দ্রের আসনে বসতে দেখেছি। অসুর-রাক্ষস অথবা দেবতারা যেমন ইন্দ্রত্ব লাভ করেন, সেইভাবে কখনও বা মানুষও ইন্দ্র হয়ে বসেছে স্বর্গের দেবসভায়। নহুষ সেইরকমই একটা দৃষ্টান্ত।

নহুষের ইন্দ্র হওয়ার মধ্যে বেশ একটা গণতান্ত্রিকতাও ছিল। মর্ত্যভূমিতে তিনি সুন্দর রাজ্য শাসন করছিলেন। কিন্তু স্বর্গে বোধহয় উপযুক্ত নেতার অভাব ঘটেছিল। অবস্থা দেখে—ঋষিরা এবং দেবতারা ঠিক করলেন—নহুষকেই ইন্দ্রত্ব দেওয়া হোক। তিনি তেজস্বী, যশস্বী এবং ধার্মিক। নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা তাঁরা নহুষকে জানালেন। নহুষ বললেন—আমি সামান্য মানুষ, আপনাদের মত বড় মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো কি আমার কুলোবে? ইন্দ্র হতে গেলে শক্তি লাগে, সে শক্তি আমার নেই। সবাই বললেন—অমন কথা বলবেন না। আপনিই আমাদের রাজা হোন। আমরা আমাদের তেজ এবং শক্তি দিয়ে আপনার শক্তি বাড়াব।[২৩]

গণতন্ত্রে যেমন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সাংসদদের শক্তির ভিত্তিতেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের নেতারা যেমন দল-মুখ্যকেই নিজের জনপ্রিয়তার শক্তি ধার দেন, এখানে মহাভারতে দেখছি শুধু দেবতাই নয়, দেব-মানব-যক্ষ, ঋষি, রাক্ষস, সিদ্ধ-গন্ধর্ব সবারই তেজোবলে ঋদ্ধি লাভ করে মর্ত্যভূমির রাজা নহুষ ইন্দ্র হয়ে বসলেন স্বর্গে। নহুষ যখন স্বর্গের আধিপত্য লাভ করলেন তখন তাঁর সামনে ছিল ধর্মের অনুশাসন। কিন্তু 'পাওয়ার' পেলে সমস্ত রাজনৈতিক নেতার যা হয়, নহুষের তাই হল। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হয়ে নহুষ ধর্মাত্মা নৃপতি থেকে কামাত্মা পুরুষে পরিণত হলেন—ধর্মাত্মা সততং ভূত্বা কামাত্মা সমপদ্যত।[২৪] নহুষের পতন হল। তাঁর ইন্দ্রত্ব গেল।

কাজেই মানুষের পক্ষেও ইন্দ্র হওয়া সম্ভব, অসুর-রাক্ষসের পক্ষেও ইন্দ্র হওয়া সম্ভব। এর উদাহরণ ইতিহাস-পুরাণে ভূরি-ভূরি আছে। মনে রাখা দরকার—পুরাণের দৈত্য-দানবেরা দেবতাদেরই বৈমাত্রেয় ভাই, অতএব ক্ষমতা, বুদ্ধি অথবা যশ কোনটাই তাঁদের কিছু কম নয়। বরঞ্চ আচার্য শঙ্করের মত মেনে বলতে হবে—মানুষের থেকে দেবতা, এমনকি অসুর-রাক্ষসদের বল-বুদ্ধি পর পর বেশি। আর বেশি বলেই দেবতাদের ব্যাপারটা মানুষের চেয়ে একটু অন্যরকম।

মানুষ পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে না, অতএব যদি বলি দেবতারাও পারেন না, তাহলে ভুল বলা হবে। ভুল এইজন্যে যে, মানুষের চেয়ে দেবতাদের ঐশ্বর্য অথবা ক্ষমতা বেশি। মহাপ্রলয়ে যখন সব নষ্ট হয়ে যায়, তখন কল্পান্তরে বিধাতাপুরুষ আবার বসেন সৃষ্টির তপস্যায়। তাঁর পূর্বকল্পের তপস্যা-বৈরাগ্য পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বিফল হয় না মোটেই। শঙ্কর বলেছেন—প্রকৃতির নিয়মে যে বৃক্ষ-কুল বসন্তের পুষ্পশোভা আপন অঙ্গে ধারণ করেছিল, মাঝখানে প্রকৃতির নিয়মে পাতা-ঝরার মত প্রলয় হয়ে গেলেও আগামী বসন্তে যেমন আবারও ফিরে আসে সেই নববসন্তের শোভা, বিধাতাও তেমনই পূর্বপুণ্য-তপস্যায় এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ব সৃষ্টি স্মরণ করতে পারেন।

ফলে কী হয় ? শঙ্করাচার্য শাস্ত্রযুক্তি দিয়ে বললেন—অতীত কল্পে দেবতাদের যেমন রূপ ছিল, বর্তমান কল্পেও দেবতাদের সেই রূপ, সেই কাজকর্ম, সেই অভিমানই থাকে—

যথাভিমানিনোঽতীতা স্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ।
দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ ॥ [২৫]

অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বেদান্তীরা দেবতাদের কিন্তু উড়িয়ে দিলেন না। স্বীকার করে নিলেন—তাঁদের শরীর আছে। ওঁরা বলেন—দেবতাদের শরীর বোঝা যায় পাঁচ রকমে। দেবতাদের পাঁচ রকমের শরীর আছে। একে বলে বিগ্রহ-পঞ্চক। বিগ্রহ মানে শরীর। দেবতাদের শারীরিক অধিষ্ঠান পাঁচভাবে বোঝা যায়। এক, দেবতারা ইচ্ছেমত শরীর ধারণ করতে পারেন। দুই, যজ্ঞে দেওয়া আহুতি বা হবির্ভাগ তাঁরা ভক্ষণ করতে পারেন। তিন, তাঁদের ঐশ্বর্য বা সকলের ওপর তাঁদের প্রভুত্ব আছে। চার, মানুষের দেওয়া পূজা-উপাচারে তাঁরা প্রসন্ন হন। এবং পাঁচ, তাঁরা মানুষের ক্রিয়াকর্মের ফল দিতে পারেন। দেবতাদের যে শরীর আছে—এই পাঁচটা তার প্রমাণ। [২৬]

শঙ্করাচার্য বলেছেন—বেদে-ব্রাহ্মণে যখন দেবতাদের শরীর সম্বন্ধে, স্পষ্ট কথা বলা আছে, তখন দেবতার শরীরটা তো মানতেই হবে। উলটো করে যদি প্রশ্ন করা যায়—এখন যেমন কোন দেবতা দেখতে পাচ্ছি না, তেমনই আগেও কোন দেবতা ছিল না। অর্থাৎ এখনকার মত আগেও কেউ দেবতার চেহারা দেখেনি, অথবা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাও কেউ বলেনি। শঙ্কর বলেন—এ আবার কেমন যুক্তি—এখন আমরা রাজতন্ত্র দেখি না বলে সেকালে কী রাজাও ছিল না। এখন রাজসূয় যজ্ঞ হয় না বলে কী সেকালেও রাজসূয় যজ্ঞ হত না? তাহলে তো সমস্ত জগদ্-বৈচিত্র্যটাকেই অস্বীকার করতে হয়।

এটা মানতেই হবে যে, প্রাচীনেরা আপন ধর্ম-প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, কথাবার্তাও অবশ্যই বলেছেন। মন্ত্রজপের মাধ্যমে ইষ্ট-দেবতার দেখা মিলবেই মিলবে। তবে হ্যাঁ, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের সঙ্গে ঋষিদের শক্তি-সামর্থ্যের তুলনা কর না—ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেন উপমাতুং যুক্তম্। [২৭] তাছাড়া শাস্ত্র-ফাস্ত্র যদি ছেড়েই দাও তো অধুনা যারা 'ফোক্-ফোক্' করে ডাক ছাড়ছেন, তাঁরা ফোক-ট্র্যাডিশনেই বিশ্বাস করুন। লোক-প্রসিদ্ধি যখন বলে যে, দেবতার শরীর আছে, দেবতা আছে, তখন দেবতা-ব্যাপারটা নিরাধার করে দেওয়া কেন বাপু—লোক-প্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনা অধ্যবসাতুং যুক্তা ?

দেবতার শরীর মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহামতি শঙ্কর কিন্তু মনুষ্যভাবও স্বীকার করে নিলেন দেবতাদের। মানুষের চেয়ে তাঁরা বেশি বুদ্ধিমান—ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় একথা বললেও শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাপত্তর যেভাবে চলেছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় দেবতাদের তিনি মানুষই মনে করেন। শঙ্করের মতটা খুব স্পষ্ট করে বোঝা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন—অথবা এ কথাই বলা ভাল যে মানুষ ছাড়া দেবতা বা অসুরের কোন অস্তিত্বই নেই—অথবা ন দেবা অসুরা বা অন্যে

কেচন বিদ্যন্তে মনুষ্যেভ্যঃ। [২৮]

মানুষের মধ্যেই যাঁদের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা যথেষ্টই আছে এবং যাঁরা লোকোত্তর গুণের অধিকারী, তাঁরাই হলেন দেবতা—মনুষ্যাণামেব অদান্তা যে অন্যৈরুত্তমগুণৈঃ সম্পন্নাঃ তে দেবাঃ। [২৯] শঙ্করের এই কথাটা আমি একশ গুণ মানি। এতটাই মানি যে, রাম, কৃষ্ণ এবং চৈতন্যের মত অসাধারণ ব্যক্তিরা মানুষই ছিলেন বলে মনে করি, কিন্তু অতি উত্তম গুণের মাহাত্ম্যে তাঁরা দেবতা হয়ে গেছেন। শুধু দেবতা নয়, এঁরা ঈশ্বর পদবী লাভ করেছেন। শঙ্করের মতে মানুষ হল লোভ-প্রধান। শুধু লোভের কথা এইজন্য বলেছেন শঙ্কর যে, মানুষের কাম-ক্রোধের মূলে থাকে লোভ। লোকোত্তর দেবপুরুষেরা এই কাম-ক্রোধ-লোভ জয় করেছেন বলেই তাঁরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যান। অপি চ অতিলোভী মানুষেরাই যখন হিংসায় ক্রূর হয়ে ওঠে, তখন তারাই অসুরের পদবী লাভ করে—লোভপ্রধানা মনুষ্যাস্তথা হিংসাপরাঃ ক্রূরাঃ অসুরাঃ। তাহলে একই মানুষই নিষ্ঠুরতা আর অনিষ্ঠুরতার গুণে কখনও অসুর কখনও দেবতা—তে এব মনুষ্যা অদান্তাদি-দোষত্রয়মপেক্ষ্য দেবাদিশব্দভাজো ভবন্তি। দেবতা, মানুষ আর অসুরের এই আত্যন্তিক পার্থক্যটা অবশ্য সত্ত্ব-রজ-তমের পার্থক্যেও ভাবা যায়—যা শঙ্করও ভেবেছেন এবং আরও বেশি করে ভেবেছেন সাংখ্য দর্শনের লোকেরা। সে কথায় পরে আসছি।

দেবতার মধ্যে এই মনুষ্যভাবটি এসে যাওয়ায় একদিকে যেমন বৈদিক যুগের শেষে তাঁদের ওপর একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল—যে অবিশ্বাস বা সন্দেহ ধরা পড়েছে প্রসিদ্ধ সেই ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে—তবে আর কার উদ্দেশ্যে ঘি পুড়িয়ে আহুতি দেব—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ—ঠিক তেমনই এই সন্দেহ টিকে গিয়েছে একেবারে আধুনিক যুবা পর্যন্ত। নীতি-শাস্ত্রের কবি শ্লোক বেঁধে বলেছেন—দুর্বল-লোকই দেবতার মার খায় বেশি। এই যে দেবতার উদ্দেশ্যে হাজারো মন্ত্রে পশুবলির বিধান আছে, কই সেখানে তো হাতী-ঘোড়া বলি দেওয়ার বিধান নেই। আসলে হাতী বলি দেওয়াও অত সোজা নয়, ঘোড়া-বলিও মানুষের সাধ্যে বড় কুলোয় না। বাঘ-সিংহ বলি তো দূরের কথা—অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব চ নৈব চ। অতএব দেবতার প্রীতির জন্য বেছে নেওয়া হল নিরীহ দুর্বল ছাগশিশুকে, কারণ মানুষ তাকে কব্জা করতে পারে ভাল, খেতেও পারে ভাল। দেবতারাও তাই শক্তের ভক্ত নরমের যম—দেবো দুর্বলঘাতকঃ। [৩০]

দেবতার প্রতি এই যে আক্ষেপটুকু এসেছে, তার কারণ মানুষ দেবতাকে নিজেরই আদলে গণ্য করেছে। মানুষ যদি বাঘ-সিংহ মেরে বলি দিতে না পারে, শাস্ত্রের বিধানও আসবে সেই নিরুপায়তার সূত্র ধরেই। দেবতারাও কোথায় বাঘ-সিংহের মত হিংস্র পশু বলি হিসেবে চান না। কারণ সেটা জোটাতে গেলে, মানুষের ভক্তি বলে আর কোন জিনিস থাকবে না। দেবতারা উত্তমোত্তম গুণে গুণী মানুষই, অতএব মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁরা বোঝেন।

শঙ্করাচার্য বলেছেন—মানুষের নাকি লোভ বেশি—লোভপ্রধানা মনুষ্যাঃ। সেক্ষেত্রে নানা পুরাণ-ইতিহাস ঘেঁটে হাজারটা এমন উদাহরণ দিতে পারি যাতে বোঝা যাবে—লোভের ব্যাপারে দেবতারাও কিছু কম যান না। কিন্তু যত লোভই থাক, এমন বিশিষ্ট লোভহীনতার উদাহরণও আবার আছে—যাতে দেবতাদের মানুষের চেয়ে

উচ্চভূমিতে আসন দিতে হবে, আর ঠিক এইখানটাতেই সত্ত্বগুণ অথবা রজস্তমের প্রশ্নটা আসবে।

॥ ৪ ॥

আমরা দেখলাম—অদ্বৈতপন্থী বৈদান্তিকরাও দেবতাদের পক্ষে দাঁড়ালেন। যে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মতত্ত্বকে নিরাকার নির্বিশেষ বলতে বলতে প্রায় শূন্যের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেই শঙ্করও দেবতাদের পক্ষে উকিল দাঁড়ানোয় বড় সুবিধে হয়ে গেছে দেবতাদের। এর মধ্যে শঙ্করের উপাধি-তত্ত্ব, মায়া-তত্ত্বের সমস্যা দেবতাদের মাথায় চেপে বসবে, তবু শঙ্করের মত মায়াবাদীর হাতেও তাঁরা নিজের রূপ, গুণ এমনকি ক্ষমতা বজায় রাখতে পেরে ধন্য হবেন বলে মনে করি। বেদান্ত ছাড়াও দেবতারা অবশ্য আরও একবার দার্শনিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবেন নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য-দার্শনিকদের কাছে। সেও বড় কম কথা নয়। ষড়-দর্শনের মধ্যে অন্যতম প্রধান শরিক এবং জগৎকর্তা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সাংখ্যকেও যদি দেবতাদের সাহায্যে হাত বাড়াতে দেখা যায়, তবে আমাদের দিক থেকেও সুবিধে। আরও সুবিধে হয় যদি দেবতাদের প্রায় মানুষের মাহাত্ম্যেই আমরা ভাবনা করতে পারি।

তো সাংখ্য-দার্শনিকরা আমাদের সেই সুবিধেই দিয়েছেন। তাঁরা বলেন—দেবতারাও মানুষের মত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার একটা অঙ্গ, ভৌতিক-সৃষ্টির একতম কল্প। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় দেবতারা যেমন একটা প্রকারমাত্র, তেমনই আর এক প্রকার হল পশু-পক্ষী-মৃগ-গাছেরা আর শেষতম প্রকার হল মানুষ। সাংখ্যতত্ত্বে দেবতারা হলেন আট রকম। শুনতে যতই অবাক লাগুক, এই আট কিসিমের দেব-পদবী যাঁদের আছে, তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, পিতৃগণ আছেন, তেমনই মাঝখানে আছেন গন্ধর্ব-নাগেরা এবং অন্যদিকে আছেন রাক্ষস এবং পিশাচেরা। প্রসিদ্ধ সাংখ্যগ্রন্থ যুক্তিদীপিকার অজ্ঞাত লেখক রাক্ষস-পিশাচদেরও দেবযোনির মধ্যেই গণ্য করেছেন—অষ্টবিকল্পো দৈবঃ—এবং বেদ-পুরাণের ভাবনায় এই কথা যুক্তিযুক্তই বটে।[৩১]

সে যাই হোক, সৃষ্টির ব্যবস্থায় দেবতারা না হয় মানুষের সঙ্গে এক পংক্তিতেই বসলেন, কিন্তু মূলত তাঁরা যে মানুষের চেয়ে একটু উঁচু জাতের প্রাণী সে কথাটা বোঝানোর জন্য সাংখ্য-দার্শনিকেরা সত্ত্ব-রজ-তম-ভেদে তিনটে 'লেয়ার' তৈরি করেছেন উঁচু, নীচু এবং মধ্যস্থান। ঊর্ধ্বলোকে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণ বেশি—সত্ত্ববিশালঃ—তাঁরাই দেবতা। পাতালবাসী পশুপক্ষীমৃগেরা হল তমোবিশাল, তাদের মধ্যে তমোগুণ বেশি। আর মানুষ আছে মাঝখানে, তাদের মধ্যে রজোগুণ বেশি—রজোবিশালঃ। দেবতারা সত্ত্ববহুল বলে তাঁদের মধ্যে রজস্তমের বিকার নেই, তা কিন্তু নয়। তবে সে বিকার তাঁদের অল্প। একইভাবে মানুষ রজোবহুল বলে সত্ত্ব এবং তমো গুণের ছিটে-ফোঁটা তাদের মধ্যে নেই, সেটা ভাবাও ভুল। আসলে দেবতাদের মধ্যে সত্ত্বেরই প্রাধান্য, ঠিক যেমন মানুষের মধ্যেও রজোগুণের প্রাধান্য। অদ্বৈত-বেদান্তীরা অন্যভাবে হলেও দেবতাদের আপেক্ষিক উচ্চতা স্বীকার করেছেন একই কায়দায়, সে আমরা আগেই দেখেছি।

উচ্চ-নীচ ভেদ করে সাংখ্য দার্শনিকরা কিন্তু দেবতা আর মানুষকে আবারও মিলিয়ে দিলেন এক জায়গায়। তাঁরা বললেন—যতই সত্ত্বগুণের আধার হোন আর যতই ঊর্ধ্বলোকের বাসিন্দা হোন দেবতারা, জরা-মরণের দুঃখ তাঁদের মানুষের মতই। বুড়ো হওয়ার কষ্ট আর মৃত্যুর যন্ত্রণা—এ যেমন মানুষের আছে, তেমনই দেবতাদেরও আছে।

অন্যেরা বললেন—কেন জন্মের দুঃখটাই কি কম ? মায়ের পেটে পুঁজ-রক্ত মেখে গর্ভের আঁধারে চক্ষু মুদে দশ মাস কাটানো—সেও কি কম দুঃখের ? যুক্তিদীপিকার লেখক যুক্তি দিয়ে বললেন—দেখ বাপু ? ওই জন্মের কষ্টটা দেবতাদের নেই, বিদ্যুতের ঝিলিকের মত এক লহমায় তাঁরা শরীর ধারণ করতে পারেন, এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে—তড়িদ্‌বিলসিতবৎ ক্ষণমাত্রেণ শরীরপ্রাদুর্ভাবাৎ।[৩২]

জনান্তিকে চুপি চুপি বলে রাখি—দেবতাদের যে শরীর বলে একটা জিনিস আছে—বেদান্তীদের মত সাংখ্য দার্শনিকেরাও সেটা স্বীকার করে নিলেন। আর শরীর আছে বলেই দেবতার জন্ম-জরা-মরণ, কোনটাই স্বীকার করে নিতে তাঁদের বাধেনি। তাঁরা বললেন—জন্মের দুঃখটা না হয় কোনরকমে পূর্ব পুণ্যের ফলে উতরে গেলেন দেবতারা, কিন্তু জরা-মরণ আটকাবেন কী করে—জরামরণকৃতং তু তেষ্বপি ন নিবর্ততে।[৩৩]

আমরা সাধারণ জনেরা অবশ্য অন্যরকম শুনেছি। ইতিহাস-পুরাণে শুনেছি—স্বর্গের থানে কত সুখ। জরা-মরণ বলে কোন জিনিসই নেই সেখানে। স্বর্গের দেবতাদের অনন্ত যৌবন এবং সব সময়েই তাঁরা উর্বশী-রম্ভার কাঁধে হাত রেখে স্বর্গীয় দ্রাক্ষাফল খাচ্ছেন অথবা অমৃত পান করছেন। সাংখ্য বলে—ওসব যত শোনা যায়, তত নয় মোটেই। হ্যাঁ এটা তো ঠিকই—মানুষের আয়ুর চেয়ে দেবতাদের আয়ু অনেক বেশি। কিন্তু তাই বলে অজর অমর হয়ে চিরকাল তাঁরা স্বর্গভূমিতে রাজত্ব করে যাচ্ছেন—এ কথাটা ঠিক নয়। সাংখ্যমতে জরা কিংবা বিনাশ দেবভূমিতেও একইরকম। পুরাণের শ্লোক সংগ্রহ করে যুক্তিদীপিকা বলেছে—পুণ্যবল ক্ষীণ হলে স্বর্গ থেকে যখন দেবতাকে মরণান্তক বিদায় নিতে হয়, তখন দেবতাদের দেখায় ধূলি-মলিন, তাঁদের গায়ের রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়, স্বর্গের সদ্যোচ্ছিন্ন মন্দার-মঞ্জরীও গলায় শুকিয়ে যায়—রজোবিষক্তিরঙ্গেষু বৈবর্ণ্যং ম্লানপুষ্পতা।[৩৪]

যতটুকু বলা হল—লক্ষণ মেলালে এটাকে জরা বলতে হবে। কিন্তু দেবতাদের যে মরণও আছে—তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পুরাণে। পুরাণে দেখছি—চতুর্দশ মন্বন্তরে যখন সৃষ্টির সংহার-কাল উপস্থিত হল, তখন দেবতারা নিজেদের অন্তকাল বুঝে বিপদের আশঙ্কায় বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—ততস্তে অবশ্যভাবিত্বাদ্ বুদ্ধা পর্যায়মাত্মনঃ।[৩৫] তাহলে দেখলেন—দেবতাদের কাছে জন্ম ব্যাপারটা বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ফটাফট্ করে হলেও মরণটা অত ফট্ করে হয় না। তাছাড়া যে দেবতাদের অনন্ত যৌবন সম্বন্ধে আমরা প্রায় নিশ্চিত ছিলাম, নানা গবেষণায় দেখছি, তাঁদের অসুখ-বিসুখও কিছু কম নয় হাঁচি-কাশি নেই বটে, কিন্তু বড় বড় রোগ বেশ আছে।

যুক্তিদীপিকার দার্শনিক একেবারে বেদ থেকে নথি তুলে দেখিয়েছেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রের মত লোকেরও কত কষ্ট। তাঁর নাকি একবার 'ইনসোম্‌নিয়া' ধরেছিল। সারা রাত তাঁর ঘুম হয় না, রাত-ভর শুধু বিছানায় ওঠেন আর বসেন। আর কে না

জানে—রাতের পর রাত ঘুম না হলে উর্বশী-রম্ভার নাচ-গানেও তখন বিরক্তি আসে। শত যজ্ঞের ঘি-খাওয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নাদুস-নুদুস শরীর একেবারে হাড়-জিরজিরে হয়ে গেল। অথচ দুনিয়ার লোক হাজার রকমের 'প্রেসক্রিপশন' দিয়েও তাঁকে ঘুম পাড়াতে পারল না—ইন্দ্রং ক্ষামমপি ন সর্বভূতানি প্রস্বাপয়িতুং নাশক্নুবন্।[৩৬] নানা চিকিৎসার পর এই মানুষ-ঋষিরাই অবশ্য তাঁর অসুখ সারিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা 'কামপোজ-ভ্যালিয়াম' প্রভৃতির কড়া ডোজ্ দিয়ে ইন্দ্রের দফা-রফা করেননি। বরঞ্চ চিকিৎসা করলেন অদ্ভুত এক পদ্ধতিতে। আধুনিক চিকিৎসকরা এই প্রণালী ভেবে দেখতে পারেন। বৈদিক সাম-গানের নানা রকম 'স্কুল' আছে। ঋষিরা 'ত্বাষ্ট্রীয়' স্কুলের হালকা সাম-সঙ্গীতে ইন্দ্রের ঘুম ফিরিয়ে আনলেন—তম্ এতেন সাম্না ত্বাষ্ট্রীয়েণ অস্বাপয়দিতি।[৩৭] ইন্দ্র জানে বেঁচে গেলেন।

ইন্দ্রের কথা বলেই সাংখ্য দার্শনিক প্রজাপতির ব্রহ্মার বায়ু-রোগের কথাটাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর শরীর খারাপ হয়ে যাবার কথা বললেও এই মুহূর্তে তাঁর ভাল হবার খবর আর দেননি সেই দার্শনিক। এই বিশাল জগৎসৃষ্টি করার পরিশ্রমে বেলা-অবেলায় খেয়ে না-খেয়ে যে অসুখ তিনি বাঁধিয়েছিলেন, তাতে আবার বয়সটাও তাঁর ভারী—এ অসুখ আর সেরেছিল বলে মনে হয় না। ফলে সাংখ্য-দার্শনিক শুধু বলে দিয়েছেন—প্রজাপতিকে বায়ুরোগ বড় জ্বালান জ্বালিয়েছে—প্রজাপতে র্বায়ুরক্ষয়ীৎ।[৩৮]

ইন্দ্র গেলেন, প্রজাপতি গেলেন, এবার চন্দ্রের কথায় আসি। দেবতার রাজ্যে চাঁদ হলেন রাজা। সমুদ্র-মন্থনের নিট্-ফল অমৃত, সুধা অথবা সোম-রসের সঙ্গে চন্দ্রের নাম একার্থক হয়ে গেছে। যজ্ঞ করতে গেলে হাজার হাজার বছর আগে ঋষিরা চন্দ্রকে যে মাহাত্ম্য দান করেছিলেন, এখনও শান্তি-স্বস্ত্যয়নে সেই মাহাত্ম্য স্মরণ করে বলতে হয়—সোমং রাজানং হবামহে—আমরা রাজা সোমকে ডাকছি, তাঁকে আহুতি দিচ্ছি। পুরাণ-কথায় জানা যায়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং সূর্যের সারভূত পরম আনন্দময় জ্যোতি যখন মহর্ষি অত্রির নয়নের মাঝখানে ঠাঁই দিয়েছিল, তখন তাঁর আনন্দাশ্রু থেকে জন্ম হয়েছিল জ্যোৎস্নার আধার চন্দ্রের। ব্রহ্মর্ষিরা তাঁকে স্তব করে নিজেদের প্রভু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন—তত্র ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তমস্মৎস্বামী ভবত্বয়ম্।[৩৯]

দেবরাজ্যে এমন সুন্দর একটা সৎপাত্র দেখে সাতাশটি মেয়ের বাবা দক্ষ-প্রজাপতি অত্যন্ত খুশি হয়ে সবগুলি মেয়েকেই দিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা—এইরকম সাতাশটি নক্ষত্রের স্বামী হয়ে চন্দ্রমা নিজের ঘরে ফিরলেন বটে, কিন্তু সাতাশজনকেই তিনি খুশি করতে পারলেন না। দক্ষের সব কন্যারাই যথেষ্ট সুন্দরী বটে, কিন্তু এঁদের সবার চেয়ে রোহিণী ছিলেন আরও বেশি সুন্দরী—অত্যরিচ্যত তাসান্তু রোহিণী রূপসম্পদা।[৪০] রোহিণীর রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্রমা তাঁর অন্য জীবন-সঙ্গিনীদের অবহেলা করতে আরম্ভ করলেন। ছাব্বিশ জন নক্ষত্র-সুন্দরী চন্দ্রের হৃদয়-রসে বঞ্চিত হয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন—কেমন করে তাঁদেরই সহোদরা এক রমণী সুধাকর চন্দ্রকে মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দিন নেই রাত নেই চন্দ্র শুধু রোহিণীর ঘরেই পড়ে আছেন। রোহিণীর শরীর-সম্ভোগ এবং আন্তরিক সরসতায় চন্দ্রের মন-প্রাণ একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তাঁর ভাব-গতিক দেখে তাঁর অন্য স্ত্রীরা সকলেই মনে বড় কষ্ট পেলেন। তাঁদের বড় রাগও হল।

কুপিতা নক্ষত্র-সুন্দরীরা সবাই মিলে বাপের বাড়ি এলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে বাবা দক্ষকে জানালেন মনের ব্যথা—দেখ বাবা! চন্দ্র শুধু রোহিণীকেই ভালবাসে, আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না কখনও—সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা।[৪০] এ অবস্থায় আর ফিরে যাওয়া চলে না। আজ থেকে তোমার এখানেই আমরা থাকব। দক্ষ দেখলেন—একটি অতিসুন্দরী মেয়ের জন্য তাঁর অন্য ছাব্বিশটা মেয়ের জীবন বৃথা হয়ে যাচ্ছে। তিনি জামাইকে ডেকে বললেন—দেখ বাবাজীবন! সবগুলি স্ত্রীকেই তুমি সমানভাবে দেখার চেষ্টা কর, এমন অধর্ম আর কোর না।

দক্ষ এবার মেয়েদের বললেন—বলে দিয়েছি শশীকে, তোমার এবার যাও সেখানে, সে এবার তোমাদের সমদৃষ্টিতে দেখবে। দক্ষের মেয়েরা হুড়মুড় করে স্বামীর বাড়িতে ফিরে এলেন বটে। তবে কিসের কী, চন্দ্রের অবস্থা যা ছিল তাই। সেই রোহিণীর মুখ দেখে দেখে চাঁদের আর তিয়াষ মেটে না। ছাব্বিশ নক্ষত্রসুন্দরীর একজনকেও তিনি আদর করলেন না, ফিরেও দেখলেন না তাঁদের দিকে।

তাঁরা আবার সব বাপের বাড়ি ফিরে এলেন। বললেন—বাবা! আমরা তোমারই সেবা-শুশ্রূষা করে দিন কাটাব। ও বাড়ি আর যাব না। তোমার কথা তার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে—সোমো বসতি নাস্মাসু নাকরোদ্ বচনং তব।[৪১] দক্ষ আবার এলেন জামাই-বাড়ি। বললেন—সব বউকে সমানভাবে দেখ চন্দ্র, নইলে কিন্তু শাপ দেব আমি। চাঁদ-বউরা আবার ফিরে এলেন। কিন্তু শাপের ভয় দেখিয়েও দক্ষ চন্দ্রকে পথে আনতে পারলেন না। চন্দ্র একা রোহিণীকেই ভালবাসেন, তাঁর মনে দ্বিতীয় কোন রমণীর স্থান নেই। ছাব্বিশটি বউ আবার ফিরে এল বাপের বাড়ি। দক্ষ এবার আর ছাড়লেন না। ভয়ংকর ক্রোধে চন্দ্রকে শাপ দিলেন—তোমার যক্ষ্মা হবে।

বয়স্ক লোকেরা স্মরণ করবেন কিনা জানি না, তবে সেকালের নব-বিবাহিত যুবক অতিরিক্ত স্ত্রৈণ হলে অনেকেই ভয় পেতেন যে, ছেলের টি.বি. হবে। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ে টি.বি. হয়—এই ছিল অনেকের ধারণা। ব্যক্তিগতভাবে বোধ হয়—এই ধারণা চন্দ্রের যক্ষ্মারোগের কাহিনী থেকেই এসেছে। যুক্তিদীপিকার সাংখ্য দার্শনিক—চন্দ্রের এই যক্ষ্মারোগের গল্পটা বলেছেন গদ্যে। আরও বলেছেন—চন্দ্র হলেন সোম-রাজা, সেই রাজাকে যক্ষ্মা ধরল বলেই রাজযক্ষ্মার জন্ম—চন্দ্রমা বৈ সোমো রাজা যদ্‌রাজানং যক্ষ্মো গৃহ্নাত্ তদ্রাজযক্ষ্মস্য জন্ম।[৪২] রাজযক্ষ্মার কবলে পড়ে ক'দিনে চন্দ্রের শরীর শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। দক্ষের কথা মেনে ছাব্বিশ নক্ষত্ররানীদের সঙ্গেও তিনি বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ওদিকে চলল নানা যাগ-যজ্ঞ, বৈশ্বদেব চরু দিয়ে অমাবস্যার রাত্রিতে রোগমুক্তির আরাধনা। কিন্তু এত যাগ-যজ্ঞ-আরাধনা করেও চন্দ্র কিন্তু যক্ষ্মা সারাতে পারলেন না—যুক্তিদীপিকার ভাষায়—নৈনং যক্ষ্মা উদমুঞ্চৎ।[৪৩]

চন্দ্রের টি.বি. হওয়ার কাহিনীটা আমি যেখান থেকে বলেছি সেই মহাভারতেও কিন্তু যাগ-যজ্ঞ করে চন্দ্রের কিছু ফল হয়নি। কিন্তু মহাভারতের কবি-ঋষির হৃদয়ে করুণা প্রচুর। তিনি সরস্বতী তীর্থে চন্দ্রকে স্নান করিয়ে মাসের মধ্যে পনেরো দিন তাঁকে সুস্থ রেখেছেন। কিন্তু আর পনেরো দিন তাঁকে ক্ষয়-রোগ ছাড়ে না—মাসার্ধঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি। সেই থেকে অমাবস্যা তিথিতে সরস্বতী তীর্থে অথবা

প্রভাসে ডুব দেন চন্দ্র। আর তার পর দিন থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত তাঁর যক্ষ্মার উপশম হয়, শরীরে শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু পূর্ণিমার পর থেকে আবার যে কে সেই, অর্থাৎ সেই এক কথাই দাঁড়াল। চন্দ্রের যক্ষ্মা পুরোপুরি সারল না—নৈনং যক্ষ্মা উদমুঞ্চৎ।

সাংখ্য-দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিলেন—তাহলে দেখ বাপু! দেবতাদেরও রোগ-জরা আছে—তস্মাদ্ দেবভূমাবপি জরাকৃতং দুঃখমস্তি। আর মরণের কথা যদি বল তাহলে তো গোপথ ব্রাহ্মণের মত প্রাচীন বেদাংশ থেকে উদাহরণ দিয়ে বলতে হবে—দেবতারা নাকি সংখ্যায় আগে ছিলেন পনেরোশ। তারপর নানা পাপ-তাপ করে সব ভাই মরে গিয়ে বেঁচে থাকলেন মোটে তেত্রিশ জন—সোদর্যানাং পঞ্চদশানাং শতানাং ত্রয়স্ত্রিংশদুদশিষ্যন্ত দেবাঃ।[৪৪] আমরা সাংখ্যের তত্ত্ব-যুক্তি অথবা বৈদিক প্রবচনের কথাটা বাদ দিয়ে যদি পুরাণের পরিসরে আসি তবে দেখব—মহর্ষি শৌনকের বারো-বছরের যজ্ঞ-স্থান, অসংখ্য মুনি-ঋষিদের তপোভূমি অমন যে নৈমিষারণ্য, সেইখানে নাকি একদা দেবতাদের শ্মশান ছিল। ধোঁয়া থেকে যদি আগুনের অনুমান সিদ্ধ হয়, তবে এই শ্মশান থেকেই বা কেন দেবতাদের মরদেহের অনুমান সিদ্ধ হবে না?

॥ ৫ ॥

যা দেখা যাচ্ছে, তাতে নিরীশ্বর সাংখ্যের কথাই বলুন আর অদ্বৈতপন্থী বেদান্তের কথাই বলুন—এঁরাই যদি দেবতার শরীর স্বীকার করেন, তো দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এইসব বাদী-প্রতিবাদীরা যে দেবতার শরীরের কথাটা মানবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী? আরও আশ্চর্য কথা কি জানেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের তথাকথিত বিরুদ্ধবাদীরা পর্যন্ত দেবতাদের শরীর মেনে চলেছেন। আজকাল একদল মুখে-জগৎ-মারা পণ্ডিত বেরিয়েছেন, যাঁরা দু-পাতা ইতিহাস পড়ে বৌদ্ধদের একেবারে ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের জাতশত্রুর কক্ষে বসিয়ে দেন এবং এমন সব মত ব্যক্ত করেন, যা শুনলে পরে মনে হয়—তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে। তাঁরা একবারও বোঝেন না অথবা বোঝার মত বিদ্যে-বুদ্ধিও এঁদের নেই যে, বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং দর্শন—দুটোই দুটোর 'ইন্টার‍্যাক্‌শনে' লাভবান হয়েছে। এদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ বৌদ্ধিক স্তরে এমন ক্ষুরধার শাণিত তর্কযুক্তি তৈরি করেছিল, যাতে একসময়ে দার্শনিক জগতে দুর্লভ উন্নতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য এই সমস্ত স্বাস্থ্যকর মত-বিরোধ আজকের অগভীর স্বল্পাধীতী বক্তৃতাজীবীদের জানার কথা নয়। তাঁরা জানেন বৌদ্ধ মানেই ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী এবং ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী হলেই জনমত তৈরি করার পক্ষে এখন বড় উপযুক্ত যন্ত্র। আসলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সম্বন্ধেও এঁদের ভাল ধারণা নেই, আবার বৌদ্ধতন্ত্র সম্বন্ধেও ভাল ধারণা নেই। ফল যা হয়, ভেদ-বমি।

যাই হোক, বৌদ্ধরা একভাবে বেদ-ব্রাহ্মণ্য বিরোধী বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের দেব-সমাজকে তাঁরা মেনেছেন, তাঁদের শরীরও স্বীকার করেছেন। কোন কোন জায়গায় তাঁদের মত এবং কথাবার্তা, যথেষ্ট মৌলিকতা সত্ত্বেও, এত ব্রাহ্মণ্য দর্শন-ঘেঁষা যে আমাদের অবাক লাগে। আমি প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশ থেকে প্রমাণ দিয়ে কথা বলব। অন্যান্য পালি গ্রন্থে শক্ক অর্থাৎ শক্র

ইন্দ্রের উপস্থিতি মাঝে মাঝে আছেই, এমনকি অন্যান্য দেবতা-উপদেবতাও সেখানে বেশ বিরাজ করছেন। তবে বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশ দার্শনিক বই, কাজেই দেবতাদের কথাও সেখানে যা আছে, তা বৌদ্ধ দর্শনের নিজস্ব ধারা বজায় রেখেই।

কথা হচ্ছিল—মারা যাবার সময় কার কোন জায়গায় জ্ঞান রুদ্ধ হয়ে যায়। বসুবন্ধু বললেন—যারা নীচ স্তরের প্রাণী তাদের মন-প্রাণ নিরুদ্ধ হয়ে যায় অধমাঙ্গে, পায়ে। মানুষের নিরুদ্ধ হয় নাভিতে আর দেবতাদের জ্ঞান রুদ্ধ হয় হৃদয়ে অথবা কেউ কেউ বলেন মাথায়।[৩৫] বৌদ্ধ মতে সমস্ত প্রাণীর মতই দেবতাদেরও শরীর আছে মরণও আছে। অন্য প্রাণীদের মরতে ভারী কষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু সুখে হলেও দেবতারও মৃত্যু আছে। মরে আর জন্মান না যাঁরা, তাঁরা হলেন বৌদ্ধ অর্হত্। কিন্তু অর্হতের জ্ঞানও নিরুদ্ধ হয় হৃদয়ে। দেবতা এবং অর্হত্দের বিজ্ঞান-নিরুদ্ধির স্থান একই হওয়ায় দেবতাদের আমরা অর্হত্দের প্রায় সমভূমিতে নিয়ে আসতে পারি।

দেবতাদের মরতে খুব কষ্ট হয় না বটে, তবে তাঁদের শারীরিক ভাবভঙ্গী দেখলে বোঝা যায়—এবার তাঁদের সময় হল। বসুবন্ধু বৌদ্ধ হয়ে দৈব-মরণের যেসব চিহ্ন বর্ণনা করছেন, তা আমাদের সাংখ্যের প্রবচনের সঙ্গেও মেলে, মেলে পুরাণের বর্ণনার সঙ্গেও। বস্তুত একভাবে সেকথা আমরা আগে বলেছি। বসুবন্ধু লিখেছেন—মরার আগে দেবতাদের পাঁচ ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। তাঁদের বস্ত্র আর অলঙ্কারের মাঝখান থেকে মিষ্টি একটা শব্দ বেরোতে থাকে। শরীরের তেজ একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়। স্নান করলে গায়ে জল শুকোয় না (দেখবেন মৃতদেহে জল ছিটালেও এমনই হয়)। শরীরে চপল ভাব থাকলেও বুদ্ধি একদিকে ছাড়া অন্য দিকে কাজ করে না। আর চিরকাল যে শোনা গেছে দেবতাদের চোখের পাতা ওঠা-নামা করে না, মরণকালে নাকি সেই চোখে নিমেষ পড়ে অর্থাত্ চোখের পাতা খোলে এবং বোজে।[৩৬]

এই লক্ষণগুলো নাকি গৌণ—উপনিমিত্তানি। এগুলো কখনও মেলে কখনও বা মেলে না—এতানি তু ব্যভিচারীণি। কিন্তু কতগুলো লক্ষণ আছে, সেগুলো নাকি দেবতাদের মরণের সময় দেখা যাবেই। যেমন—তাঁরা আর গায়ে কাপড় রাখতে পারেন না, মালা শুকিয়ে যায়—বাসাংসি ক্লিশ্যন্তি মালা ম্লায়ন্তি। বসুবন্ধুর কথার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে আসে কবি-ঋষির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা—

> ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
> হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
> মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
> আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন
> হে দেব হে দেবীগণ। বর্ষ লক্ষ শত
> যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
> দেবলোকে।

আচার্য বসুবন্ধুও কিন্তু দেবতাদের মরণটাকে ঠিক মরণের শব্দে চিহ্নিত করেননি। তিনি বলেছেন—চ্যবনধর্মণো দেবপুত্রস্য—অর্থাৎ স্বর্গ থেকে যাদের বিদায় হচ্ছে, চ্যুতি হচ্ছে, সেইসব দেবতাদের এইসব লক্ষণ দেখা যায়—গায়ের কাপড় রাখা দায়, গলার

মালা শুকিয়ে যায়, দুই বগল দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ে, গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোয়, দেবতারা নাকি তখন আর নিজের আসনে বসে থাকতে পারেন না—কক্ষাভ্যাং স্বেদো মুচ্যতে, দৌর্গন্ধ্যং কায়েবক্রামতি, স্বে চাসনে দেবপুত্রো নাভিরমতে।

দেবতার মরণচিহ্নে যা দেখা গেল, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে বৌদ্ধ দার্শনিকরা দেবতাদের শরীর মানেন অবশ্যই। কিন্তু শরীর স্বীকার করে নিলেও অদ্বৈতবেদান্তীরা যেরকম তাঁদের জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যে মানুষের থেকে অনেক উঁচু জায়গায় শিরোধার্য্য করেছেন, অথবা সাংখ্য যেমন তাঁদের সত্ত্ববিশাল উর্ধ্বস্তরের জীব বলে মনে করেছেন, তেমনই বৌদ্ধ দার্শনিকরাও দেবতাদের উর্ধ্বলোকের বাসিন্দা বলেই মনে করেছেন—উর্ধ্বং দেবা বিমানেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ।[৪৭] পৌরাণিকদের মত বসুবন্ধুও দেবতাদের সভা, বাসস্থান, নন্দন-কানন সবই মাপযোক করে বসিয়েছেন। বলেছেন—তবে তাঁরা উর্ধ্বলোকের প্রাণী, তাঁদের হাব-ভাব, কাজকর্ম মানুষের থেকে আলাদা। এই যেমন মানুষের কাম-উপভোগ স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের মাধ্যমে তৃপ্ত হয়, কিন্তু দেবতাদের এই সঙ্গম-সন্তুষ্টি হতে পারে অতি সহজে, সামান্য চার-পাঁচটি ক্রিয়ার মাধ্যমে।

কোন রমণীকে সম্ভোগের ইচ্ছা জন্মালে শরীরে যে কামের উত্তাপ হয়, সেই উত্তাপ দেবতারা প্রশমন করতে পারেন সামান্য বায়ু-নিঃসরণের মাধ্যমে—তেষাং তু বায়ুনির্মোক্ষাদ্ দাহবিগমঃ, শুক্রাভাবাৎ।[৪৮] অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটি আছে আলিঙ্গনে। শুধুমাত্র ঈপ্সিতা রমণীকে আলিঙ্গন করেই দেবতারা মৈথুনের তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। শুধুমাত্র হাত ধরেও এই সম্ভোগ সম্পূর্ণ হতে পারে, অথবা হতে পারে শুধু সপ্রেম দৃষ্টিপাতে অথবা শুধু হাসি দিয়েই—পার্বতীর মুখের পানে ধূর্জটির হাসি। বসুবন্ধু এই সবগুলি উপায়কে একসঙ্গে সমাস করে বলেছেন—দ্বন্দ্বালিঙ্গন-পাণ্যাপ্তি-হসিতেক্ষিত–মৈথুনাঃ।[৪৯]

নানা দার্শনিক গ্রন্থ থেকে দেবতাদের দার্শনিক স্থিতিটুকু দেখালাম এইজন্য যে, কী সাংখ্য-বেদান্ত, কী বৌদ্ধ, সব দর্শনেই দেবতারা উচ্চস্তরের জীব হলেও মানুষের সঙ্গেই তাঁদের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি করে দেখানো হয়েছে। অবশ্য একটা ব্যাপারে আমরা এখনও মূক থেকেই গেলাম, সেটা হল—ঈশ্বরের প্রসঙ্গ। পরম ঈশ্বর, যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কিন্তু সাধারণ দেবতাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। জগতে তৃণ থেক ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেরই জন্ম-মরণ জরা-ব্যাধি স্বীকার করে নিলেও পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা খাটে না। শঙ্করাচার্যের মত অদ্বৈত দার্শনিক অবশ্য ঈশ্বরকে মায়ার উপাধির মধ্যে আটকে রেখেছেন, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত আস্তিক দর্শন এবং দ্বৈতবাদী বেদান্তীরাও সবাই ঈশ্বরকে পরব্রহ্মেরই স্বরূপ বলে স্বীকার করেছেন। বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ এবং শিব—এঁরাও ইতিহাস পুরাণে পরম ঈশ্বরেরই রূপ বা অবতার বলে স্বীকৃত। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য শুধু আকারে, গুণে।

আমি ঈশ্বরের স্বরূপ-বিচারে দার্শনিক তথ্যগুলি আর আলোচনা করব না, শুধু এইটুকুই বলব যে, পরম ঈশ্বর যখন মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন—সে তিনি কৃষ্ণই হোন বা রামচন্দ্র, তিনি শিবই হোন অথবা পরমা প্রকৃতি উমা মহেশ্বরী—তখনই মানুষের ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র আনন্দের পরিসীমার মধ্যেই তাঁদের থাকতে হয়েছে। দার্শনিক দিক থেকে দেখতে গেলে খুব ভাল একটা কথা বলা যায়। মনে রাখতে হবে—পরম

ঈশ্বর যদি মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন এবং তখন যদি তাঁর ঈশ্বরত্বের বোধ টনটনে থাকে, তবে আর মানুষের ঘরের সুখ-দুঃখ-আনন্দ তাঁকে লীলায়িত করবে না। নিজের ঐশ্বর্যবলে যিনি দৃষ্টিপাতমাত্রেই সমস্ত দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে পারেন, যিনি অঙ্গুলী-হেলনমাত্রেই সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে সহজ সুকর করে ফেলতে পারেন, তিনি যদি মনুষ্য অবতারেও সেই ঐশ্বর্য দেখাতে থাকেন, তাঁহলে এই মর্ত্যভূমিতে আসার কোন মানে হয় না তাঁর।

কিন্তু যিনি জগৎ-সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এই অতুল ঐশ্বর্য-প্রভুত্ব তিনি ভুলবেন কী করে ? আর না ভুললে যশোমতীর ঘরে গোপাল হয়ে থাকা, অথবা পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাওয়া, সাগর লংঘন করার জন্য পরিশ্রম করা অথবা শত শত গোপ-কিশোরীদের সঙ্গে নৃত্য-গীতে বাঁশির পঞ্চম লাগানো—এসব কিছুই বৃথা হত। দার্শনিকেরা বলেছেন—মহামায়া যেমন মানুষকে সংসারের চিত্র-বিচিত্র মোহে ভুলিয়ে রাখেন, তেমনই ভগবান বা পরমেশ্বরকে ভোলানোর জন্যও আরও একটি মায়াশক্তি আছেন। তাঁর নাম যোগমায়া। যোগমায়া পরম ঈশ্বরকে তাঁর ভগবত্তা এবং ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অচেতন করে রাখেন। ফলে মানুষের দুঃখ শোক তাঁকে আকুলিত করে এবং মানুষের সুখ-আনন্দ তাঁকে মোহিত করে। এমন নয় যে, যোগমায়ার ক্ষমতাটা পরম ঈশ্বরের চেয়েও বেশি। ভগবান নাকি ইচ্ছে করেই মনুষ্যোচিত রূপ-রস-আনন্দ ভোগ করার জন্য যোগমায়াকে নির্দেশ দেন সাময়িকভাবে—অন্তত অবতার-কাল পর্যন্ত—তাঁর ঈশ্বর-ভাব ভুলিয়ে রাখতে।

কিন্তু যে পর্যন্ত তাঁর ঈশ্বর-ভাব-ভোলা মনুষ্য-লীলা চলে, সেই অন্তর্বর্তী সময় ধরে পরম ঈশ্বর—সে তিনি রামই হোন অথবা কৃষ্ণ—মানুষের রসিকতা, ব্যঙ্গ-টিপ্পনী সবকিছুই ভোগ করেন বা উপভোগ করেন। দীর্ঘদিন বনে বাস করে, দিনের পর দিন চুলে-জল না দিয়ে রামচন্দ্রের মাথায় জটা পাকিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু পিতৃসত্যের মাহাত্ম্য ভুলে রাবণ তাঁকে ভণ্ড তপস্বীই বলবেন, অধিকন্তু কৃত্তিবাসের সুরে তাঁর ধুয়া হবে—মাথাতে পাকালে জটা আঠা মেখে চুলে। অথবা কৃষ্ণের কথাই ধরুন। তিনি যতই বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর ভালবাসার চিঠি পেয়ে তাঁকে গন্ধর্ব-মতে বিবাহ করুন, কিন্তু বাগে পেলে শিশুপাল তাঁকে বলবেনই—ব্যাটা লম্পট ! আমার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হওয়ার পাকা কথা হয়েছিল, সেই বাগদত্তা বউকে বিয়ের পিড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যাটা বিয়ে করেছিস, আবার এখন সেই বিয়ের কথা তুলছিস, তোর লজ্জা করে না—মৎপূর্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্তয়ন্।[২০] শিশুপাল কুরুসভায় সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন—ব্যাটা ! তুই ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, যে এইরকম করে পরের বউ নিয়ে পালায়—অন্যপূর্বাং স্ত্রিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধুসূদন।[২১]

বলতে পারেন—এ মোটেই রসিকতা নয়, এ তো রাগের ঝাল মেটানো। কথাটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এও মানতে হবে রাগের যেমন ঝাল থাকে, তেমনই ভালবাসারও ঝাল থাকে। ঈশ্বর যখন মর্ত্যলীলায় সম্পূর্ণ মনুষ্যায়িত, তখন তাঁর ভালবাসার লোকেরাই তাঁকে লঘু করে দেন। রামচন্দ্র সীতার কাছে ভালবাসার গালাগালি খান, কৃষ্ণ লাম্পট্যের কলঙ্ক লাভ করেন স্বয়ং প্রিয়তমা রাধার কাছে। আর প্রিয়তমা যদি মুখ খুলে গালাগালি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, বিদগ্ধ কৃষ্ণ তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজের জবানীতে বলেন—'কোটি বেদস্তুতি হৈতে হরে মোর মন।'[২২] পরবর্তী

সময়ে ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে যত রঙ্গ-রসিকতা হয়েছে, তার মূলে আছে ভালবাসার ঝাল। শিবভক্ত, রামভক্ত, কৃষ্ণভক্ত—সকলেই তাঁদের ইষ্টদেবতার সঙ্গে যে ঠাট্টা-তমাশা করেছেন, তা এই ভালবাসার ঝোঁকেই। একটু বুঝিয়ে বলি।

আমরা প্রথমে নির্মল রসিকতার জন্য একটা উদাহরণ, আবার নির্মম রসিকতার জন্যও একটা উদাহরণ বেছে নেব। দেবতার জীবনে কতগুলি 'কনভেনশনাল' ঘটনা—যা নাকি সাধারণ লোকেও জানে—সেইগুলি আগে মাথায় রাখতে হবে। যেমন ধরুন, শিব কৈলাস-পাহাড়ে থাকেন; বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান। লক্ষ্মী পদ্মালয়া অর্থাৎ পদ্মবনেই তাঁর বাস, তিনি পদ্মাসনা ইত্যাদি। এবারে কবি রসিকতা করে সেটাকে কীভাবে দেখছেন দেখুন।

কবির ধারণা—লোকে দেবতার কাছে এটা-ওটা নানা জিনিস চায়। কেউ জীবনে বড় হতে চায়, কেউ টাকা-পয়সা চায়, কেউ মান চায়, কেউ রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়, কেউ বা শুধুই মুক্তি। মোট কথা—দেবতার কাছে মানুষের প্রতিনিয়ত চাওয়ার কোন শেষ নেই। বিশেষ করে এই কলিযুগে যেন চাওয়াটাই খুব বেড়ে গেছে। কবি মনে করেন—লক্ষ লক্ষ মানুষের এই চাই-চাই স্বভাব দেখেই শিব পালিয়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন কৈলাসে এবং বিষ্ণু অনন্তশয্যায় ঘাপটি মেরে পড়ে আছেন—রুদ্রোঽদ্রিং জলধিং হরিঃ। অন্যান্য সাধারণ দেবতারাও মানুষের চাওয়ার ভয়ে অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে বসে আছেন। ওদিকে ধনদাত্রী লক্ষ্মীর কাছে তো প্রতি বৃহস্পতিবার যে পরিমাণ—এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী—করা হয়, তাতেই তিনি লুকিয়েছেন গিয়ে পদ্মবনে—লীনা পদ্মবনে সরোজনিলয়া মন্যেঽর্থিসার্থাদ্ ভিয়া।[৩৩]

এই কবিতায় যা আছে, তা অনেকটাই জনমনে পূর্বাহ্নে চিহ্নিত দেবতাদের বাসস্থান নিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা। কিন্তু রসিকতা যখন নির্মলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে নির্মম রসোদ্গার নির্লজ্জতার কোটিতে গিয়ে পড়ে, তার মধ্যেও কিন্তু চমৎকারিত্ব সৃষ্টির বাসনাটাই কবির থেকে যায়, অথচ চমৎকারিত্ব সৃষ্টির নামে যা বেরিয়ে আসে, তাকে রসিকতা না বলে বদ রসিকতা বলাই ভাল। বদ রসিকতা আছে কিম্বা থাকবে—সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। বড় কথা হল—যে দেবতা সম্বন্ধে অসীম ভক্তি আছে জনমনে, সেই ভক্তি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে দুটো খারাপ কথা বলতে মানুষের দ্বিধা নেই।

বস্তুত ধর্মচর্চা এবং মোক্ষমসাধনের সঙ্গেও বিপ্রতীপভাবে মানুষের কামনা বা রঙ্গরসিকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ভগবানের নামের সঙ্গেও শ্লেষাত্মক ধ্বনিতে কামনা প্রকাশ করতেও মানুষের বাধেনি। যেমন ধরুন শিবের নাম। মনে রাখতে হবে—শিবের কতগুলি নাম আছে। তার মধ্যে কতগুলি পাঠকের জানা। যথা শিব মস্তকে গঙ্গাপ্রবাহ ধারণ করেছিলেন বলে তিনি গঙ্গাধর। আবার মাথায় এক ফালি চাঁদ আছে বলে তিনি চন্দ্রচূড় (তুলনীয় মাইকেল : চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী)। পুনশ্চ ধর্মচর্যা বা যোগসিদ্ধির কারণে তিনি নগ্ন দিগম্বর এবং অসুর-বিনাশের ক্ষেত্রে বা তপস্যার ক্ষেত্রে তিনি উগ্র। এই মাত্র চারটে পাঁচটা শিবের নাম নিয়ে কবি এবার কী খেলা খেলেছেন দেখুন। এক কাম-পিপাসু পুরুষের জবানীতে কবি এক রমণীর উদ্দেশ্যে বলছেন—তোমার স্তনদ্বয় একেবারে উগ্ররূপ—ইংরেজিতে পণ্ডিতেরা এর অনুবাদ করেছেন—hard of form like Shiva.

এই স্তনদ্বয়ের ওপরে গঙ্গার ধারার মত নেমে এসেছে সোনার হার—উগ্ররূপং কুচদ্বন্দ্বং হারগঙ্গাধরং তব। কবিপুরুষ এবার বলেছেন—তোমার ওই উগ্ররূপ স্তনদ্বয়ের ওপর চন্দ্রচূড় এঁকে দেব আমি (কামশাস্ত্র-মতে এক রকমের নখচ্ছেদ, যাতে প্রতিপদের চাঁদের আকারে পুরুষ-নখের দাগ পড়ে রমণীর বুকে)—তুমি শুধু অঙ্গের বসন মুক্ত করে দিগম্বর হও—চন্দ্রচূড়ং করিষ্যামি কুরু তাবৎ দিগম্বরম্।৫৪

এই শ্লোকোক্তির মধ্যে উগ্র-গঙ্গাধর আর চন্দ্রচূড়-দিগম্বরের শব্দশ্লেষে ভীত হবেন না যেন। শিবের নাম-মাহাত্ম্যেই যেহেতু পাপ স্খালন হতে পারে, অতএব পাপ করতে কবির দ্বিধা নেই। শিবের মত একজন সাধা-সিধে সরল দেবতার নাম নিয়ে যেখানে দেবতার নামের মাহাত্ম্য বলেই পাপবৃদ্ধি ঘটে, তখন ভগবান শ্রীহরি সম্বন্ধে একটা উদাহরণ না দিয়ে পারি না। এই শ্লোকের মধ্যেও স্বল্পতম চমৎকারিত্ব নেই, তা নয়। তবে সে চমৎকারিত্বও এসেছে নির্ভেজাল শৃঙ্গার-বিকারের মাধ্যমে। কবির নির্লজ্জ বর্ণনায় যৌবনগর্বিতা কৃষ্ণ-মোহিনী রাধা একবার কৃষ্ণকে বলছেন—কৃষ্ণ, তোমার বড় সৌভাগ্য। ভাগ্য আছে বলেই লোকে এত তোমার নাম করে। এই যে তুমি, কবে না একটা ছোট্ট পাহাড় হাতে তুলেছিলে, তাতেই লোকে তোমায় 'গোবর্ধনধারী' বলে ডাকে। আর আমি যে তিন ভুবনের ধারক-বাহক তোমার মত মানুষকেও এই স্তনের আগায় ধরে রাখি, তবু লোকে আমার কথা খেয়ালও করে না—ত্বাং ত্রৈলোক্যধরং বহামি কুচয়োরগ্রে ন তদ্ গণ্যতে।৫৫

॥ ৬ ॥

রঙ্গ-রসিকতার আগেই যে কথাটা অবশ্য বলে নেওয়া ভাল, সেটা হল—দেব-জীবনের কোন্ কোন্ অংশ নিয়ে আপনার পক্ষে আলোচনা সম্ভব—সেটা পূর্বাহ্নেই জেনে নেওয়া। আপনি কাব্য-নাটক লিখতে চান, কবিতা লিখতে চান, তো সেখানে কাব্য-নাটকের মধ্যে দেবতার প্রতি মানুষের ভক্তি—সে তো আপনি দেখাতেই পারেন। কিংবা কোন দেবতা যুদ্ধে অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে যুদ্ধ-জয় করছেন—সেটা নথিবদ্ধ করাও কোন অন্যায় নয়। কিন্তু ধরুন, দেবতারা রমণে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, কিম্বা মানুষোচিত চুম্বনালিঙ্গনে একেবারে শারীরিক প্রক্রিয়ায় মেতে উঠেছেন—এটা কাব্য-নাটকে লিখবেন কিনা—সেই নিয়ে আমাদের রস-শাস্ত্রে গভীর তর্ক আছে।

কথাটা আমি তুললাম এইজন্য যে, একজন, দেবতার বিষয়ে কবিদের রঙ-তামাশা দেখাতে গেলে, তার কতগুলো 'প্রি-কন্ডিশন' থাকে। পরিশ্রম বাঁচানোর জন্য রাঁধুনী যেমন গরম চায়ের কেত্‌লি উনুন থেকে নামানোর সময় আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে দেখে নেন কতটা সহনীয়, তেমনই রঙ্গ-কৌতুকের আগে দেব-চরিত্রের অন্যান্য স্পর্শকাতর দিকগুলি কবিরা কতটুকু তাঁদের লেখনী স্পর্শ করে পরীক্ষা করে নিয়েছেন—সেটা দেখিয়ে নিলে আমাদের সুবিধে হয়। পুরাণ তথা আমাদের মহাকাব্য দুটির মধ্যে যেহেতু দেব-চরিত্রের বিভিন্ন ভাবগুলি অঙ্কিত হয়েছে এবং তার মধ্যে দেবতাদের রতি-চিত্রও যেহেতু বহুলাংশেই স্পষ্ট, অতএব কবিরাও সেই—রতি-রস যথেচ্ছ পরিবেশন করবেন—এটা কিন্তু যুক্তি নয়। কারণ পুরাণ ইতিহাস আমাদের

দেশে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। দেবতাদের কুকীর্তিকলাপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে এখানে অবহিত হতে হয়—ওঁরা দেবতা। দেবতারা যা পারেন বা যা করেন, তা মানুষের আচরণীয় নয়, করণীয়ও নয়।

কিন্তু এতসব মানসিক বাধা এবং ধর্মচেতনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কবিরা কিন্তু থেমে থাকতে পারলেন না। দেব-জীবনের নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা এবং শৃঙ্গার-কৌতুক তাঁদের লেখনীকে তাড়িত করল। তাঁরা লিখতে আরম্ভ করলেন। লিখতে আরম্ভ করলেন পাকা সেই রাঁধুনীর কায়দায়—অতি উষ্ণ রতি-রস একটু একটু করে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে, পাঠককে সইয়ে সইয়ে। কিন্তু এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে কতটা লেখা উচিত এবং কতটা লেখা উচিত নয়—এসব নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তর্ক আরম্ভ হয়ে গেল সমালোচক আলংকারিকদের মধ্যে। এক্ষেত্রে উদাহরণ এবং আলোচনার বিষয় হিসেবে প্রায় সব সময় বেছে নেওয়া হয় মহাকবি কালিদাসের লেখা কুমারসম্ভবের পরবর্তী অংশ। কালিদাস কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে পার্বতীর অতি অপরূপ রূপ বর্ণনা করে পাঠকের মনে অসামান্য চমৎকার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দেবী পার্বতীর স্তন-জঘনের নিপুণ বর্ণনা সেখানে দিব্য মাহাত্ম্য নিয়ে পাঠকের মনে ধরা দিয়েছে। কালিদাস এইভাবে পাঠককে একটু সইয়ে নিলেন।

তারপর কুমারের তৃতীয় সর্গে অকাল বসন্তের সঙ্গে কামনার দেবতার আবির্ভাব ঘটল। নিতম্ব থেকে বার বার স্রস্ত বকুলের মালাখানি ঠিক জায়গায় নিবেশ করার জন্য কালিদাস পার্বতীর যে প্রত্যঙ্গ-সংস্থান বেছে নিয়েছেন, সইয়ে নেওয়ার ব্যাপার সেখানে আছে। মদন ভস্ম হল, কিন্তু নিখিল বিশ্ব যখন রতিবিলাপ-সঙ্গীতে মুগ্ধ হল, সেখানেও করুণ-রসের ছদ্মবেশে শৃঙ্গারের ভাষা সইয়ে নিয়েছেন কালিদাস। পার্বতীর তপস্যায় কাম প্রেমে পরিণত হল, ফুল ফলের পরিণতি লাভ করল। শিব-পার্বতীর বিয়ে হল। ভাষার ব্যঞ্জনায় অসামান্য কবি শুধু কুমার কার্তিকের সম্ভাবনা করে রাখলেন শব্দের অভিধা অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার মতই।

সমালোচকেরা বললেন—কুমারসম্ভব কুমারের সম্ভাবনাতেই শেষ হয়ে গেছে। যে কবি এই কাব্যের অষ্টম সর্গে শিব-পার্বতীর সম্ভোগ বর্ণনা করেছেন, তিনি কালিদাস নন, অন্য কোন অধম কবি। টীকাকারেরা, মল্লিনাথ থেকে আরম্ভ করে আরও অনেকে লজ্জায় চোখ মুদলেন—ছ্যা ছ্যা, জগজ্জননী পার্বতী আর জগৎপিতা মহাদেবের সম্ভোগ-লীলা কি কোন ভদ্র কবি এমন করে বর্ণনা করেন ? তাঁরা আর সপ্তম সর্গের পর কুমারসম্ভবের টীকাই লিখলেন না। ভাবখানা এই—খোকা যখন মাকে ডেকে নিজের পূর্বাবাসের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে—এলেম আমি কোথা থেকে—তখন ভারতবর্ষের মা-বাবা প্রত্যেকে লজ্জায় স্নেহ মাখিয়ে বলেন—তুই আমার ঠাকুরের সনে/ছিলি পূজার সিংহাসনে—অথবা আমার তোমার, সবার বাবা-মা হলেন সেই শিব আর পার্বতী—মাতা তে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। এই অবস্থায় কালিদাসের মত সত্তম কবির পক্ষে কি সম্ভোগ-সর্বস্ব অষ্টম সর্গ লেখা সম্ভব ?

সুরে সুর মেলালেন কাশ্মীরবাসী মহান আলংকারিক মম্মটাচার্য কাব্যপ্রকাশের সপ্তম উল্লাসে কাব্যের দোষ দেখাতে গিয়ে তিনি লিখলেন—খবরদার ! খবরদার ! কবিরা সব সাবধান। মানুষের রতি-চিত্রে সম্ভোগ-শৃঙ্গার এমন কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু সেই রতি-চিত্র যেন উত্তম দেবতার বিষয়ে একদম ফেঁদে বোস না। সেই বর্ণনা কেমন

হবে জান ? পিতা-মাতার সম্ভোগ বা রতিকেলির বর্ণনা যেমন অনুচিত এবং অসত্য, ঠিক সেই রকমই অনুচিত পিতৃ-মাতৃ-কল্প উত্তম-দেবতার রতি-বর্ণনা—কিংতু রতিঃ সম্ভোগ-শৃঙ্গাররূপা উত্তম-দেবতাবিষয়া ন বর্ণনীয়া। তদ্‌বর্ণনং হি পিত্রোঃ সম্ভোগবর্ণনমিব অত্যন্তমনুচিতম্ । [৫৬]

আলংকারিকের এই ফতোয়ার ওপরেও কিন্তু কথা বলার লোক আছেন এবং তিনি এমনই লোক যাঁকে সমস্ত আলংকারিকেরা এক বাক্যে মাথার ওপরে স্থান দেন। তিনি ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন। মম্মটের সঙ্গে তাঁর মত মেলেনি, বরঞ্চ বলা উচিত আনন্দবর্ধনের অনেক মত মেনেও মম্মটই তাঁর মত মানতে পারেননি। বস্তুত আনন্দবর্ধন দেবতার সম্ভোগ-বর্ণনামাত্রেই তাকে অনুচিত বলতে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য—দৃশ্য কাব্যই হোক, আর শ্রব্য কাব্যই হোক মহান রাজা অথবা দেবতাদের সম্ভোগবর্ণনা পিতা-মাতার রতিবর্ণনার মত অসভ্য ব্যাপারই বটে—সুতরামসভ্যম্। অপিচ মহাকবিরাও এ ব্যাপারে নিজেদের তত সংযত রাখতে পারেন না এবং এই অসংযম দোষের নিশ্চয়ই—মহাকবীনামপি অসমীক্ষ্যকারিতা লক্ষ্যে দৃশ্যতে। স দোষ এব।

এইরকম একটা সাধারণ মত প্রকাশ করেই আনন্দবর্ধন বলেছেন—তবে কিনা কবির শক্তি বা প্রতিভার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। মহাকাব্য রচনা করার মত অসাধারণী শক্তি যদি থাকে, তবে অনেক কিছুই তাঁর মানায়। আনন্দবর্ধনের মতে কাব্যের দোষ দু-রকম। অব্যুৎপত্তিকৃত দোষ এবং অশক্তিকৃত দোষ। শক্তি হল প্রতিভা, নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা—যাতে বর্ণনীয় কাব্য-মহাকাব্যের মধ্যে নূতনত্বের চমৎকার পাঠককে মুগ্ধ করে। আর ব্যুৎপত্তি হল ছন্দ, অলংকার এবং বর্ণনীয় বিষয়ের পৌর্বাপর্য ঠিক রেখে জিনিসটাকে ঠিক-ঠাক্ দাঁড় করানো। কবি-সাহিত্যিক যদি সত্যিই প্রতিভাবান হন তবে তাঁর ব্যুৎপত্তিহীনতা প্রতিভার উচ্ছ্বাসে ঢেকে দিতে পারেন। কিন্তু কবির যদি প্রতিভা না থাকে তবে সে দোষ তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যুৎপত্তিহহীনতাও সবার আগে চোখে পড়বে—যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য স ঝটিত্যবভাসতে। [৫৭]

এতগুলো কথা বলে আনন্দবর্ধন এবার কালিদাসের প্রসঙ্গে আসছেন। তিনি বললেন—দেখ বাপু ! উত্তম এবং পরিচিত দেবতার সম্ভোগবর্ণনার মধ্যে হয়তো একটা অনৌচিত্য আছে ঠিকই, কিন্তু মহাকবি যখন সেই সম্ভোগবর্ণনা করেন তখন তাঁর প্রতিভার আলোকচ্ছটায় অনৌচিত্য বা গ্রাম্যতা একেবারে ধুয়ে মুছে যায়—শক্তিতিরস্কৃতত্বাৎ গ্রাম্যত্বেন ন প্রতিভাসতে। উদাহরণ ? কোন্ কবির এত প্রতিভা ? উদাহরণ দিন একটা। আনন্দবর্ধন বললেন—যথা কুমারসম্ভবে দেবীসম্ভোগবর্ণনম্। [৫৮]

দেখুন, অলংকার এবং রসশাস্ত্রের জগতে যে নামের ওপরে কোন নাম নেই, সেই আনন্দবর্ধন যখন অষ্টম সর্গের 'পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্' সম্ভোগটাকে মেনে নিলেন, তখন আমরাও সুর চড়িয়ে বলি—এটা কিছুই অপূর্ব নয়, ঘটনা সামান্য খুবই। চরম মানবায়নের পথে আমরা জগজ্জননী পার্বতীর শৃঙ্গার-চেষ্টা যেমন অন্যায় মনে করিনি, তেমনই জগৎপিতা শিবের অহর্নিশ উদ্দাম রতিবিলাসও আমাদের কল্পনার বাইরে নয়। বস্তুত কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গ থেকে সপ্তম সর্গ থেকে একটি সুন্দরী রমণীর

মোহন রূপে ভুলে যে যোগী পুরুষটি ধৈর্য হারিয়েছিলেন—হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্যঃ—তাঁর নেত্র-বহ্নিতে কাম-স্বরূপ যতই দগ্ধ হোক, তবু তাঁর মধ্যে সব ব্যবহারই ছিল মানুষের। এই একান্ত মানবায়নের পথ ধরে সেই যোগী মহাত্মার যদি বিয়ে-থা হয়েই থাকে, তবে সেখানে সম্ভোগ-তুষ্টিও থাকবে। এর মধ্যে অকালিদাসোচিত কী থাকতে পারে—তা অন্তত আমাদের বুদ্ধিতে আসে না।

প্রথম থেকে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত যে শিব-পার্বতীর মধ্যে আমরা পিতা-মাতার খোঁজ করলাম না, হঠাৎ অষ্টম সর্গে সম্ভোগ-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিব-পার্বতীর মধ্যে পিতা-মাতার সাযুজ্য খুঁজে পেলাম—এটাই আমার কাছে এক অভিনব রসের কথা। তাছাড়া কবিরা না হয় খুব দুষ্টু। তাঁদের প্রতিভা আছে বলে তাঁরা না হয় হর-পার্বতীর শৃঙ্গার-বর্ণনা দিয়ে পাঠকের মনে চমৎকার সৃষ্টি করলেন। কিন্তু পুরাণ? পুরাণগুলির মর্যাদা তো ধর্মশাস্ত্রের। তাঁরা কেন দেবতাদের নামিয়ে আনলেন মানুষের শৃঙ্গার-ভূমিতে?

তপস্যাতপ্ত উমার সঙ্গে শিবের মিলনের মধ্য দিয়ে কুমার কার্তিকের সম্ভাবনা করে দিয়ে কালিদাস না হয় আর কুমারসম্ভব লেখেননি। কিন্তু প্রথম সর্গ থেকে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত উমার পয়োধর আর নিতম্বদেশের বর্ণনায় পার্বতীর প্রতি কালিদাসের যেমন খুব মাতৃভাব ফুটে ওঠেনি, তেমনই পুরাণকারেরাও শিব-পার্বতীর শৃঙ্গার বর্ণনায় খুব বেশি সংযম দেখাননি। রাধাকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তো এই বর্ণনা প্রাবাদিক স্তরে পৌঁছেছে। এই বিশাল বিশাল দেব-দেবী তথা জগদীশ্বর-পরমেশ্বরদের শৃঙ্গার-কুতূহল, এবং অন্যান্য মানবিক গুণাগুণের কথা বলে পুরাণকারেরা যে পথ দেখিয়ে অন্য পরবর্তী কবিরা সেই পথেই চলেছেন।

আমি বরঞ্চ বলব—অতি পরিচিত এবং প্রিয়তম দেব-দেবীর প্রত্যঙ্গ-সংস্থান বর্ণনা করে পৌরাণিকেরা তথা কবিরা দেব-দেবীকে আমাদের আরও কাছে এনে দিয়েছেন। এই কাছে আনার ফলেই আমরা তথাকথিত স্বর্গের দেব-দেবীদের কখনও মনুষ্যোচিত ব্যবহারের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিনি। পৌরাণিকেরা যা করেছেন, পরবর্তী সংস্কৃত কবিরা তার থেকে আরও এক কাঠি এগিয়েছেন। তারপর দেব-দেবীরা যখন নেমে এলেন আঞ্চলিক ভাষার কবিদের মুখে, তখন দেব-দেবীদের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য আর কিছুই রইল না। মহা-মহা দেব-দেবীরা তখন শুধু মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-সুখের বেড়া-জালের মধ্যেই ধরা পড়লেন না, মানুষের ঈর্ষা, কলহ, নোংরামি, অসভ্যতা, নেশা—সবই ঢুকে গেল দেব-দেবীর ব্যবহারে। তাঁরা খিস্তি-খেউড়ের বিষয়-বস্তু হয়ে পড়েছেন।

এই দৃষ্টিতে কংস-বধের কারণে মথুরা যাওয়ার জন্য কৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাননি। পুরাণের কবি যেখানে মথুরা-গত কৃষ্ণের জন্য রাধার মাথুর-বিরহের ইঙ্গিত দিয়েছেন, বৈষ্ণব পদকর্তাদের লেখনীতে তা কোমল-করুণ কান্ত পদাবলীর ছন্দে ধরা পড়ল বটে, কিন্তু পুরাণ-জানা কবিওয়ালা বা টপ্পা-গাইয়েদের হাতে পড়ে সেই মাথুর-বিরহের মর্যাদা কী হল, তার নমুনা রূপচাঁদ পক্ষীর জবানীতে—

আমারে ফ্রড় করে কালিয়া ড্যাম্ তুই কোথায় গেলি।
আই অ্যাম ফর ইউ ভেরি সরি গোল্ডেন বডি হল কালি॥
হো মাই ডিয়ার, ডিয়ারেষ্ট, মধুপুরে তুই গেলি কৃষ্ট।

ও মাই ডিয়ার হাউ টু রেষ্ট, হিয়র ডিয়র বনমালী
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি ৷)
পুওর কিরিচির মিল্ক-গেরেল, তাদের ব্রেষ্টে মারলি শেল,
ননসেন্স তোর নেই আক্কেল, ব্রিচ অব কন্ট্রাক্ট করলি । [৫৯]

ইত্যাদি। একদিকে কৃষ্ণের এই অবস্থা, অন্যদিকে রূপচাঁদের মুখে শিবের অবস্থাও বড় মধুর নয়, মর্যাদাকর তো নয়ই। আগমনী গানকে কতটা মানবায়িত করলে বলা যায়—

গো মেনকা শোন তোর অম্বিকার দুর্গতি ।
গাঁজা টেনে শ্মশানে যায় পশুপতি ॥
মাঠে ঘাটে বেড়ায় ছুটে কার্তিক-গণেশ দুই নাতি ॥
শৈশব হতে যদি শেখাতে দুটিরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাস করে,
অনায়াসে দুটিতে বিদ্যাবুদ্ধির জোরে হত হাইকোর্টের বিচারপতি ॥
যত হট্টের সঙ্গে শিখেছে হট্টতা, কিরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা,
অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা, কলাবৃক্ষ যার সঙ্গতি ॥
(দেখ) সংসর্গদোষেতে তোর দশভুজা, চণ্ডালের গৃহেতে লয় অগ্রে পূজা,
ভোলা মহেশ্বর দিন-রাত টানে গাঁজা, সঙ্গে সব আবাগের সন্ততি ॥
কহে দীন দ্বিকর জুড়ে ইঁদুরে, ময়ূরে দুটি শিশু চড়ে,
মাতঙ্গীর সিংহ, বুড়োর বুড়ো এঁড়ে, কে দিবে গো ঘোড়া হাতী ॥ [৬০]

ঠিক এই জায়গাটা থেকেই আমরা উল্টো দিকে যাত্রা করব। সংস্কৃতের পুরাণগুলিও নয়, বড় বড় কাব্য-মহাকাব্যও নয়, দেখব—কতশত সংস্কৃত কবি শুধু পৌরাণিকের সূত্র ধরে দেব-দেবীদের নিয়ে রঙ্গ-রসিকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন—যার পরম্পরাক্রমে কোথাও তৈরি হয়েছে কবিওয়ালা-টপ্পাওয়ালাদের গান আর কোথাও বা বাংলা প্রবাদ—কলির কেষ্ট, গোবর গণেশ, কেলে কার্তিক অথবা বোম্ ভোলা।

সূত্র

১ 'বিষ্ণুপুরাণম্', ৩. ১৭. ১৭
২ তদেব, ৩. ১৭. ১৮
৩ তদেব, ১. ৫. ২৮-৩১
৪ তদেব, ১. ৫. ৪০
৫ 'শতপথ ব্রাহ্মণ', ১. ২. ৫. ১
৬ তদেব, ১. ২. ৫. ৩
৭ তদেব, ১. ২. ৫. ৪
৮ 'মহাভারতম্', ১. ১৪. ৪৮
৯ তদেব, ১. ১৪. ৪৬
১০ 'ঋগ্-বেদসংহিতা', ১০. ১১৪. ৫ ; ১০. ১১৪. ৪ নং ঋকটিও প্রণিধানযোগ্য।
১১ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২. ৪২
১২ 'ঋগ্বেদসংহিতা', ৬. ৪৭. ৮

১৩ তদেব, ২. ১৮. ৪
১৪ জৈমিনি-প্রণীত 'মীমাংসা-দর্শন' ৯. ১. ৬ সূত্রের ওপর শবরস্বামীর টীকা, পৃ. ৭৩
১৫ তদেব, পৃ. ৭৩
১৬ তদেব, পৃ. ৭২
১৭ 'মীমাংসা-দর্শন', পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১
১৮ তদেব, পৃ. ৩২৪
১৯ 'মীমাংসা-দর্শন', সূত্র ৯. ১. ৯
২০ 'বেদান্ত-দর্শনম্', ১. ৩. ৩৩ সূত্রের ওপর শঙ্কর-ভাষ্য, পৃ. ৪৬০
২১ তদেব,, শঙ্করভাষ্য, পৃ. ৪৬৫
২২ তদেব, ১. ৩. ৩০ সূত্রের ওপর শঙ্করভাষ্য, পৃ. ৪৪৭
২৩ 'মহাভারতম্', ৫. ১১. ৫-৭
২৪ তদেব, ৫. ১১. ১০
২৫ 'বেদান্ত-দর্শন', ১. ৩. ৩০ সূত্রে শঙ্কর কর্তৃক উদ্ধৃত পুরাণ-বচন।
২৬ বিগ্রহো হবিষাং ভোগ ঐশ্বর্য্যং চ প্রসন্নতা।
ফল-প্রদানমিত্যেতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্ ॥
দেবতাদের এই পাঁচ রকমের শরীর অথবা বিগ্রহ্ পঞ্চক।
২৭ 'বেদান্ত-দর্শন, ১. ৩. ৩৩ সূত্রের ওপর শঙ্কর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
২৮ 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্', ৫. ২. ৩ অংশে শঙ্কর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
২৯ তদেব, ৫. ২. ৩ শঙ্কর-ভাষ্য
৩০ 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্', পৃ. ১৫৬. ১৩৬
৩১ 'যুক্তিদীপিকা', ৫৩ নং সাংখ্য-কারিকা।
৩২ 'যুক্তিদীপিকা', ৫৫ নং সাংখ্য-কারিকা।
৩৩ তদেব।
৩৪ তদেব।
৩৫ 'বায়ু-পুরাণম্', ৭. ২৩
৩৬ 'যুক্তিদীপিকা', ৫৫ নং সাংখ্য-কারিকা।
৩৭ তদেব, ৫৫ নং সাংখ্য-কারিকা।
৩৮ তদেব, ৫৫ নং সাংখ্য-কারিকা।
৩৯ 'মৎস্য-পুরাণম্', ২৩. ১০
৪০ 'মহাভারতম্' ৯. ৩৫. ৪৭
৪১ তদেব, ৯. ৩৫. ৫২
৪২ 'যুক্তিদীপিকা' ৫৫ নং সাংখ্যকারিকা।
৪৩ যুক্তিদীপিকার এই স্থলে যে পাঠ আছে তা নির্ভুল নয়। নির্ভরযোগ্য অন্য একটি সংস্করণে আমি যা লিখেছি, সেই পাঠ দেখেছি। সময়াভাবে সেই সংস্করণের সম্পাদকের নাম দিতে পারলাম না।
৪৪ গোপথ ব্রাহ্মণের এই পংক্তিটি যুক্তিদীপিকাতেই ধরা আছে। পৃ. ১৬৮
৪৫ "তেষামপি হৃদয়ে বিজ্ঞানং নিরুধ্যতে। মূর্দ্ধীত্যপরে।"
বসুবন্ধু-বিরচিত অভিধর্মকোশম্, পৃ. ৫০৩-৫০৪
৪৬ বসুবন্ধু, 'অভিধর্মকোশম্' পৃ. ৫০৫
৪৭ তদেব, পৃ. ৫২৪
৪৮ তদেব, পৃ. ৫২৫
৪৯ তদেব, পৃ. ৫২৫
৫০ 'মহাভারতম্', ২. ৪৫. ১৮
৫১ তদেব, ২. ৪৫. ১৯
৫২ 'চৈতন্য-চরিতামৃত', ১. ৪. ২৬
৫৩ 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্', পৃ. ৭১
৫৪ তদেব, পৃ. ৩১৮
৫৫ L. Stumbuck, 'মহাসুভাষিতরত্নকোষ', Vol. IV. Sl. 7247
৫৬ মম্মটচার্য বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ', পৃ. ৪৪৩
৫৭ আনন্দবর্ধনকৃত 'ধ্বন্যালোক', পৃ. ৩৪৬

৫৮ তদেব, পৃ. ৩৪৬
৫৯ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সহিত্যের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৭-এ উদ্ধৃত।
৬০ তদেব, পৃ. ৩৩১-এ উদ্ধৃত।

পঞ্চম অধ্যায়

দেবতাদের সম্বন্ধে কবিদের রসিকতা ও কৌতুক

॥ ১ ॥

সত্যি কথা বলতে কি, কবিরা একেবারেই চাননি যে, তাঁদের দেবতারা আকাশের ইন্দ্রধনুর রঙ মেখে দেবত্বের দূরত্ব নিয়ে থাকুন। এমনকি যে সব দেবতাদের বেশ-বাস, ধরন-ধারন আলাদা, অর্থাৎ মানুষের থেকে আলাদা, তাঁদেরকে আমাদের কবিরা ঠারেঠোরে রীতিমত সতর্ক করে দিয়েছেন। প্রাচীন কালের এক বিশিষ্ট কবি মজা করে শিবকে বলেছেন—

দেখ শিব ! শুধুই মানুষের থেকে আলাদা দেখানোর জন্য তোমার যে এই বিলক্ষণ ঐশ্বরিক ভাবভঙ্গি— এগুলি তোমার জীবন থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা কর। কবি বলছেন— এই যে তুমি সারা গায়ে ভস্ম মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তাতে কি লোকের চন্দন মাখার সখ চলে গেছে, নাকি সবাই চন্দন ছেড়ে ভস্ম মাখতে আরম্ভ করেছে ? তুমি বাঘ-ছাল পর বলে ভদ্রলোকেরা কি সবাই দামী রেশমী কাপড় আর তেমন ভাল চোখে দেখছে না, নাকি সবাই তোমার দেখাদেখি বাঘছাল পরছে— কং ক্ষৌমং কলয়াঞ্চকার ন কৃতী কৃত্তিং বসানে ত্বয়ি ? তুমি শিব, ধুতরো ফুলের গন্ধ তোমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু মানুষ কি তাই বলে কেতকী ফুলের সুবাস নেওয়া বন্ধ করেছে, নাকি সবাই কেতকী ফুল বিদায় দিয়ে ধুতরো ফুল মাথায় নিয়ে নাচছে ? দেখ, কেউ কোনটাই নেয়নি, তোমার ভস্ম, বাঘছাল, ধুতরো— কোনটাই নয়। তাই বলি কি প্রভু ! শুধুমাত্র জনসমাজে বিলক্ষণ আলাদা দেখানোর জন্য তোমার যে ওই ঐশ্বরিক গুণগুলি, বিলক্ষণ ভস্ম, বাঘছাল, ধুতরো— এগুলি বাদ দাও, লোকে এমনিই তোমাকে মাথায় করে রাখবে— স্বাতন্ত্র্যাদ্ জহিহি ত্বমীশ্বরগুণান্ লোকো'স্তি তদ্‌বাহকঃ।

মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক বিশ্লেষণে এই শ্লোকটিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। ওপরে দেওয়া শ্লোকটি নিশ্চয়ই কোন শিবভক্ত কবির লেখা। তিনি যদি কৃষ্ণভক্ত হতেন, তাহলে অবশ্যই কৃষ্ণকে উপদেশ দিতেন তাঁর মাথার ময়ূরপুচ্ছগুলি একটি একটি করে খসিয়ে ফেলে দিতে এবং এই অভিমানী কবির হাতে কৃষ্ণের বামে-হেলা চূড়া তথা কুঞ্চিতাধরে মোহন বাঁশীটিরও যে উচিত সদ্‌গতি হোত— সে ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। একই গোত্রের অন্যতর কবির আক্ষেপ শুনে করালবদনা কালীকে তাঁর নরমুণ্ডের মালাটি বিসর্জন দিতে হত এবং রক্তমাখা খড়্গটি ভাসিয়ে দিতে হত গঙ্গায়। শুধুমাত্র স্নেহময়ী জননীর রূপ ছাড়া আর সবই মনে হত বেশি বেশি, বিলক্ষণ, ঐশ্বরিক। আসলে দ্বিধাটা আছে ভক্তপ্রাণের আকুল দ্বন্দ্বে। কুরুক্ষেত্রে

অর্জুনের মত আমরা ঈশ্বরের বিচিত্র বিশ্বরূপ না দেখা পর্যন্ত তাঁর মুখোদ্গীর্ণ জ্ঞান, যোগ ভক্তি— কিছুই বিশ্বাস করতে পারি না। অর্থাৎ কিনা আমাদের আপন বিশ্বাসের জন্যই একান্ত স্বারোপিত বিশ্বরূপ আমাদের দেখা চাইই। আবার সেই অনন্তবাহু, শশিসূর্যের চোখ-ওয়ালা বিরাট রূপ যদি কোনক্রমে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমরা অর্জুনের মতই সবিশেষ ভীত-সন্ত্রস্ত হব। ঈশ্বরকে আমাদের অচেনা লাগবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বিশেষ বিশেষ দেবতার যে বিলক্ষণ রূপের বর্ণনা আছে, সেইরূপে যদি অন্ধকার রাত্রে তাঁদের দু-একজন আমার সামনে দেখা দেন, তাহলে আমার তো রীতিমত ভূতের ভয় লাগবে। যদি বা ভূতের ভয় নাও লাগে তো অর্জুনের মত আমার পালানোর রাস্তা খুঁজে পাওয়া ভার হবে— দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম— ওই রূপ দেখেই আমার ভয় করবে— ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে— আমি বলব— তুমি যেমনটি ছিলে বাপু মানুষের মত, তেমনটি হও। ভগবানও তখন মুচকি হেসে বাস্তবতা বুঝবেন। বুঝবেন যে, ঐশ্বরিক স্বতন্ত্রতা মানুষভক্তকে সব সময়ই বিচলিত করে। অতএব সময় বুঝে তিনিও মানুষের সামনে একেবারে সৌম্য মানুষের মূর্ত্তিতেই ধরা দেবেন— ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।

তাহলে মানুষের ইচ্ছাতেই ভগবানের রূপকল্প। মানুষের বিশিষ্ট ইচ্ছাতেই শিব ভস্মমলিন কৃত্তিবাস, মানুষের ইচ্ছাতেই কালী নগ্না, করালবদনী। আমরা চৈতন্য-পার্ষদ গোপালভট্টের গল্প জানি। চৈতন্যদেবের কাছ থেকে তিনি নিত্যসেবার জন্য একখানি শালগ্রাম শিলা পেয়েছিলেন। গণ্ডকী নদীর কীটদষ্ট ওই শালগ্রাম শিলায় যজ্ঞেশ, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু— যাঁরই অধিষ্ঠান থাক না কেন, গোলাকার, ভাবলেশহীন ওই শালগ্রাম মূর্ত্তিতে তাঁর মন ভরছিল না। সাধারণ প্রবাদেই তো গোলাকার শালগ্রামের ওঠা-বসা নিয়ে মজাদার ঠাট্টা আছে। অনেক মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নেতিবাচকভাবে বিভিন্ন শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটার প্রস্তাবও করে বলেছেন— সব শিলাই শালগ্রাম হলে বাটনা বাটি কিসে? গোপালভট্ট হয়তো এতটা ভাবেননি, কিন্তু শালগ্রাম নিয়ে তাঁর ভালও লাগছিল না। শেষ পর্যন্ত মানুষ ভক্তের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে শালগ্রাম ফুঁড়ে বেরোল কৃষ্ণের মানুষ মূর্ত্তি, সেই চিরাভ্যস্ত গোপবেশী বাঁশিওয়ালা।

কৃষ্ণ তো বহু বছর আগের ব্যাপার। মানুষের ইচ্ছায় স্বয়ং চৈতন্যদেবের কি অবস্থা হয়েছে কল্পনা করতে পারেন। সংসার ত্যাগের পর পুরীতে গম্ভীরার পরিবেশে তাঁকে আমরা কৌপীন-পরা, মাথা-ন্যাড়া সন্ন্যাসী হিসেবেই চিনি। অথচ এই কঠোর ত্যাগব্রতী মানুষটি শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ে নরহরি সরকার কি লোচনানন্দের হাতে পড়ে একেবারে রসিক নাগরটি হয়ে ধরা দিয়েছেন। কৃষ্ণের মত চৈতন্যও এখানে নদীয়া-নাগরীদের মনচোরা। হ্যাঁ, এই গৌর-নাগরীভাবের দার্শনিক অথবা রসতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য নদীয়ার সেরা সেরা সুন্দরীদের যৌবন-তরঙ্গে সাঁতার দিচ্ছেন অথবা "যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ/ সেই ঘরেতেই" তিনি চুরি করছেন— এ ভাব একান্ত মানুষেরই তৈরী। অতএব যে যেমন দেখে, যে যেমন ভাবে, ঈশ্বরের রূপও তেমনি তেমনি প্রকটিত হয়। শিব, কৃষ্ণ, কালী— বিচিত্ররূপী প্রত্যেক ঈশ্বর-রূপেরই নিজের জগতের কবি আছে, যে কবি কখনও তাঁকে স্তুতি করে, কখনও বিপদে ফেলে, কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়, কখনও বা তাকে দিয়ে ঝগড়া করায় আবার কখনও কপট লীলায় ছলী পুরুষে পরিণত করে।

এক্ষেত্রে পুরাণ-ইতিহাসে বিশিষ্ট দেবতার বিশিষ্ট রূপ যা আছে, পরবর্ত্তী কবি সেইটুকুই মাত্র মেনে নেবেন, কিন্তু যেভাবে অথবা যে কাহিনী অনুসারে/সেই রূপ তৈরী হয়েছে, কবি তা নাও মানতে পারেন। অর্থাৎ পরবর্ত্তী কবিরা অনেক ক্ষেত্রেই পুরাণোক্ত দেবতারূপের 'বেয়ার আউটলাইন'গুলি মেনে নিয়েছেন, যেমন কালী নগ্না, কি শিব শ্মশানবাসী অথবা লক্ষ্মী চপলা— এইটুকুই। কিন্তু কেন কালী নগ্না, কেন শিব শ্মশানবাসী অথবা কেন লক্ষ্মী চপলা— এ বিষয়ে পরবর্ত্তী কবিদের নিজস্ব কল্পনা আছে। অর্থাৎ এইখানে তাঁরা পুরাণের কল্পকাহিনীর পরিসর থেকে সরে এসে দেবতাকে নিজস্ব কল্পনার জগতে বসিয়েছেন। এতে কবিতা কখনও অত্যন্ত রসসমৃদ্ধ হয়েছে, কখনও রসের বদলে রসাভাস হয়েছে, আবার কখনও ঠাট্টা-তামাশার চূড়ান্ত হয়ে দেবতাকে একেবারে মনুষ্যধর্মের সাধারণ পর্য্যায়ে নেমে যেতে হয়েছে, আবার কখনও এমন হয়েছে যাতে মনে হয়— কবি তো মন্দ লেখেননি, ভাবটা তো বেশ ভালই।

যেমন ধরুন— কালী নগ্না। কালী নগ্না কেন— সে সম্বন্ধে পুরাণ-কাহিনী যাই থাকুক না কেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক সভাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কালীর নগ্নতা সম্বন্ধে তাঁর আপন একটি অনুমান দিয়েছেন। তাঁর ধারণা— প্রতিদিন সকাল, বিকেল, দিন, রাত্রি-সব সময় এই সৃষ্টিরূপা জননী অসংখ্য সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, ফলত দিনরাত্রির কোন মুহূর্ত্তেই তিনি আর গায়ে কাপড় রাখার সময় পান না— বস্ত্রাবরণসময়ং নৈব লভসে। কালীকে তাই সর্বদাই নগ্ন থাকতে হয়— ভব্যতা নগ্নত্বং ভগবতি ভবত্যেব। পুরাণগুলিতে বিশেষত মার্কণ্ডেয়চণ্ডী কালী মহামায়া চণ্ডীর স্বরূপ থেকে মসীবর্ণ কালোরূপ ধারণ করেছিলেন। তিনি নগ্না 'নির্মাংসা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা'। মুহুর্মুহু তিনি মদ্য পান করেন অসুর-বধের জন্য। কিন্তু কবির চোখে কোথায় চণ্ডী তাঁর চর্মকোষ পরিত্যাগ করে কালী হলেন, সেই তত্ত্বের ইতিহাস নেই। কবি নিজের জীবন ও জগতের অনুকরণে কাব্য রচনা করতে করতে বুঝতে পারেন—মায়ের আদুরে মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে নিজের ফর্সা রঙ কালো করে ফেলছে। এর জন্য সংস্কৃতের কবিতায় যেতে হবে না, স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত হিমালয়-ঘরণী মেনা-মায়ের মধ্যে বাঙালী-মায়ের মমতা মিশিয়ে লিখেছেন—

> শিবের স্বভাব দেখিয়ে ভেবে ভেবে কালী হয়ে।
> উমা আমার রাজার মেয়ে পাগলিনী অভিমানে।
> সেজে বিপরীত সাজ বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ।
> কি শুনি দারুণ কাজ মাতিয়েছে সুধাপানে॥

হতে পারে, এই শ্লোকের মধ্যে কোন রসিকতা নেই, আপাত চমকও কিছু নেই। কিন্তু কবি পুরাণকাহিনীতে বর্ণিত কালীর নগ্নতাটুকু মাত্র বজায় রেখে, তাঁর নিজস্ব অনুমানখণ্ডে এসে পৌঁছেছেন। কথা হল— এই অনুমানই কিন্তু আস্তে আস্তে রসিকতার সঙ্গে চমৎকারিতার জন্ম দেয়, আবার এই অনুমানই রসিকতার সঙ্গে লঘুতার জন্ম দেয়। উদাহরণ দিয়ে একটু পরিস্কার করে বিষয়টা বোঝা যাক। মনুষ্য লোকে সাধারণ মানের মানুষেরা অনেকেই শ্বশুরবাড়ি যেতে ভালবাসে, অনেকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেও ভালবাসে। বিশেষ করে দশমগ্রহের মত যেসব কুলীন জামাইরা একমাত্র

কন্যারাশিতেই থাকতে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে অসার সংসারে শ্বশুরমন্দিরই একমাত্র সার। কিন্তু কবি বলেছেন— মানুষের কথা ছেড়ে দাও— হিমালয় পর্বতের মেয়ে বিয়ে করে শিব যে চিরকালের মত হিমালয়ের কৈলাসেই থেকে গেলেন, আর সমুদ্রসুতা লক্ষ্মীকে বিয়ে করে ভগবান নারায়ণ যে চিরকালের মত সমুদ্রে শেষশয্যা বিছোলেন— সেটা কি শ্বশুরবাড়ির রসে নয় ? অতএব একথা ঠিকই যে— অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল— শিব কৈলাসে থাকেন— আমরা জানতাম ; আমরা জানতাম নারায়ণ সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শুয়ে থাকেন। কিন্তু কবি এখানে পুরাণ-কাহিনী থেকে একটি রৈখিক বস্তুমাত্র সংগ্রহ করে হরি, হর-দুজনকেই ফেলে দিয়েছেন শ্বশুর-গৃহামোদী কলঙ্কী জামাতার ছাঁচে। এতে তিনি হরি-হরকে লঘু করলেন, নাকি শ্বশুর গৃহের পক্ষপাতী জামাইদের খানিকটা যৌক্তিকতায় স্থাপন করলেন— সেটা সহৃদয় পাঠকেরা বুঝে নেবেন। কিন্তু এই রসিকতায় হরি-হর-কারোরই যে সম্মান খুব লঘু হয়ে গেছে, তা আমরা মনে করি না। আমাদের ভয়—দেবতার পৌরাণিক রূপকল্প থেকে স্বাধীনতা নিয়ে পরবর্ত্তী কবিরা আরও কি না বলেন। আমাদের পরবর্ত্তী উদাহরণ থেকে বুঝতে পারবেন— পুরাণ-পিতামহেরা কি পরিমাণ প্রশ্রয় দিলে তাঁদের পৌত্রকল্প কবিরা দেবতাদের সঙ্গে সস্তা ঠাট্টা-মস্করায় মেতে উঠতে পারেন। রসের চমৎকারিতা থেকে রসিকতা, রসিকতা থেকে একেবারে রসোদগার।

মহাদেব শিব। ইতিহাস-পুরাণে তাঁর পাঁচ-দশটা নাম আছে। তাঁর চেহারাটাও কল্পনা করা আছে বড় মোটা দাগে। শিবের চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং তাঁর নামগুলিকে শ্লেষ করে কবিরা শিব-পার্বতীকে দিয়ে কিরকম মানুষের মত ঝগড়া করিয়েছেন দেখুন। হ্যাঁ, পুরাণগুলিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিব এবং পার্বতীর ঝগড়াঝাঁটি মাঝে মাঝেই আছে বটে। তা ঝগড়াঝাঁটি হলে মাঝে মাঝে রুষ্টা স্ত্রী ইচ্ছে করে স্বামীকে না চিনতেও পারেন, না পুঁছতেও পারেন। কিন্তু এই সুযোগ কবি কাজে লাগিয়েছেন স্রেফ শিবের নামগুলিকে শ্লেষ করে। কবির দৃষ্টিতে শিব এসেছেন রুষ্টা পার্বতীর কাছে। শিবকে দেখা মাত্রই পার্বতী বললেন— কে হে তুমি! শিব বললেন— আমি শূলী শম্ভু। শূলী বলতে যে ত্রিশূলধারী বোঝায়— এটা কে না জানে ! কিন্তু আর্য্যুবেদ শাস্ত্রে শূল বলতে ব্যথা-বেদনা বোঝায়, যেমন দন্তশূল, পিত্তশূল, অম্লশূল ইত্যাদি। আর সোজাসুজি বাংলায় শূলবেদনা বলতে আমরা বুঝি— ভয়ংকর রকমের পেটব্যথা, এবং যে রোগীর এই পেটব্যথা আছে, তাকে আমরা শূলী বলে চিহ্নিত করতে পারি। পার্বতী শূলী শব্দের এই অর্থ বুঝে— (অর্থাৎ ইচ্ছে করেই এই অর্থ বুঝে) বললেন— আহা, তুমি শূলবেদনার রুগী ? তা আমি কি করব ! ডাক্তার-বদ্যি দেখাও— মৃগয় ভিষজম্। শিব ভাবলেন পার্বতী বুঝি 'শূলী' নামটা বুঝতে পারছেন না। বললেন— তুমি আমায় চিনতে পারছ না প্রিয়ে, আমি নীলকণ্ঠ। সমুদ্রমন্থনের সময় বিষ খেয়ে শিব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। অবুঝের মত উল্টে নীলকণ্ঠ মানে সোজা অর্থে ময়ূর বুঝে পার্বতী বললেন— ও, তুমি নীলকণ্ঠ ময়ূর ! একবার কেকাধ্বনি করতো দেখি। শিব দেখলেন— বড়ই ঝামেলা, তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারছেন না তিনি কে। শিব এবার আরও বেশি পরিচিত একটি নাম উল্লেখ করে বললেন— হ্যাঁ গো ! আমি পশুপতি। পার্বতী সবিস্ময়ে বললেন—

পশুপতি ! তা বেশ তো, কিন্তু তোমার দাঁতজোড়া কোথায় গেল ? আসলে পশুপতি বলতে হাতী কিংবা বন্য শুয়োরও বোঝায় এবং তাদের দাঁত থাকে। শিব বললেন— না, না, আমি স্থাণু। স্থাণু শব্দের একটি অর্থ গাছ কিংবা কোন স্থির পদার্থ। পার্বতী বললেন— গাছ কি এ রকম চলাফেরা করে নাকি ? শিব এবার কোন উপায় না দেখে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে বললেন— আমি যে শিবার প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম— শিব, আমায় চিনতে পারছ না— জীবিতেশং শিবায়াঃ ? পার্বতী তবু শিবের নামে শিবানী হতে চাইলেন না। হায় ! পার্বতী আপাতত 'শিবা' শব্দের অর্থ শেয়াল ধরে বললেন— শৃগালিনীর প্রাণসখা ! তুমি বনে যাও, সেটিই তোমার উপযুক্ত স্থান। কবি লিখেছেন— এই যে পার্বতীর কথায় শিব একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন, এই থতমত খাওয়া হতবাক শিব তোমাদের রক্ষা করুন।

ঠিক এইসব জায়গায় কবিদের আসল ইচ্ছেটা বোঝা যায়। তাঁরা দেবতার আশীর্বাদও চান, আবার থতমত ভাবটিও চান। চৈতন্যস্বরূপ এক চরম দার্শনিক তত্ত্বকে স্ত্রীর কাছে একেবারে থতমত খাওয়াতে না পারলে কবিদের ভাল লাগে না। অনুরূপ অন্য একটি শ্লোকে পুরাণ-পুরুষ, বিভূতিযোগী কৃষ্ণকে বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধার মুখ দিয়ে বাঁদর থেকে আরম্ভ করে ভ্রমর — কি-ই না বলা হয়েছে। সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা বলে, সংসার-মহীরুহের বীজ বলে তাঁরা যে গৃহিণীর কাছে মুখঝামটা খাবেন না—তা কবিরা সহ্য করবেন না। সংসার জীবনের শতেক ঝকমারি যদি কবিদের সইতে হয়ে থাকে, তবে তা শিব, কৃষ্ণ, রাম—সবাইকেই সইতে হবে। বিয়ের আগে যে যুবক পুরুষ 'বোহেমিয়ান' জীবন যাপন করত, তাকে যদি বউয়ের পাল্লায় পড়ে সংসারের মাপজোক করা আদব কায়দা শিখতে হয়, তো শিবকেও তা শিখতে হবে—কৃষ্ণকেও তা শিখতে হবে। ফলত দিগম্বর শিবকে দিগ্‌বাস ছেড়ে দিয়ে বিয়ের পর ভাল জামাকাপড় পরতে হয়েছে—উজ্‌ঝিত্বা দিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানশ্চিরং। বিয়ের আগে শ্মশানে মশানে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ ছিল শিবের, কিন্তু এখন তাঁকে থিতু হতে হয়েছে শ্বশুরের দেওয়া ভিটেতে—কৈলাসে। পার্বতীর পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ভস্ম মাখা ছেড়ে দিয়ে শিবকে আজকাল একটু-আধটু স্নো-পমেটমও মাখতে হয়—ত্যক্ত্বা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগনিচয়ঃ। হিমালয়ের মেয়েকে বিয়ে করার পর থেকে শিবের জীবনে এই যে একটা বাঁধা-ধরা ভাব এল, এই যে তিনি আর যা ইচ্ছে তাই করতে পারছেন না—এই সংসার বাঁধনের জাঁতাকলে পড়া গৃহস্থ শিবকে কবির ভাল লাগছে—হিমাদ্রিজাপরিণয়ং কৃত্বা গৃহস্থঃ শিব।

আমরা বেশ জানি—যে কবি এতকাল ছাড়া-ছাড়া জীবনে বসন্তের হাওয়া গায়ে মেখে, চাঁদের জ্যোৎস্না খেয়ে, ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁকে যদি সংসার-গৃহের কর্তা হয়ে বউয়ের কাছে মুখঝামটা খেতে হয়, কি বউয়ের পাল্লায় পড়ে সাজ বদল করতে হয়, তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেও যে স্ত্রীর কাছে মুখঝামটা খাওয়াবেন কিংবা তাঁর কপাল খারাপ করে দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ! আমাদের ঠাকুরেরা তাতে রাগ করেন না।

আর রাগ করবেনই বা কেন ? সবই কপাল। মানুষেরও কপাল, ভগবানেরও কপাল। কপাল দোষে ভগবানের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত মানুষের মত হয়ে গেছে। এই

যে রামচন্দ্র অথবা মহামতি কৃষ্ণ—এঁরা মধুর ক্ষত্রিয় জন্ম লাভ করে সেকালের বহু পাঁঠা-শুয়োর (আবিকবারাহৈঃ) হজম করেছেন। কিন্তু তারপর চৈতন্যদেব কৃষ্ণভক্তদের জন্য নিরামিষ বৈষ্ণব মত প্রচার করলেন, এবং তার প্রভাব এত গভীর হল যে, কৃষ্ণ-রামেরা যে কোনকালে মাছ-মাংস খেতেন—সে কথা শুনলেও লোকে ওঁ বিষ্ণু বলে কানে হাত দেয়। অবশ্য চৈতন্যকে দোষ দিলে হবে না শুধু, তাঁর আমলে অবস্থা খারাপ হয়েছে মাত্র, রাম-কৃষ্ণের আমিষ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল। কোথাও তাঁদের পূর্ব-খাদ্যাভ্যাসের নমুনা স্মরণ করে পাঁঠা-শুয়োরের ভোগ নিবেদিত হয় না। ঘোর আমিষাশী ভগবানদের যদি নিরামিষাশী মানুষের পাল্লায় পড়ে শাক-শুকতো খেয়ে জীবন কাটাতে হয়, তাহলে তাঁদের যে বউয়ের কাছে মুখঝামটা খেতে হবে, শুয়োর-বাঁদরের সম্বোধন শুনতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

সংস্কৃতের কবি তাই ঠাকুর-দেবতার অবস্থা দেখে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—প্রণাম যদি করতেই হয় তো বাপু কপালকে প্রণাম কর, কর্মের ফেরকে নমস্কার কর—তস্মৈ নমঃ কর্মণে। কেন, তেত্রিশ কোটি শক্তিমান শক্তিমতী ঠাকুর-দেবতা ছেড়ে কর্মকে নমস্কার কেন ? কবি বলেছেন—বেচারা কুমোর যেমন কপালের ফেরে দিনরাত হাঁড়ি-কলসীর মাথা-মুণ্ডু জোড়া দিয়ে দিয়েই জীবন কাটাল, তেমনি ওই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকেও কপালদোষে দিনরাত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থা করতে করতেই জীবন কাটাতে হচ্ছে। আর স্বয়ং বিষ্ণু, যিনি দেবতাদের দেবতা বলে বিখ্যাত, তাঁকে কিনা দশ দশটা অবতার হওয়ার ঝামেলায় পড়ে একবার মাছ হতে হচ্ছে, একবার শুয়োর হতে হয়েছে, আর সেই অবস্থায় পড়েও তাঁকে কিই না করতে হয়েছে। শিবের কথা আর বলতে নেই। রুদ্র শিব ! কপালের ফেরে তাঁকে ভিক্ষাপাত্র হাতে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছে—রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষাটনং কারিতঃ—কাজেই প্রণাম যদি করতেই হয়, তাহলে আর এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে নয়, প্রণাম কর কপালকে, প্রণাম কর কর্মকে—তস্মৈ নমঃ কর্মণে।

দেবতাদের যে সবাইকে কর্মের ফের সহ্য করতে হয়—এ কথা শাস্ত্রযুক্তির বাইরে নয়। ভগবদ্গীতা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন পুরাণে আমরা দেখব যে, দেবতারা মানুষের মতই কর্মাধীন। এমনকি তাঁরা কেউ অমরও নন। পুরাণকারেরা লক্ষ করেছেন—প্রলয়ের সময় নিজেদের অন্তকালের কথা ভেবে—বুধ্বা পর্যায়মাত্মনঃ—দেবতারা মানুষের মতই সবিশেষ ব্যাকুল হন। এমন মনুষ্যধর্ম চিহ্নিত দেবতাদের মানুষের মতই যে কপালের দোষ সহ্য করতে হবে—তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। কবি তো দেবতাদের মুখের ওপর একেবারে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে দিয়েছেন—দেখ বাপু ! বিদ্যে-বুদ্ধিই বল আর পেশীর জোরই বল, কপালে না থাকলে, কোনটাই কামে লাগবে না। এই যে এত বড় সমুদ্র মন্থন হয়ে গেল, তাতে কত রত্ন, মণি-মাণিক্য উঠল। তাতে কপাল দেখ—ভগবান শ্রীহরি পেলেন ভুবনমোহিনী লক্ষ্মীকে আর ভগবান মহেশ্বরের কপালে জুটল বিষ—সমুদ্রমন্থনাল্লেভে হরি র্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।

একথা অবশ্য ঠিক যে, আমরা যে কবিতাগুলি উল্লেখ করছি, এগুলি কোন বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থের বিশিষ্ট কবিতা নয়। হাজারও কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি এই কবিতাগুলি। ফলে যে কবির যে অভিজ্ঞতা, তারই ছায়াপাত ঘটেছে দেবচরিত্রের

ওপর। হতে পারে—যে কবি দেবতাদের কর্মবিপাকে বন্ধন করেছেন, তিনি নিজেও ভাগ্যহত। কিন্তু তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বনার ছায়া যখন দেবতার ভাগ্যে বর্তায়, দেবতাও সেই মুহূর্তে চরম মনুষ্য পদবী লাভ করেন। শুধু মনুষ্য কেন, কবি বলেছেন—বিদ্যেবুদ্ধি দিয়েই যদি সব হত, তাহলে গণ্ডকীর শালগ্রাম কিংবা নর্মদার বাণেশ্বর শিব—এই দুটো পাথর কোনদিনই দেবতা হতে পারতেন না—পাষাণস্য কুতো বিদ্যা যেন দেবত্বমাগতঃ।

আমাদের মতে—এই রকম ভাগ্যহত কবির বর্ণনা, দাম্পত্যজীবনে আহত কবির বর্ণনা, অথবা রঙ্গপ্রিয় কবির বর্ণনাই শেষ পর্যন্ত শিবকে 'বোম্ ভোলানাথ' বানিয়েছে, দুর্গাকে 'রণচণ্ডী' বানিয়েছে, কৃষ্ণকে 'কলির কেষ্ট' বানিয়েছে, অথবা গণেশকে 'গোবর-গণেশ' বানিয়েছে। সবই কপাল।

॥ ২ ॥

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। সেটা হল—কর্ম বলতে যে শুধু—এই কর্ম করেছি, তার এই ফল হল—তা ভাববেন না। কারণ, বায়ু পুরাণের মত প্রাচীন পুরাণ বলেছে—কেউ পুরুষকারকে কর্ম বলেন, কেউ দৈবকেও কর্ম বলেন, এমনকি নিজ নিজ স্বভাবকেও অনেকে কর্ম বলে থাকেন—

কেচিৎ পুরুষকারন্তু প্রাহুঃ কর্ম চ মানবাঃ।
দৈবম্ ইত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং দৈবচিন্তকাঃ ॥

এই নিরিখে দেখতে গেলে দেবতাদের নানা ক্রিয়াকর্ম এবং তাঁদের স্বভাবও একটা বড় ব্যাপার, যে কারণে অনেক দেবতাই অনেক সময় হাস্যাস্পদ হয়ে গেছেন, এবং তার অবধারিত ফল কবিদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অবশেষে প্রবাদ। আগেই বলেছি ব্যাপারটা ঘটে দুটি কল্পে। প্রথমে পরম শ্রদ্ধেয় দেবতার নানা ক্রিয়াকলাপ এবং স্বভাব দেখে তাঁর ওপর মানুষের রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট্য আরোপিত হতে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে তাঁকে একেবারে মনুষ্যায়ণের চূড়ান্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম পোঁচটি লাগান পৌরাণিকেরা, দ্বিতীয় পোঁচটি লাগান কবিরা এবং তৃতীয় পোঁচ লাগায় সাধারণ লোকেরা, যারা প্রবাদ তৈরী করে।

এই যে আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ, যাঁর মাথাটি হাতির মত বলে নানা পুরাকাহিনী আছে, কিন্তু সেটাই তো সব নয়। লক্ষণীয় বিষয় হল—যে শিব-পার্বতীর ক্ষণিকের স্মিতহাস্যে পুত্রহীনের পুত্র হয়, ধনহীনের ধনলাভ হয়, পৌরাণিকেরা মনুষ্যায়ণের তাগিদে সেই শিব-পার্বতীকে বহু বৎসর অপুত্রক রেখে দিয়েছেন। আবার কোন পুরাণ যদি বা এই পুত্রহীনতার জন্য পার্বতীকে দিয়ে 'পুত্রক ব্রত' পালন করিয়েছেন, তো অন্য পুরাণকারেরা একেবারে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের মত পুত্রহীনা পার্বতীকে দিয়ে দিনের পর দিন পুতুল-খেলা করিয়েছেন। সেই পুতুলই এক সময় শিব কিংবা পার্বতীর ইচ্ছেতে সঞ্জীবিত হয়েছে পার্বতীর পুত্ররূপে। কবির সকৌতুক কটাক্ষ নিয়ে বাপ ছাড়া, মা ছাড়াই—বিনাপি তাতেন বিনা জনন্যা—গণপতি গণেশ শিবের ছেলে হয়ে পার্বতীর কোল আলো করে বসলেন। ছেলে হলে মনুষ্যসমাজে আত্মীয়স্বজন যেমন

দেখতে আসে, তেমনি গণেশকেও দেখতে এসেছেন আত্মীয় দেবতারা। ক্রূরগ্রহ শনি নাকি আপন কুদৃষ্টির জন্য গণেশকে দেখতে চাননি, কিন্তু সুকুমার পুত্রটিকে কোন জননীর না দেখাতে ইচ্ছে করে! পার্বতীর পীড়াপীড়িতেই শনি শেষ পর্যন্ত তাঁর ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, অমনি গণেশের মুখ খসে পড়ল। শেষে হাতির মাথা ছেলের গলায় সেলাই করে কোনরকমে ছেলেকে বাঁচালেন পার্বতী। কিন্তু অশেষশক্তিরূপিণী এই দেবী বহুজনের হিতসাধন করলেও মনুষ্যায়ণের তাগিদে কোন দৈব বিভূতি দেখিয়ে ঝ্যাং করে পুত্রের মুখ গজানোর চেষ্টা করেননি। সুবিখ্যাত দাদাঠাকুর আরও একটু কটাক্ষ করে বোধ হয় বলেছিলেন— যে ঠাকুর নিজের ছেলের মুখ ঠিক করতে পারে না, সে পরের ছেলের অসুখ সারাবে কি করে?

আমরা অবশ্য এতদূর যেতে চাই না। আমরা বলি—ঠাকুর যতই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন না কেন, তাঁকে মানুষের রীতিনীতি লঙ্ঘন করলে চলে না। ফলে খাঁদা-বাঁকা যাই হোক হস্তিমুখ ছেলেটির ওপর বাপ-মায়ের স্নেহের অন্ত ছিল না। আবার ছেলে হিসেবে গণেশও তাঁর বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট বুঝমান। কবি লিখেছেন—শিব-পার্বতী দুজনেই যখন একসঙ্গে গণেশের গালে অর্থাৎ গজমুখে চুমো খেতে চাইছিলেন— যুগপৎস্বগণ্ডচুম্বনলোলৌ—তখন নাকি তিনি নিজের মুখখানি বারবার মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে দারুণ মজা পাচ্ছিলেন। এই মজার ফল আমরা যেমন টের পাচ্ছি, তেমনি গণেশের মা-বাবাও কিছু টের পাচ্ছিলেন। মাঝখান থেকে মুখ সরিয়ে নেবার ফলে শিব-পার্বতীর অধরোষ্ঠ মাঝে মাঝেই মিলিত হচ্ছিল এবং এতে নাকি গণেশ বেশ মজা পাচ্ছিলেন— তন্মুখমেলনকৌতুকী। বোঝা যাচ্ছে, কচি বয়সেই গণেশ বেশ পাকা ছেলে। বিশেষত মায়ের ব্যাপারে তাঁর দরদ একটু বেশি।

পুরাণমতে বিভিন্ন সময়ে বাবা শিবের সঙ্গে ছেলে গণেশের অনেক মারামারি হয়েছে এবং তা হয়েছে মায়ের কারণেই। গণেশ মায়ের অতন্দ্র প্রহরী এবং মায়ের ওপর পিতা মহেশ্বরের এতটুকু বেয়াদবী অধিকার ফলানো দেখলেই বাপের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যায়। কোথাও কোন পুরাণে আবার এমনও পাই যে, পার্বতী স্নানের ঘরে ঢুকলেই ওই অরক্ষিত স্থানে শিবের হুটহাট্ ঢুকে পড়ার অভ্যাস ছিল, এবং এই স্নান-কালীন বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্যই সমাধান হিসেবে একান্ত অনুচর গণেশের সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, হাতির মাথা জুড়ে পৌরাণিকেরা যে সিদ্ধিদাতা গণেশ তৈরী করেছেন, পরবর্তী কবিরা শুভলাভের জন্য তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দিলেও গণেশকে তাঁরা আরও কাছের মানুষটি করে ফেলতে দ্বিধা করেননি।

এমনকি হাতির মত মুখে মানুষের আদল আনবার জন্য কবিরা গণেশের গোঁফের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছেন, এবং হাতির মুখে সে গোঁফজোড়া বসাতে কবিদের বেশ কষ্ট হয়েছে। কবিরা জানেন—মদমত্ত হস্তীর গাল বেয়ে মদবারি স্খলিত হয় এবং ছাতিম ফুলের মত মোদো গন্ধ আছে সেই গাল-চুয়ানো মদবারির। স্বাভাবিক কারণেই সপ্তচ্ছদগন্ধী এই মদবারির গন্ধে প্রচুর ভ্রমর আকৃষ্ট হয়ে উড়ে এসে বসে হাতীর মুখে। এই ধারণাকে সম্বল করে কবি কল্পনা করেছেন— সেই 'নিলীনমধুপকুল' গণেশের গজমুখে একজোড়া গোঁফ এঁকে দিয়েছে যেন। অর্থাৎ হাতির গালে-বসা মধুকর-শ্রেণীর রেখাকেই কবিরা গণেশের গোঁফ কল্পনা করে নবশ্মশ্রুমণ্ডিত গজাননকে

নমস্কার করেছেন— উদ্ভিন্ন-নবশ্মশ্রুশ্রেণিরিব দ্বিপমুখো জয়তি। সিদ্ধিদাতা দেবতাকে মানুষ করার জন্য ভ্রমরের গোঁফ উপহার দিয়ে কবিরা তাঁকে আমাদের কাছাকাছি এনে দিয়েছেন বলেই পরে কিন্তু এই গণেশকেই আমরা গোবর গণেশ বলেছি।

শাস্ত্রের প্রমাণে গণেশের কিন্তু বুদ্ধি কম ছিল না। মহাভারতের লেখক হবার সময় বুদ্ধির জোরে স্বয়ং ব্যাসকেও খানিকটা বিপাকে ফেলেছেন তিনি। কার্তিক-গণেশ দুই ভাই বিয়ে করার জন্য পাগল হলে পার্বতী ছেলেদের পরীক্ষা নিলেন। সে পরীক্ষায় কার্তিক সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে মরলেন, আর গণেশ দশ পা হেঁটে মাকে প্রদক্ষিণ করেই পরীক্ষা পাশ করে ফেললেন। শাস্ত্রমতে মাতৃসেবীর চরম পুরস্কার হিসেবে গণেশকে বুদ্ধিমান বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এমন মা-নেওটা ছেলেকে লোকে গোবর গণেশ বলেছে। অবশ্য গোবর গণেশ হওয়ার জন্য শুধু মায়ের আঁচল-ধরা অভ্যাসই যে গণেশের কাল হল, তাই নয়, তাঁর ওই থসথসে চেহারা, মোটা ভুঁড়ি, শরীরের ওপর হাতির মাথা থাকার ফলে সেই অনুযায়ী খাওয়ার কল্পনা—এই সব কিছু মিলে কেমন যেন জরদ্গবের আভাস নিয়ে আসে গণেশের কল্পনায়। মনুষ্যলোকের অতি সাধারণ জনেরও তাই কুণ্ঠা হল না—গণেশকে গোবর গণেশ বলে ডাকতে।

কোন কোন পুরাণমতে শিবের অভিশাপেই নাকি গণেশের ওই রকম ভুঁড়ি, এবং তাঁর মুখ যে হাতির মত হয়ে গেছে—সেও নাকি শিবের অভিশাপে। অপেক্ষাকৃত লোকায়ত সাহিত্যে কিন্তু কোন দেবতার শারীরিক বিকৃতির জন্য অভিশাপের কথা মনে থাকে না। শিবের সঙ্গে ঝগড়া হলে পার্বতী নিজেই ভারতচন্দ্রের কথা ধার করে বলেন—

বড় পুত্র গজমুখ চারিহাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥

লোক সমাজে সাধারণ মানুষের ভুঁড়ি থাকার ফল এই যে, সময়ে অসময়ে তার বাবা-মাও সেই ভুঁড়ি নিয়ে কটূক্তি করতে ছাড়েন না। কিন্তু বাপ-মা যাই বলুন, যিনি স্বয়ং অন্নদামঙ্গলের কবি, যিনি আপন গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য গণেশ-বন্দনা দিয়েই কাব্যারম্ভ করেছেন, সেই ভারতচন্দ্রও এক সময়ে রাজার জবানিতে রেগে বলেন—

রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে কার,
পাত্রমিত্র গোবর গণেশ।

আসলে গণেশের নামের সঙ্গে এই যে অকর্মণ্যতার আভাসটুকু জড়িয়ে আছে, এই যে প্রচুর খাওয়ার সঙ্গে কাজে না লাগার একটা অনুষঙ্গ গণেশ-নামের সমার্থক হয়ে গেছে, এর কারণ যাই হোক—তাঁর চেহারাই হোক কিংবা স্বভাব—এটা দেবতার চরিত্র থেকেই মনুষ্য চরিত্রে প্রবাহিত, না, মনুষ্য চরিত্র থেকে দেবচরিত্রে প্রবাহিত—সেটা সুধী ব্যক্তি মাত্রেই বিচার করে দেখবেন।

আমরা দ্বিতীয় কল্পের পক্ষপাতী, অর্থাৎ মনুষ্য চরিত্র অনুযায়ীই দেবচরিত্র তৈরী হয়, কারণ এর উদাহরণ তো একটা নয়। ধরুন, এক বাড়িতে দুটি ছেলে আছে, অথচ তাদের একজন কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে, এবং অন্যজন ফুলবাবু। ঠিক এই রকম

একটা পারিবারিক পরিস্থিতির প্রতিরূপ পাওয়া যাবে পার্বতীর সংসারে। গণেশের পরিচয় যাই হক, পার্বতীর অন্য ছেলেটি ইতিহাস-পুরাণে দেবতাদের সেনাপতি বলেই সমধিক পরিচিত। এত বড় একজন সামরিক পদাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও লোকসমাজে কার্তিকের পরিচয় কিন্তু একেবারে নববাবু বলে। সেরকম মানুষ দেখলে আমরা এখনও 'কেলে কার্তিক' কি 'বাঁকা কার্তিক' বলে ডেকে থাকি। অথবা কারও মধ্যে কার্তিকের সমস্ত রূপ-গুণ দেখে শুধুমাত্র ময়ূরটি নেই বলে খেদ অনুভব করি। বস্তুত আমাদের সমাজের অতি রূপবান নববাবুর মত মানুষটিকে ভারতচন্দ্রের মত কবিও কার্তিকের নামে উপহাস করেছেন। দেবদেব মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর যে মঙ্গলকাব্যিক ঝগড়া হয়েছিল তাতে পার্বতী স্বয়ং অনুযোগ করে বলেন—

ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায় ॥

সত্যি কথা বলতে কি, কার্তিক তাঁর ময়ূরবিলাসে কিংবা অন্যান্য বাবুয়ানায় কি পরিমাণ পয়সা ওড়াতেন—তার হিসেব আমরা কোথাও পাইনি। কিন্তু তাঁর জন্মলগ্নে ছয় কৃত্তিকা মাতা তাঁকে স্তন্য দান করেছিলেন বলে তিনি যেমন 'ষন্মাতুর' বলে বিখ্যাত, তেমনি নিজেও 'ষন্মুখ' অর্থাৎ ছয়-মুখো বলেও বিখ্যাত। কিন্তু সেই ছয়-মুখের সূত্র ধরে তথা চ তাঁর ময়ূর-বাহনের সূত্র ধরে ভারতচন্দ্র কার্তিককে একেবারে বাপের হোটেলে-খাওয়া রক্‌বাজ ছেলেটি করে ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের যেটা আশ্চর্য লাগে, সেটা হল—কার্তিকের এই ময়ূরবিলাসী নববাবু রূপটির কোন পূর্বকল্প আমরা ইতিহাস-পুরাণে পাইনি। আরও আশ্চর্য লাগে এই জন্যে যে, যেখানে সব কটি প্রধান দেবতা সম্বন্ধে পৌরাণিক কিংবা পরবর্তী কবিরা রসিকতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন, সেখানে কার্তিকের এই বাবুয়ানি প্রায় কোথাওই ধরা পড়েনি। লোকপ্রথা অনুসারে যে মানুষের চেহারা খুব সুন্দর অথবা পুরুষ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও যার চোখ দুটি পটলচেরা, নাকখানি বাঁশীর মত অথবা মুখখানি একেবারে নিখুঁত—তাকে আমরা 'ময়ূরহীন কার্তিক' বলে খেপাই বটে, কিন্তু কার্তিক যে সাংঘাতিক কিছু সুন্দর ছিলেন—সে বর্ণনা আমরা ইতিহাস-পুরাণে কোথাও পাইনি। এখন আপনি যদি নানা পুরাণের মেলায় স্কন্দ, মৎস্য, পদ্ম, বামন ঘেঁটে প্রমাণ দিয়ে বলেন—কে বলেছে কার্তিকের রূপ নেই? এই তো তাঁকে 'বালার্কদীপ্তিং', 'তরুণম্ আদিত্যপ্রভম্' অথবা 'সিন্দূরারুণতেজসে' বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তা হলে আমরা বলব—ওরকম রূপ ভারতবর্ষের সব দেবতারই আছে; বরঞ্চ বেশিই আছে। মহাদেব, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধ, চৈতন্য, এমনকি বিবেকানন্দ পর্যন্ত, ওরকম রূপবর্ণনা সবারই আছে। বস্তুত 'রূপে কার্তিক' এই রূপ-প্রবাদের ব্যাপারে আমাদের কোন পূর্বানুরাগ না থাকার ফলে কার্তিকের রূপানুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা প্রায় ব্যর্থ। কেউ যদি পুরাণ-মহাভারত থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত কার্তিকের সর্বাতিশায়ী অসমোর্ধ্ব রূপবর্ণনা দেখাতে পারেন—যে রূপের বশে এই কালে আমরা কুরূপ পুরুষের মধ্যে রূপের ঢঙ দেখে বলি—'কেলে কার্তিক' কি 'বাঁকা কার্তিক'—তা হলে কার্তিকের সম্বন্ধে একটা পরম্পরা পাই।

আরেক কথা—কার্তিক যে খুব বড় মানুষের মত দেবসেনাপতি হয়ে গেলেন—সে

ব্যাপারেও আমাদের ধন্দ আছে। পৌরাণিকেরা অনেকেই কার্তিককে রুদ্রশিব, অগ্নি ইত্যাদি বড় বড় দেবতার পরিবর্তিত রূপ বলে আনন্দ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু একমাত্র তারকাসুর বধের জন্য কুমার-সম্ভব হওয়া ছাড়া আরও অনেকানেক দেবাসুর যুদ্ধে কার্তিকের কোন যুদ্ধোন্মাদ মূর্তি আমরা দেখিনি। দক্ষিণ ভারত থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গাতেই কার্তিককে অবিবাহিত নবীন যুবকটি করে রাখা হয়েছে। সেই জন্যই তাঁর এমন একটা রূপে কার্তিক রমণীমোহন রূপ-কল্পনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার বন্ধুবর, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক অভিজিৎ ঘোষ তাঁর সূক্ষ্ম গবেষণার পথ ধরে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন—কার্তিকের বউয়ের নামই দেবসেনা এবং বউয়ের নামেই তিনি শেষ পর্যন্ত 'দেবসেনা-পতি' হয়ে বসেছেন। কথাটা শোনার পর কিন্তু কিন্তু করছিলাম। বন্ধু বললেন—তুই এই একটা উদাহরণ দেখে ঘাবড়াস না, ওই শচীপতি ইন্দ্রের কথাই ধর না। বেদের ভাষায় 'শচী' শব্দের মানে হল শক্তি, চতুরতা ইত্যাদি। প্রবল শক্তিধর হিসেবেই দেবরাজ ইন্দ্র প্রাথমিকভাবে শচীপতি হয়ে গেছেন, তারপর ইতিহাস-পুরাণের দৌলতে শচী হয়েছেন ইন্দ্রের স্ত্রী আর ইন্দ্র হয়েছেন শচীপতি।

দেখলাম—কথাটা ভাববার মত। বন্ধুর কথা শুনে মহাভারত-পুরাণ আবারও নাড়াচাড়া করলাম। শেষে খোদ মহাভারতের মধ্যেই চোখে পড়ল—অন্ধকার দূর করে যেমন সূর্য প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনি বিপত্তারণ কার্তিককে দেখে সমস্ত দেবসেনা ধেয়ে এসে বলেছিল—এই আমাদের প্রভু, ইনি আমাদের পতি—অস্মাকং ত্বং পতিরিতি। 'সেনা' শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব সমস্ত দেবসেনাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে কার্তিক দেবসেনাপতি হয়ে গেলেন। কিন্তু কার্তিক সম্বন্ধে এই সামান্য কথাটা জানিয়েও আবার বলি যে, কার্তিকের সৌন্দর্যের পরম্পরা সন্ধানে আমরা তুলনামূলকভাবে ব্যর্থ। তুলনামূলকভাবে এই জন্যে যে, অন্যান্য দেবতার পরম্পরা আমরা শাস্ত্র-কাব্য এবং সর্বশেষে প্রবাদের ধারায় এখনও জনসমাজে চালু দেখতে পাই, কিন্তু কার্তিকের বিশেষ রূপকল্পনা অর্থাৎ রূপে কার্তিক—এমন একটা প্রাবাদিক বিস্ময় আমাদের মতে প্রায় ভিত্তিহীন।

তবু, তবু কথা কিছু থেকেই যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—দেববিষয়ক কোন বাংলা প্রবাদ আকাশ থেকে উড়ে মানুষের মুখে এসে বসেনি। কার্তিকের সম্বন্ধে একটা কথা খেয়াল করতেই হবে যে, তিনি চিরকুমার। অবিবাহিত পুরুষমাত্রেই, বিশেষত সে পুরুষ যদি দেবতার মত সুপুরুষ হয়, তবে সে চিরকুমারের বদলে চিরনায়ক হয়ে যায়। কার্তিকেরও তাই হয়েছে, আর চিরনায়ক হওয়ার জন্যই তাঁর রূপটাই হয়ে গেছে প্রধান। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে কার্তিকের কুমার উপাধি জুটেছে। মহাভারত পুরাণে এসে কার্তিকের কৌমার্যরক্ষার কবচ 'কামজিৎ', 'শুচি', এমনকি 'যোগীশ্বর' উপাধিও জুটেছে। ফলত একদিকে কার্তিককে যত স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে দূরে রাখা হয়েছে, আমার মনে হয় কার্তিকের রূপের প্রবাদ ততই বেড়েছে। এটা নিশ্চয়ই জানেন যে, কার্তিক যতই রূপে কার্তিক হন না কেন, কার্তিকের মন্দিরে কিন্তু মেয়েদের ঢোকা বারণ। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে দেখেছি—স্বয়ং স্বর্গনায়িকা উর্বশী কার্তিকের মন্দিরে ঢুকে 'লতা' হয়ে গিয়েছিলেন। উর্বশী নিজে রাজা পুরূরবাকে জানিয়েছিল যে, ওই কার্তিকের নামাঙ্কিত বনটি মেয়েদের কাছে ছিল

পরিহরণীয়—অম্বকাজ্ঞণপরিহরণীয়ং কুমারবনং পবিঠঠা। কার্তিকের মন্দিরে ঢুকলে নাকি মেয়েদের অভিশাপ লাগে—বিশন্তি শাপভীতা হি ন কুমারবনং স্ত্রিয়ঃ (কথাসরিৎসাগর)। কার্তিকের ওপরে গবেষণা করে অসীমকুমার চ্যাটার্জিমশায় জানিয়েছেন যে, মারাঠী বই শিবলীলামৃতে নাকি লেখা আছে—মেয়েরা কার্তিকের মূর্তি দেখলে সাত-জন্ম বিধবা হয়। আর এখনও নাকি মহীশূর প্রদেশে সন্দুরের কাছে কার্তিক-কুমারস্বামীর মন্দিরে কোন স্ত্রীলোকের ঢোকার অনুমতি নেই।

দেবতাদের যে দৈব-দুর্বিপাকের কথা আগে বলেছিলাম কার্তিকের বিয়ে না হওয়ার মধ্যেও সেই দৈবের গন্ধই পেয়েছেন কবিরা। তাঁরা বলেছেন—যাঁর মা হলেন 'ধরাধরেন্দ্রদুহিতা' পার্বতী, আর বাবা হলেন মহেশ্বর শিব, এমন অসীম ঐশ্বর্যশালী বাপ-মাও তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। আচ্ছা বেশ বাপ-মায়ের কথা ছেড়েই দিন, যাঁর ভাই সিদ্ধিদাতা গণেশ জনে জনে বিঘ্ন বিনাশ করে বেড়ান, তিনিও কার্তিকের বিয়ের ফুল ফোটাতে পারলেন না। যদি বলেন—শিব নিষ্কিঞ্চণ যোগী, টাকা-পয়সা না থাকলে সে ঘরে কেউ বিয়ে দেয় না, তাহলে কবি যুক্তি দেবেন—শিবের টাকা-পয়সা নাই থাকুক, তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হলেন ধনপতি কুবের। এতই কাছে তাঁর বাড়ি যে, এখানে শিব বসে থাকলে তাঁর বাড়ির উঠোনে শিবের মাথার এক ফালি চাঁদের জ্যোৎস্নার ছায়া পড়ে, সেই ধনকুবের বন্ধু থাকতেও কার্তিকের বিয়ে হল না। আর কার্তিক নিজেই কী কিছু কমা লোক। যিনি দেবপক্ষের সেনাপতি হয়ে তারকাসুরের মত শত্রু পাতন করলেন, সেই মহাবীরের বিয়ে হল না। কবিরা বলেছেন—এত ঐশ্বর্যযোগ আর বাপ-মা, ভাই-বন্ধুর এত বড় 'কানেকশন্' থাকতেও যে কার্তিকের বিয়ে হল না, তাকে কপালের দোষ ছাড়া আর কীই বা বলব—তদ্ দুর্দৈববলেন কুত্র ঘটতে নাদ্যাপি পাণিগ্রহঃ।

আরও আধুনিক দুর্দৈব দেখুন। এত যে বললাম—কার্তিকের মন্দিরে মেয়েদের ঢোকা নিষেধ, কার্তিক ব্রহ্মচারী, কার্তিক স্ত্রীমুখ দর্শন করেন না, অথচ দেখুন—কার্তিকের পুজো কারা করেন, জানেন? বেশ্যাপল্লীতে যে রমণীটি প্রথম কুমারীত্ব ভঙ্গ করে বেশ্যার ধর্মে দীক্ষিত হয়, সে কার্তিক পুজো করে তবে তাঁর কর্ম-জগতে প্রবেশ করে। কার্তিকের উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য হল চোরেরা। কার্তিক চোরের দেবতা, কার্তিক পুজো সেরে চোরেরা চুরি করতে বেরোয়। আর এক দল কার্তিক পুজো করেন পুত্র-সন্তানের মানসে। ছোটবেলায় শুনেছি—কার্তিক পুজো করে রাতের আঁধারে বা উষার আলো ফোটার আগে যাঁর বাড়িতে নিশ্চুপে কার্তিক ঠাকুর রেখে আসা হবে, তাঁকে নাকি কার্তিক-পুজো করতেই হবে।

একজন ব্রহ্মচারী, স্ত্রী-মুখ-নিস্পৃহ দেবতার উপাসক-বৃন্দ হলেন গণিকা, চোর এবং সন্তানকামী—এ যেন কেমন বিপরীত লাগে।

বস্তুত কার্তিকের সম্বন্ধে পুরাণে যত গপ্পোই থাকুক যে, ইন্দ্র তাঁর নিজ্রের মেয়ে দেবসেনাকে কার্তিকের রতিতৃপ্তির জন্য বিয়ে দিয়েছিলেন কার্তিকের সঙ্গে, আসলে কিন্তু কার্তিকের কোন বিয়েই হয়নি। মহাভারতের প্রমাণে আমরা পরিষ্কার বলতে পারি ইন্দ্র কার্তিককে তাঁর আপন সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তা নিযুক্ত করে সেই দেবসেনাবাহিনীর সঙ্গে কার্তিকের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। ওইটাই কার্তিকের

বিয়ে। হায়! এই রকম একটা করুণরসের বিয়ে করেও কার্তিকের পরিচয়—তিনি কুমার। পরবর্তীকালে মন্দিরে বিগ্রহ হয়েও তিনি একটি স্ত্রীমুখ দর্শন করতে পারেন না এবং লোকসমাজের নীতিনিয়ম অনুযায়ী রমণীসঙ্গবিরহিত রাজার উপমা দেওয়া হয়েছে—কার্তিক যেমন সদা সর্বদা রমণীসঙ্গ পরিহার করে চলেন, তেমনি আমাদের রাজামশাই—কুমার ইব সর্বদা পরিহৃতাঙ্গনাসঙ্গমঃ। এই যে স্ত্রী-কামনা-রহিত কার্তিকের ব্রহ্মচারী-কল্পনা, যাকে মহাভারতকার উপাধি দিয়েছেন যোগীশ্বর বলে, ধর্মাত্মা-কামজিৎ বলে অথবা পবিত্র-ব্রহ্মচারী বলে—সেই ব্রহ্মচর্যের দীপ্তির মধ্যেই কার্তিকের অতিশায়ী রূপের ধারণা নিহিত আছে বলে আমরা মনে করি। লোকসমাজেও ব্রহ্মচারী পুরুষের রূপ সম্বন্ধে এক বিশেষ কল্পনা করা হয়, কার্তিকের ব্যাপারেও তাই।

অন্যান্য সমস্ত পুরাণ একপাশে ঠেলে দিয়ে একমাত্র ব্রহ্ম পুরাণ খুললে দেখা যাবে যে, একবার, অন্তত একবারের জন্য কার্তিকের মতিভ্রম হয়েছিল। স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত ব্যাপারে 'মিলিটারি' পুরুষের সংযম নিয়ে অতি বড় বন্ধুও খুব ভাল ধারণা পোষণ করে না। তা কার্তিক যখন দেব-শত্রু তারকাসুরকে মেরে ফেললেন, তখন 'মিলিটারি' ছেলের মনের অবস্থা বুঝে মাতা পার্বতীই পুত্রকে বললেন—বাবা! তুমি আমার ইচ্ছায় এবং শিবের প্রসাদে এই পৃথিবীর যত ভোগ আছে—ভোগ কর। মা-বাবার ইচ্ছার মধ্যে সব সময়ই সীমা থাকে, কিন্তু প্রশ্রয় পেয়ে কার্তিক সমস্ত দেব-রমণীদের জোর করে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যেতে থাকলেন এবং তাঁদের ভোগ করতে থাকলেন। দেবপত্নীরাও কম যান না, কার্তিকের মত অসুরজয়ী পুরুষ পেয়ে তাঁরাও রমণে বেশ স্বাদ পেতে লাগলেন—যথাসুখং বলাদ্ রেমে দেবপত্ন্যো'পি রেমিরে। দেবতাদের, মানে যে-দেবতাদের ঘর পুড়েছে, তাঁরা কেউই কার্তিককে আটকাতে পারলেন না বরং অবশেষে নালিশ জানালেন পার্বতীর কাছে। পার্বতীও বার বার বারণ করলেন পুত্রকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! কার্তিকের বদ অভ্যাস তখন চরমে উঠেছে, রমণীসঙ্গ ছাড়া তাঁর চলে না—স্ত্রীষু আসক্তস্তু ষন্মুখঃ।

ছেলে এবং দেবতা—দুপক্ষেরই বিপদ বুঝে পার্বতী ঠিক করলেন—কার্তিক যেই কোন দেবরমণীকে সম্ভোগ করতে যাবে, তখনই সেই রমণীর মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করবেন। ফলে বাসনামাত্রেই কার্তিক রমণীর বদলে নিজের মায়ের রূপ দেখতে পাবে—যস্যাং তু রমতে স্কন্দঃ পার্বতী অপি তাদৃশী। একদিন হল কি, কার্তিক দেবরাজ ইন্দ্র এবং বরুণদের স্ত্রীদের আহ্বান করলেন রতিতৃপ্তির জন্য। কিন্তু যেই না তাঁদের দিকে তাকালেন, অমনি দেখেন—মাতৃমূর্তি পার্বতী। এইভাবে একটা একটা করে সমস্ত স্ত্রীমূর্তি তাঁর কাছে মাতৃমূর্তি হয়ে গেল, অখিল জগৎ তাঁর কাছে মাতৃময় হয়ে ধরা দিল—দৃষ্ট্বা মাতৃময়ং জগৎ। সেই যে কার্তিকের বৈরাগ্য হল, স্ত্রীবিষয়ে সে বৈরাগ্য আর ভাঙেনি। ব্রহ্মপুরাণ একটিবার মাত্র কার্তিককে ধর্মচ্যুত করে তাঁকে আজীবন বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু অন্যত্র সব জায়গায় তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী, শুচি, শান্ত। এই ব্রহ্মচর্য এবং শুচিতার দীপ্তিতেই কার্তিক, রূপে কার্তিক। নইলে আবারও বলছি—কার্তিকের প্রবাদকল্প রূপের পরম্পরা অনুসন্ধানে আমি অন্তত ব্যর্থ। এ ব্যাপারে কোন পৌরাণিক হদিশ আমাকে যদি কেউ দেন, তাহলে আমার এই প্রবন্ধের ভাবনা-যুক্তি আরও দৃঢ় করতে সুযোগ পাব আমি।

॥৩॥

কার্তিককে বাদ দিলে শিব, কৃষ্ণ, বলরাম, লক্ষ্মী, দুর্গা, রাধা—সবারই একটা পরম্পরা পাব, যে পরম্পরা পৌরাণিক আমল থেকে একেবারে লোক-প্রবাদ—প্রায় একই খাতে প্রবহমান। আমরা শিব-শম্ভুকে অবশ্যই প্রথমে ধরব। আজকে যে সংসারবুদ্ধিহীন আপনভোলা মানুষটিকে আমরা ভোলানাথ বলছি এবং শিবকে বলছি 'বোম্ ভোলা'—তার একটা পরম্পরা আছে, এবং সে পরম্পরা এই সেদিনের মঙ্গলকাব্য থেকে আসেনি, এসেছে পুরাণের শ্লোকগুলির মাধ্যমে, এসেছে সহস্র কবির শত ভাবনার মন্থনে। এই প্রবন্ধের আরম্ভে আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আমরা শুধু পুরাণ অথবা রামায়ণ-মহাভারত থেকে দেবতাদের মানুষোচিত বৃত্তিগুলি দেখিয়েই ক্ষান্ত হব না, দেবতাদের নিয়ে নানা সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃত কবির তীব্র রসিকতাগুলিও আমরা উল্লেখ করব। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে শিবকে নিয়ে শাস্ত্রকার, পৌরাণিক, কবি, কবিওয়ালা—সবাই একেবারে পঞ্চমুখ! বস্তুত ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে শিব এমনই এক সর্বাত্মক চরিত্র যে, প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতেই শিব সাদরে, সাড়ম্বরে স্বীকৃত। লৌকিক দেবদেবীর জগতে শিবের মাহাত্ম্যের কথা ছেড়েই দিলাম, ছেড়েই দিলাম শৈব, শাক্ত সম্প্রদায়ে শিবের প্রাধান্যের কথা। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মেও শিব আছেন অন্যতম প্রধান ভূমিকায়। প্রকৃষ্ট বৈষ্ণবের উদাহরণ হিসেবে শিবকেই বেছে নেওয়া হয়েছে অনেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে। বলা হয়েছে—বৈষ্ণবাণাং যথা শম্ভুঃ।

এমন একটি সর্বতন্ত্রসম্মত দেবতাকে নিয়ে প্রাচীন এবং পরবর্তী কবিরা যে যথেষ্ট রসিকতা করেছেন, তার ইন্ধন যুগিয়েছেন বিভিন্ন পুরাণকারেরাই। একথা অবশ্য ঠিক যে, বেদের আমল থেকে আরম্ভ করে একেবারে মঙ্গলকাব্য কি কবিওয়ালার গান পর্যন্ত শিবের যে বিবর্তন ঘটেছে, তাতে তাঁর পরমযোগিত্ব এবং পরমভোগিত্ব—দুটিই চরমভাবে প্রকট। অনেকে শিবের এই 'অ্যাসেটিসিজম্ অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি' নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধও রচনা করেছেন। কিন্তু বহু পুরাতন এই ঈশ্বরের জীবন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যত আলোচনাই হোক না কেন, সমস্ত কিছুর ওপরে আছে এই আশুতোষ দেবতাটির আত্মভোলা সদানন্দ ভাবটি। তিনি যখন তখন অসুর-রাক্ষসকে এমন অসম্ভব বর দিয়ে ফেলেন যে, তাঁর ওই খুশ-মেজাজের ফলে সুরকুলে মহা সংকট উপস্থিত হয়। আবার সেই সংকটমোচনের দায়ও বর্তায় তাঁরই ওপর, যদিও তিনি আত্মভোলা ভাবেই সে সংকট মোচন করেন। যে-শিব বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি দেখে রেতঃস্খলন করতে করতে রমণীর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন, সেই শিবই অন্যকালে পর্যঙ্কবন্ধন করে যোগাসনে বসেন—তাঁর যোগাগ্নিতে কাম দগ্ধ হয়। যে-শিব দেবতাদের বিপদ মুক্ত করতে বিষপান করে নীলকণ্ঠ হন, সেই শিব শ্বশুরবাড়িতে সামান্য নেমন্তন্ন না পেয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন, আবার অপার ভালবাসায় পত্নীর মৃতদেহ কাঁধে করে পাগলের মত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান। তাঁর নির্মোহ তপস্যা আরম্ভ হলে সে তপস্যা ভাঙানো যেমন কঠিন, তেমন, পার্বতীর সঙ্গরঙ্গে রতিক্রীড়া আরম্ভ হলে তার জেরও চলে কমপক্ষে হাজার বছর। এই আপাতবিরোধিতার ফলেই কখনও তাঁর পরম-রমণীয় নটরাজ মূর্তি দেখি, আবার কখনও বা ভুঁড়ি-ভাসানো থপথপে বুড়ো-মার্কা সরল সদাশিব মানুষটি দেখি। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়—তিনি অতুল

সম্পদের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভিখারি। শাস্ত্রে পুরাণে বর্ণিত শিবের এই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখলে পরে মানুষ হিসেবে কবিদের রসিকতাগুলি অর্থপর হয়ে উঠবে।

পৌরাণিক মিথ অনুসারে ভগীরথ যখন আপন তপস্যায় গঙ্গাকে পৃথিবীবাহিনী করেন, তখন সুরনদী গঙ্গাকে জটাজুটে ধারণ করে শিব ভগীরথের তপঃশ্রম সার্থক করেন। কিন্তু এ বাবদে কবিদের রসিকতা কিন্তু অন্যরকম। কবির ধারণা—শিব যে তাঁর মাথায় গঙ্গার জলধারা ধারণ করে আছেন, তার কারণ হল শিবের সারা অঙ্গ সব সময় জ্বলছে। সাধারণত আমাদের গরম লাগলে বা শরীরে জ্বালা করলে আমরা স্নান করি, কিংবা ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালি। কবি মনে করেন—শিবের গাও সব সময় জ্বলছে। একদিকে অত্যুগ্র সমুদ্রমন্থন বিষ পান করে তাঁর গলা পুড়েছে, অন্যদিকে বিষাক্ত সাপের নিঃশ্বাসে শিবের সারা গা জ্বলছে। তার ওপরে তাঁর নিজের কপালে আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি করে। চারদিক দিয়ে এই অবিরাম জ্বালা-পোড়া খানিকটা কম রাখার জন্যই গঙ্গাধর শিব গঙ্গাকে আর মাথা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সাহস পান না—ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গাম্ উত্তমাঙ্গান্ন মুঞ্চতি।

এই কবি যদিও বা শিবের মাথায়-থাকা সুরনদী গঙ্গার চিরবাসের একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু অন্য কবির দৃষ্টিতে এই গঙ্গার কারণেই শিবের সাংসারিক শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, দাম্পত্যকলহও একেবারে স্থায়ী হয়ে গেছে একই কারণে। আমরা যেমন মেনিমুখো পুরুষকে গালাগালি দিয়ে বলি—বউকে তো একেবারে মাথায় করে রেখেছ—তেমনি ষষ্ঠ/সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের এক বিখ্যাত নাট্যকার তাঁর নাটকের আরম্ভেই পার্বতীর মুখে শিবের ওপর বিশ্বাসহননের দায় আরোপ করে একই কথা বলেছেন। পার্বতী বললেন—কে ওই ধন্যি মেয়ে যাকে অমন মাথায় করে রেখেছ? পৌরাণিক প্রয়োজনেই গঙ্গাধর শিব গঙ্গাকে মাথায় রেখেছেন, কিন্তু মানুষ কবি গঙ্গার মধ্যে উপপত্নীর কল্পনা এনে পার্বতীর প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন শিবের উদ্দেশ্যে। এমন অবস্থায় শিবও কোন পুরাণকথা শোনান না। 'ধন্যি' শব্দটির মধ্যে যেন কোন বিশেষ ইঙ্গিতই নেই—এমন একটা ভাব করে শিব ন্যাকা সেজে বললেন—কেন! কাকে আবার মাথায় করে রেখেছি? ওটা তো শশিকলা।

পার্বতী—বলি, শশিকলা কি ওই মেয়ের নাম?

শিব—হ্যাঁ, ওটাই তার নাম। আর এই শশিকলা তো তোমার অপরিচিত কেউ নয়, এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে? শিবের দিক থেকে এইরকম এড়িয়ে যাওয়ার বুদ্ধি দেখে পার্বতী ভাবলেন—এই বুঝি চলতে থাকবে। তিনি এবার স্পষ্ট কথায় জবাব চেয়ে বললেন—বলি, ওই মেয়েছেলেটা কে? আমি তোমার মাথায় ওই চাঁদের কলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, বরং যে মেয়েছেলেটাকে মাথায় করে রেখেছ, সেইটা কে তাই বল—নারীং পৃচ্ছামি নেন্দুম্। শিব মহাবিপদে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত পার্বতীর সখী বিজয়াকে সাক্ষী মেনে বললেন—তাহলে বিজয়াই বলুক। তুমি যদি আমার কথায় বিশ্বাসই না কর, তাহলে তোমার সখীই বলুক।

শিব-শিবানীর এই দাম্পত্যকলহ কোনদিকে মোড় নিয়েছিল, সে কথা মুদ্রারাক্ষসের কবি লেখেননি, তবে শিবের দিক থেকে সুরনদী গঙ্গাকে লুকিয়ে ফেলার এই যে চেষ্টা, পার্বতীর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার মত শিবের এই যে

শঠতা—এই শঠতারই স্তুতি করেছেন কবি, কারণ মুদ্রারাক্ষস নাটকের পরিসরে চাণক্যের শঠতা নিয়েই তাঁকে নাটক রচনা করতে হবে। মুদ্রারাক্ষসের কবি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিবের শঠতাটুকু আহরণ করেই নাটকের নান্দীপাঠ করলেন বটে, কিন্তু শেষ প্রশ্নের উত্তর আমরা পেলাম না। শিবের জটাজূটের মধ্যে স্ফুরিতধারা গঙ্গার মধ্যে পার্বতী যে স্ফুরিতাধরা সপত্নীর আভাস পেয়েছেন—লোকসমাজে সে কল্পনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে সতীন হিসেবে গঙ্গার প্রতিপত্তি তেমন বেশি নেই, কারণ পার্বতীর ক্ষমতা অনেক বেশি। পার্বতীর তুলনায় গঙ্গার সামাজিক এবং সাংসারিক প্রতিষ্ঠা কম বলেই আমাদের রাজকুমার ন্যায়রত্ন অসাধারণ একটি কবিতা লিখেছিলেন। কালীঘাটে যে গঙ্গা বয়ে চলেছে, প্রাকৃতিক কারণে এবং সংস্কারের অভাবে সে গঙ্গা এমনিই নোংরা এবং ক্ষীণধারা। কিন্তু ন্যায়রত্নমশাই টিপ্পনী করেছেন—কলিকালের কালীঘাটে কালীর অনেক বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। লোকে যেমন এখানে টাকা-পয়সার প্রণামী দিচ্ছে, তেমনি মানত করে একবার সোনার জিব গড়িয়ে দিচ্ছে কালীর আবার নোলক গড়িয়ে দিচ্ছে নাকে, আরও কত কি! সতীনের ঘর টাকা-পয়সায় এবং শ্রদ্ধায় ফুলে ফেঁপে উঠছে দেখে হিংসায়, অপমানে গঙ্গা মলিন (নোংরা) এবং রোগা (ক্ষীণজলধারা) হয়ে গেছেন কালীঘাটে—সপত্নীবিভবং দৃষ্ট্বা গঙ্গাভূন্মলিনা কৃশা।

গঙ্গা যত রোগাই হোন কিংবা যতই গৌণা, শিবের সংসার তাতে কোনমতেই সুখের হয়নি। অশান্তিময় সংসারচক্র সব মানুষকেই গ্রাস করে, সেখানে কৃষ্ণ-বিষ্ণু থেকে আরম্ভ করে শিবের সংসারেও যে গভীর অশান্তি থাকবে—তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। কবিরাও সেটা বারবার বলেছেন। এক কবির মতে তো শিবের স্ত্রীভাগ্য এবং পুত্রভাগ্য—দুইই খুব খারাপ। এক বউ যুদ্ধবাজ রণচণ্ডী, আরেক জনের গতি কেবল নীচের দিকে। বুঝতেই পারছেন একজন দুর্গা, অন্যজন নিম্ন ভূতলগামিনী গঙ্গা—একা ভার্যা সমররসিকা নিম্নগাচ দ্বিতীয়া। ছেলেগুলোই বা কি? বড় ছেলেটা যেমন বিটকেল দেখতে, ছোটটাও তেমনি। বড়টার দেহে হাতির মাথা, ছোটজনের আবার ছটা মাথা। ঘরের চাকরবাকর নন্দী-ভৃঙ্গী—দেখতে ঠিক বাঁদরের মত। ব্রহ্মার হংস কিংবা বিষ্ণুর গরুড়ের মত একটা ভদ্রস্থ বাহনও তাঁর জোটেনি। নিষ্কর্মা, সারাদিন জাবরকাটা একটা ষাঁড় তাঁর বাহন, যাকে লোকে বলে শিবের ষাঁড়। কবির ধারণা—আপন গৃহের এই বিচিত্র চরিত্র এবং ততোধিক বিচিত্র চেহারাগুলি দেখেই শিব শেষ পর্যন্ত গায়ে ছাই মেখে যোগী হয়েছেন—স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ। কথায় যেমন বলে ঠেলার নাম বাবাজি, শিবও সেইরকম সংসারের ঠেলায় ছাই মেখে যোগী হয়েছেন।

পৌরাণিকদের নানা কল্প-কাহিনী, দেবতাদের নানা লোকোত্তর কাণ্ডকারখানার ফলে শিব কখনও হলাহল পান করেছেন, কখনও শ্মশানবাসী হয়েছেন, কখনও ভস্ম গায়ে মেখেছেন আবার কখনও বা দিগম্বর হয়েছেন। কিন্তু কবিদের কল্পলোকে শিবের বিষ খাওয়া অথবা শ্মশানবাসী হওয়ার কারণ একান্তভাবেই লৌকিক এবং মনুষ্যোচিত। এর ফলে পৌরাণিক দৈব ঘটনার চেয়েও অবিকল্পে আমরা মুগ্ধ হই বেশি। কারণ তাতে শিবের মত ত্রিগুণাতীত বিরাট দেবতাটিও সাধারণ মনুষ্য-লক্ষণে আক্রান্ত হন। আর্থিক কষ্টে, সংসারের চাপে মানুষ যেমন কখনও বিষ খায়, চারিত্রিক বা বংশগত

কলঙ্ক চাপা দেওয়ার জন্য মানুষ যেমন ঘর ছেড়ে মনের দুঃখে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি দেবাদিদেব শংকরের জীবনেও ঠিক একই রকম কারণগুলি ঘটায় কবিদের কল্পলোকে শিবকে আমরা আরও আপন করে পাই। কবির কল্পনায় পার্বতীর বাহন সিংহের ভয়ে শিবের বাহন বুড়ো ষাঁড় কোনদিন তার মালিকের ধারেকাছে থাকে না, প্রতিদিনই একবার পালায়—বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতিদিনম্। ছেলে কার্তিকের ময়ূর দেখে শিবের অঙ্গভূষণ সাপগুলি ভয়ে চঞ্চল হয়ে গায়ের মধ্যে কুটিলগতিতে এদিক ওদিক করে। গণেশের ক্ষুদ্র ইঁদুরটি পর্যন্ত তাঁকে ছাড়ে না, রাত্রিবেলায় ভিক্ষার ঝুলিতে অবশিষ্ট চালের রসদ খুঁজতে গিয়ে সে কৃত্তিবাস শিবের কৃত্তিবসন কুট্‌কুট্ করে কেটে দেয়।

এত সব দেখে কবির মনে হয়েছে—শিব এমনি এমনিই সাধ করে দিগম্বর হননি, সংসারের চাপই তাঁকে ন্যাংটো করে ছেড়েছে। ছেলে, বউ—এত সব আপনজনের চাপে প্রতিনিয়ত হেনস্থা হওয়ার থেকে তিনি সমুদ্রজাত বিষপান করে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন—দুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরঃ হালাহলং পীতবান্। আসলে সমস্ত দেবচরিত্রের মধ্যে মহাদেবই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে চিরকাল বড় বঞ্চিত বলে মনে হয়। দেব-সমাজের জন্য তিনি করেছেন অনেক, কিন্তু পাননি কিছুই। সমুদ্রমন্থনে অনেকেরই অনেক লাভ হয়েছে, কিন্তু দেবদেব মহাদেব যা করেছেন তার বদলে তাঁর শূন্যটি জুটেছে। কৌস্তুভ-মণির মত বিশাল একটি রত্ন গলায় ঝুলিয়ে স্বয়ং বিষ্ণু লক্ষ্মীর মত সুন্দরীকেও বক্ষ-লগ্না করে নিয়েছিলেন। এদিকে দেবরাজ—ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবার মত হাতী-ঘোড়া বাগিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, অন্যান্য মহার্ঘ্য বস্তুর মধ্যে বিশাল নন্দন-কাননও তাঁর একটা বড় পাওনা। অন্যদিকে শিবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষপান করেও তাঁর ভাগ্যে স্বর্গীয় পারিজাত ফুলের একটি ছোট্ট তোড়াও জোটেনি।

এর কারণ পৌরাণিকেরা হিসেব না করলেও, পরবর্তী কবিরা মহাদেবের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। এমনকি মনস্তত্ত্বের কথাটাও এখানে বিচার করেছেন অত্যন্ত আধুনিকভাবে। দেখুন, আমাদের সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ আছে। তার ওপরে সমাজে যাঁরা কেতা-দুরস্ত পোষাক-পরিচ্ছেদে অত্যন্ত রুচিশীল—আমরা তাদেরই বেশি পছন্দ করি। কিন্তু অতি-পরিচিত নিজের লোক যখন শুধু গরীব বলে, জামা-কাপড়ের চাকচিক্য নেই বলে অথবা শুধু 'স্মার্টনেস' নেই বলে উপযুক্ত মর্যাদা বা প্রাপ্য বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়, তখন আমরা হা-হুতাশ করে দাতা বা কর্তৃপক্ষকে দুষেও থাকি। মুখে বলিও যে, শুধু আলগা চটক দেখে ভুললে, একটু গভীরে তলিয়ে দেখলে না। ঠিক এই ব্যাপারটা মহাদেবের প্রসঙ্গেও এসেছে।

সংস্কৃত কবিতার জগতে সমুদ্র মন্থন করেই যেহেতু নানা মহার্ঘ্য জিনিস উঠেছিল, তাই রত্নাকর সিন্ধুকেই এই সমস্ত বস্তুর জনক বা দাতা বলা হয়। এই সূত্র ধরে কবি বলেছেন—দেখ বাপু! যারা ভাবছে, বুদ্ধি আছে, মগজ আছে, অতএব জামা-কাপড়ের পরিপাটি করে কী হবে—তারা কিন্তু ভুল করছে। কবি সেই কত কাল আগেই খেদ করে বলেছেন—জামা-কাপড়ই আসল বাপু! জামাকাপড়ই আসল। জামা-কাপড়ই এখন যোগ্যতার মাপকাঠি। দেখ না, এই রত্নাকর সমুদ্র, তিনি পীতাম্বর বিষ্ণুর ঢঙ-ঢাঙ্ আর হলুদ কাপড়ের পরিপাটি দেখে তাঁর হাতে ত্রিভুবনের সেরা সুন্দরী

নিজের মেয়ে লক্ষ্মীকে তুলে দিলেন, আর পশুর চামড়া-পরা মহাদেবের বোম-ভোলা রকম-সকম দেখে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বিষ—পীতাম্বরং বীক্ষ্য দদৌ স্বকন্যাং চর্মাম্বরং বীক্ষ্য বিষং সমুদ্রঃ।

দেখুন, পুরাণকাহিনীতে পৌরাণিক কারণেই শিব দিগম্বর হয়েছিলেন, দেবতাদের প্রয়োজনেই তিনি বিষপান করেছিলেন। কিন্তু এই যে সংসার সমরাঙ্গনে স্ত্রী-পুত্রের চাপে নিরীহ কর্তাবাবুটির মত কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন—শিবের এই কল্পনা অনেক সাধারণ সংসারের সঙ্গেই মিলে যাবে। মজা হল, এই সংসার-যাতনার চিত্রটুকু শুধুমাত্র দেবতার বাহনগুলির রেখায় অপূর্ব ব্যঞ্জনায় এঁকে ফেলেছেন কবি। ঠিক যেমন আরেক কবির বাহনের কল্পনাতেই শিব শেষ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের হাতে-গড়া মাটির মূর্তিতে ধরা দিয়েছেন। এই কবিতায়—শিবের গায়ে জড়ানো সাপ সব সময় চায় গণেশের ইঁদুরটিকে খেয়ে ফেলতে, আর সাপটাকে খেতে চায় কার্তিকের ময়ূর। দেবীর বাহন সিংহ আবার আরেক কাঠি সরেস। সে শুধু গণেশের মাথায় জোড়া-দেওয়া হাতির মাথাটুকু মুড়মুড়িয়ে খেতে চায়—সিংহোऽপি নাগাননম্। ওদিকে শিবের স্ত্রী পার্বতী নিরন্তর হিংসে করে যাচ্ছেন গঙ্গাকে। শিবের কপালের আগুন—সেও কিছু কম যায় না। সে সব সময় চায়—শিবের মাথায় আটকানো প্রতিপদের চাঁদের দীপ্তিটুকু শুষে নিতে। এইভাবে পরস্পরবিরোধী কতগুলি জীবজন্তু এবং ততোধিক বিরোধী জীবন যাপনের গ্লানিতে শিব শেষ পর্যন্ত সংসার-বিরাগী যোগী হয়ে গেলেন। মনে রাখতে হবে শিব কিন্তু এমনিতেই নির্গুণ, নির্বিঘ্ন, বীতরাগ, কিন্তু মানুষের বেশির ভাগ সময় মানুষের যেহেতু সংসারের ঠেলায় বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, কবির মতে শিবের বৈরাগ্যও সংসারের ঠ্যালাতেই। শুধু তাই নয়, মেয়েরা যে মাটির শিব গড়ে পুজো করে, সেই মাটির মানুষটি হয়ে যাবার পেছনেও কারণ নাকি ওই সংসারের ঠেলা অর্থাৎ সংসারের সমস্ত অভিযোগ-উপরোধে। বাড়ির কর্তাবাবু যেমন মাটির ঢেলার মত কানে তুলো গুঁজে বসে থাকেন, শিবও তেমনি মৃন্ময় রূপ ধারণ করেছেন—নির্বিঘ্নঃ স শিবঃ কুটুম্বকলহাৎ মূর্ত্তিং দধৌ মৃন্ময়ীম্।

এই যে শিব মৃন্ময় হয়ে মাটির মানুষের কাছাকাছি এসে পড়লেন, তাতে মধ্যযুগীয় একটি সংসারের বুড়ো কর্তার সঙ্গে তাঁর উপমা এসে পড়ে আরও সযৌক্তিকভাবে। সেকালে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর বয়স অনেক ক্ষেত্রেই কম হত। তবে স্বামীটি বয়সে যত বড়ই হোন না কেন দু-তিনটি ছেলেপুলে হওয়ার পরেই স্ত্রীর বয়স যেমন একটু বাড়ত তেমনি সংসার-যুদ্ধে তিনি আস্তে আস্তে সিংহবাহিনী হয়ে উঠতেন। তাঁর সংসার সামলানোর দাপটে এবং হুংকারে বয়স্ক কর্তাবাবুর পালিয়ে গিয়েও শান্তি হত না। শান্তি হত না, কারণ অমন সহস্রবার বিদায় নিয়ে সহস্রবার ফিরে আসার ফলে স্ত্রীর জিহ্বা আরও খরতর হত। তবে এই সব কিছুরই পেছনে সাধারণ সংসারে আর্থিক অনটনই যে কারণ—সে কথা কবিরা ভালই বুঝতেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর তুমুল ঝগড়ার মধ্যে কারোরই কিন্তু সেই আর্থিক অনটনের কথা মনে থাকে না, ঝগড়া চলে এবং বেড়ে চলে আরও ঝগড়ার সূত্র ধরে। শিবরূপী স্বামীরা এসে বলেন—প্রতিদিন এত টাকাপয়সা আনি—"সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই।"

শিবের ধারণা—স্বামী হিসেবে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং যথেষ্ট পয়সাও আনেন। কিন্তু এমনই তাঁর সংসার যে, এতকাল এত টাকা-পয়সা এনেও তিনি নিজের

বাঘছালটি পালটে একটি ভাল কাপড় পর্যন্ত পরতে পেলেন না। এমন অবস্থায় সমস্ত ক্ষুব্ধ স্বামীর ক্রোধ গিয়ে পড়ে স্ত্রীর ওপর, যেমন শিবেরও পড়ল—

> বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
> গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
> সর্বদা কোন্দল বাজে কথায় কথায়।
> রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥ ভারতচন্দ্র

শুধু দোষ চাপিয়েই নয়; প্রত্যেক স্বামী এবং প্রত্যেক স্ত্রীই যেমন ভাবেন—অন্য দম্পতিরা সবাই কিই না সুখে আছেন এবং বিশ্বসংসারে শুধু তারাই সবচেয়ে খারাপ বউ বা বরটি পেয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবেই শিব বললেন—

> আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
> কতমতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥
> অনির্বাহে নির্বাহ করয়ে কত দায়।
> আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥

শিবের এই আক্ষেপ থেকে অন্নপূর্ণা উমার সতী নামে কলঙ্ক হল কিনা জানি না, কিন্তু সাধারণ সংসারে যারা শিবের মত পয়সা উপায় করতে পারে না, তাদের গৃহিণীদের মুখঝামটা খেতেই হয়। আমরা ভাবি—যিনি পরম ঈশ্বরের গৃহিণী, তিনি না হয় দাম্পত্য অভ্যাসে দুটো কথা স্বামীকে বলেইছেন, তাই বলে কবিরা, মানে ভারতচন্দ্র আর কতটুকু বলেছেন, সংস্কৃতের কবিরা শিবের আর্থিক অবস্থা চরম বিন্দুতে নিয়ে গেছেন। সবাই জানেন—শিব যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তা প্রধানত পার্বতীর প্রেমে। দু-একটি পুরাণে অন্য কথা যাই থাকুক, মহাদেবের প্রেমে পার্বতীর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি আর পৃথক সত্তা না রেখে স্বামীর শরীরে খানিকটা মিশে যেতে চাইলেন। অনন্য পত্নী-প্রেমে শিব শিবানীকে অর্ধ অঙ্গে ধারণ করলেন। সেই থেকে শিব অর্ধনারীশ্বর।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে অর্ধেক শিব, আর অর্ধেক পার্বতী। পুরাণ কিংবা স্থাপত্যশিল্পের এই অসাধারণ কল্পনাটিকে পরবর্তী কবিরা কিন্তু অন্যতর মাত্রায় রূপায়িত করেছেন। কবি বিশ্বাস করেন— শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি-ভাবনায় যত মাহাত্ম্যই দেখা যাক, আর শিব যতই ঐশ্বর্যের পরিচয় দিন পার্বতীকে আত্মসাৎ করে—আসলে এরও পেছনে আছে দারিদ্র্য। কবি লিখেছেন—সংসার ভূমিতে শিবের মত দেবতার পক্ষে নিজের পেট এবং স্ত্রীর পেট—দুটো পেট ভরানো কঠিন ছিল। সেই কারণেই শিব তাঁর একই অঙ্গে ঢুকিয়ে নিয়েছেন নিজের স্ত্রীকে—উদরদ্বয়ভরণভয়াৎ অর্ধাঙ্গাহিতদারঃ। ভাবটা এই—সাধারণ গরিব মানুষও—যারা দিনান্তে এক থালায় ভাগাভাগি করে ভাত খায়—উপায় থাকলে তারাও নিজের পেটের মধ্যে প্রিয়া পত্নীর পেটটি ঢুকিয়ে নিয়ে খাওয়ার ভাবনা কমাত। নেহাত শিবের দেবতা হওয়ায় বাস্তব কিছু সুবিধে আছে, তাই নিজের পেট আর স্ত্রীর পেট এক করে নিয়েছেন। কিছু সকরুণ কবি এইখানেই থামেননি। তিনি মনে করেন—শিবের সংসারে তাঁর নিজের স্ত্রীকে যেখানে উদর-সম্পূরণের জন্য স্বামীর পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে হচ্ছে, সেখানে তাঁর একটা

ছেলে কার্তিক আর বিয়ে করবেন কি করে ? অর্থাৎ শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করার পেছনে যদি উদরভরণের ভয়টাই না কাজ করে থাকে তাহলে, কার্তিক কি আজও বিয়ে না করে আইবুড়ো থাকেন—যদি নৈবং তস্যৈকসুতঃ কথমদ্যাপি কুমারঃ।

আসলে যে ঈশ্বর সমস্ত জাগতিক ধনসম্পত্তির বীজভূত বলে ইতিহাস-পুরাণে বর্ণিত, সেই পুরাণই তাঁকে ভিখারি বানিয়ে ফেলায় কবিরা শিবের সংসারে নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনধারণের গ্লানিগুলি দেখতে পেয়েছেন। বস্তুত প্রথম থেকেই শিবের কল্পনাটা এই রকম। বঞ্চনা, দারিদ্র্য, দৈনন্দিন গ্লানি—শিবের সবই সাধারণ মানুষের আদলে। শিবের জীবনও আরম্ভ হয়েছে বড় ছন্নছাড়াভাবে। তার ওপরে আবার এই জটাধারী সন্ন্যিসি মানুষের বিয়ে করার শখও আছে। সমস্ত নরলীল দেবতা, যাঁরা স্বর্গে সিংহাসনে বসে উর্বশী-রম্ভা সহযোগে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের টাকা-পয়সাও যেমন, পরিচয়ও তেমন, ঐশ্বরিক ক্ষমতাও তেমনি। কিন্তু এই শিবের কোন পিতৃপরিচয় নেই, ধনসম্পত্তি নেই, কিছুই নেই। ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাঁরা শিবের বিয়ে নিয়ে দু-চার কথা বলেছেন, তাঁরা নিশ্চয় জানতেন যে, খোদ পুরাণের মধ্যেই পার্বতীর মা মেনকা কপাল চাপড়ে বলছেন—হতচ্ছাড়ী মেয়ে আমার ! কি বর পছন্দ করেছে, দেখ সবাই—বরশ্চ কীদৃশো লোকে লব্ধশ্চ দুষ্টয়া পুনঃ। ওর বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, এমন কি সাত কুলে কেউ নেই—ন চ গোত্রজঃ। চেহারা বল, বুদ্ধি বল, ঘর-বাড়ি, কাপড়চোপড়, গয়না-গাঁটি কিছু নেই। এমনকি একটা ভাল বাহন পর্যন্ত নেই। তাও যদি বুঝতাম বয়স থাকত, টাকা-পয়সা থাকত, তাও নেই—ন বয়ো ন ধনং তথা। কি দেখে আমি মেয়ের বিয়ে দেব এই ছেলের সঙ্গে—কিং বিলোক্য ময়া পুত্রী দীয়তে, কিং করোম্যহম্।

মেয়ের মায়েদের এসব জ্বালা চিরকালই আছে বোঝা যাচ্ছে। মেয়ে নিজে নিজে প্রেম করে বিয়ে করতে চাইলে, সে পাত্র যদি বুড়ো হয়, নির্গুণ হয় কিংবা তার যদি পয়সা-কড়ির স্বাচ্ছন্দ্য না থাকে, তাহলে মায়ের হৃদয়ে যে কি হয় তা যে-কোন জননীমাত্রই জানেন। শিবপুরাণে হিমালয়-গৃহিণী যে-কোন ক্ষুব্ধা জননীর মতই মেয়েকে বললেন—ওরে আবাগীর বেটী ! তোকে আমি বিষ খাইয়ে মারব অথবা কেটেই ফেলব অথবা ভাসিয়ে দেব সাগরের জলে—গরং দদামি তাং পুত্রীং ... সাগরে বা ক্ষিপাম্যহম্। মায়ের বিলাপ এমনি ধারা চলতে থাকল। কিন্তু অপাত্রে প্রেম করে বিয়ে করার গোঁ ধরেছে যে মেয়ে, মায়ের বিলাপ তার কানে ঢোকে না। সে জোর করেই বিয়ে করতে চায়, যেমন পার্বতীও চাইলেন।

এরই মধ্যে দ্বিজ কালিদাসের শিব আজকের দিনের রকবাজ মাস্তানের মত উপস্থিত হয়েছেন ভাবী শ্বশুরের কাছে। তিনি যেন হাতে খৈনী টিপতে টিপতে রীতিমত রসিকতা করে শ্বশুরকে বলছেন—

দেখে তব গৌরী কন্যে জামাই হবার জন্যে
তব পুরে হৈল আগমন।
কথা শুনে হিমালয় আর রাগে অঙ্গ দয়
অতিশয় কোপেতে কম্পয় ॥

রাগের চোটে হিমালয় দিশেহারা হয়ে যান—

কোপে কহে কিঙ্করেরে মুষ্টি-ভিক্ষা দিএ এরে
ধাক্কা মেরে করহ নির্গত।

শিবও কিছু কম যান না। ভাবী শ্বশুরের রাগ দেখে তিনি আরও রসিক হয়ে ওঠেন। ভিক্ষার চেয়ে গৃহস্থের মেয়েটিই তার বেশি পছন্দ। অতএব—

হেসে বলে ত্রিপুরারি কিবা ভিক্ষা দিবে গিরি
অন্য ভিক্ষা উপজীবী নই।
যদি হও পুণ্যবান কন্যারত্ন কর দান
মর্ম্মদুঃখে শাম্য তবে হই।

শিবের উত্তর শুনে বাবা হিমালয়ের মনে যেমন রাগ হল তেমনি বোধ হয় একটু সন্দেহও হল। তাঁর মনে হল—এর মধ্যে মেয়ে উমাও নিশ্চয় জড়িত, নইলে এত জোর আসে কোত্থেকে? যাই হোক, মেয়ের সঙ্গে তিনি পরে বুঝে নেবেন। এখন দুরন্ত ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন—

বলে বেটা এত জোর এক চড় মেরে তোর
কাঁথা বাঘছাল কেড়ে লব।

বাস্তব জগতে দেখি— স্বয়ং মেয়ে যদি তার প্রেমিকের ওপর সব আস্থা রাখে এবং তার প্রেম যদি অবিচল থাকে, তাহলে ভাবী শ্বশুর প্রথমে যতই গালাগালি দিন, জামাই মেজাজ সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা রেখে রসিক হয়ে উঠতে পারে—

হাসি বলে ত্রিপুরারি শুন শুন শুন গিরি
কাঁথা ঝুলি সব তুমি লয়।
ইহা আমি নাহি চাই কেবল হব জামাই
মম বামে গৌরীরে বসায় ॥

পুরাণগুলিতে বিয়ের আগে শিব এত রসিকতা করতে পারেননি বটে, কিন্তু তাঁর সপক্ষে যে প্রেমিকার জোর ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। গিরিপত্নী মেনকার রাগ যত চড়তে থাকল, বিষ্ণু ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতারা তাঁকে তখন শিবের মর্যাদা, ক্ষমতা এবং অলৌকিকতা সম্বন্ধে তত বোঝাতে থাকলেন, ঠিক যেমন আজও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা প্রেমিক-প্রমিকার অবিচল ভাব দেখে বর হিসেবে এবং কনে হিসেবে তাদের নিজস্ব গুণ এবং শক্তি সম্বন্ধে ইতিবাচকভাবে সিদ্ধান্তে আসেন বা সেইমত মা-বাবাকে বোঝান। পুরাণগুলিতে শিবের ঐশী শক্তি, মাহাত্ম্য এবং মর্যাদা খানিকটা সুবিধে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু খোদ পুরাণেই গিরিপত্নী যতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তার সূত্র ধরেই কবিরা তাঁকে এমন ছন্নছাড়া করে বিয়ে দিয়েছেন যে, এমনটি আর হয়নি, হবেও না।

শিব বিয়ে করতে এসেছেন আর সংস্কৃতের কবি লিখছেন যে, বিয়ের আসরে, কন্যাপক্ষের কোন বয়োবৃদ্ধ মানুষ শিবকে নিজের প্রয়োজনে এবং আনুষ্ঠানিক

প্রয়োজনে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন— তা বাবাজির গোত্র কি ? কি করা হয় ? টাকা-পয়সার গোছ কি রকম ? বংশ পরিচয় কি ? বয়স কত ? পড়াশুনো কত দূর ? মাথা গোঁজার জন্য একটা বাড়িটাড়ি আছে তো ? তোমার বন্ধুবান্ধব কারা ? জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে কে কে আছেন ? মা-বাবা—তাঁদের পরিচয়ই বা কি ?

আমরা জানি— আজ থেকে যাঁরা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেরও বিয়ে করেছেন, সেই সব বর-বেচারাদের এসব প্রশ্ন শুনতেই হত। এখনও হয়, তবে একটু মার্জিতভাবে। শিবকেও তাই শুনতে হয়েছে। কবি লিখেছেন— এসব প্রশ্ন শুনে ছন্নছাড়া শিবের মনে ভারি কষ্ট হল, কারণ এসব প্রশ্নের সদুত্তর তাঁর কাছে ছিল না। নিরুত্তর শিব শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করেছিলেন বটে, তবে কবির ধারণা— সেই যে অপ্রস্তুত হয়ে তিনি লোকালয় ছেড়ে শ্মশানে বাস করা আরম্ভ করলেন, আর তাঁর বাড়ি ফেরা হয়নি— মালিন্যেন হৃদঃ স্বকীয়ভবনং তক্ত্বা শ্মশানে স্থিতঃ।

ভাবুন একবার ! শিব শ্মশানবাসী ঠিকই। কিন্তু শ্মশানবাসের কারণ হিসেবে কবি যা বললেন— তা একেবারে মনুষ্যলোকের অভিসন্ধিতে ভরা। চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে মানসিক নির্বেদ উপস্থিত হলেই মানুষ দু-একবার শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়। শিবের শ্মশানবাসের পেছনেও যে নিতান্ত সেই মানুষের মনস্তত্ত্বই কাজ করেছে— এ ধারণাটা সংস্কৃত কবির স্বকপোলকল্পিত রসবৈচিত্র্য হলেও খোদ পুরাণকারেরাই যে তার সূত্র করে দিয়েছেন— তা আমরা শিবপুরাণে মা মেনকার ক্রোধোক্তি থেকেই বুঝতে পারি।

শিবের বিয়ের সময়, অনুরূপ আরেকটি শ্লোকে স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাকে তো রীতিমত মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। শিব বিয়ের সাজে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। যজ্ঞ-টজ্ঞ হচ্ছে, কন্যাপক্ষের পুরোহিত মন্ত্র পড়তে পড়তে শিবকে বললেন— বাবাজি ! এবার তোমার পিতৃ-পিতামহের নাম বল। প্রশ্নটা শুনেই শিব লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলেন— নতমুখকমলো জাতলজ্জো বভূব— তাঁর বলার কিছুই নেই। ব্রহ্মা দেখলেন—শিব সবার সামনে অপ্রতিভ হয়ে কোন কথাই বলতে পারছেন না। ব্রহ্মা সমস্ত দেবকুলের দাদু বলে কথা, বিশেষত তিনি শিবের বিয়েতে বরযাত্রী এসেছেন, শিবের বিপদ তো তাঁকে দেখতেই হবে। তাছাড়া বিয়ের সময় বয়োবৃদ্ধ বরকর্তা হিসেবে তিনি বরের হয়ে উত্তর দিতেই পারেন। ব্রহ্মা তাই বেশ বুদ্ধি করে কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে বললেন— শুনুন তাহলে। ওর প্রপিতামহের নাম বেদকণ্ঠ, পিতামহ হলেন গিয়ে উগ্রকণ্ঠ, পিতার নাম শ্রীকণ্ঠ আর ওর নিজের নাম নীলকণ্ঠ।

লক্ষণীয়, ব্রহ্মা যে হরকুলের পিতৃ-পিতামহের নাম করলেন, তা একেবারেই দেবকুলের মত নয়, বরঞ্চ পুরোপুরি মনুষ্যলোকের মত। 'কণ্ঠ' শব্দটা শিবের প্রত্যেকটি আদি নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বেশি করে যেন মানুষের গন্ধ পাওয়া যায়, কেননা আমাদের মধ্যে বাপ-পিতামহের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে নাম রাখাটা অনেক ক্ষেত্রেই প্রথা। ব্রহ্মাও তাই মনুষ্যনামের প্রথায় নীলকণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শিবের বাপ-ঠাকুর্দার নাম বলে গেলেন। কিন্তু যা বলছিলাম— চতুর্মুখ ব্রহ্মার যে মুখগুলি সমস্ত বেদমন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করে চিরশুদ্ধ হয়েছিল, সে মুখে তিনি কি মিথ্যেটাই না বললেন! আসলে এই বেদকণ্ঠ, উগ্রকণ্ঠ কিংবা শ্রীকণ্ঠ বলে নীলকণ্ঠ শিবের সাত কুলে কেউ নেই। এগুলো শিবেরই এক একটা নাম, যে নামে বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন কারণে শিবকে ডাকা হয়েছে, কিংবা যে নামের দু-একটি খুব সুপ্রযুক্ত না হলেও তা দিয়ে শিবকে বোঝাতে বা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

বিয়ের সময় শিবের এই যে অপ্রস্তুত অবস্থা— এটা তাঁর মনুষ্যায়ণের একাংশমাত্র। বাস্তবিক, শিবকে অপ্রস্তুত করে, সমুদ্রমন্থনে বিষবঞ্চনা করে কবিরা যতটা না আনন্দ পেয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছেন তাঁকে ভিখারি সাজিয়ে, যে কথা আমি আগেও একটু বলেছি— যে কথার সূত্র ধরে শিবের ছন্নছাড়া স্বভাবের কথা উঠল। একথা মনে রাখতে হবে যে, কবিরা সবাই কালিদাস -বাণভট্টের মত রাজসভার কবি ছিলেন না। যে সব কবিদের কবিতা আমরা ব্যবহার করেছি, তাঁদের অনেকেই একটি কি দুটি কবিতা-মুক্তক রচনা করেছেন এবং তাঁদের অনেকেই ছিলেন অত্যন্ত গরিব। স্ত্রী-পুত্র-সংসার প্রতিপালনের যাতনা নিয়ত তাঁদের দগ্ধ করেছে, এবং সেই সংসার-যাতনা, আর্থিক কষ্ট ধরা পড়েছে তাঁদের শিব-কল্পনায়। শিব যেহেতু পৌরাণিক কল্পনাতেই যোগী-ভিখারি, তাই শিব সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করার সময় কবিদের জীবন-যন্ত্রণা মিশে গেছে শিব-কল্পনায়। ফলত শ্লোকগুলি বাস্তব জীবনের অসাধারণ প্রতিফলনে এতই চমৎকার যে, সে শ্লোকগুলি পড়লে কবিদের ওপর আমাদের মায়া হয়।

আপনারা নন্দী-ভৃঙ্গীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। এই যুগল শব্দটি আমরা অনেক মানুষের ওপর ব্যবহারও করে থাকি, বিশেষত সদা অনুগত ভৃত্য কিংবা অভদ্র চেহারার অনুচরদের সম্বন্ধে নন্দী-ভৃঙ্গী শব্দটা প্রায় প্রাবাদিক। শিবের এই দুই অনুচরের মধ্যে ভৃঙ্গী হচ্ছে ভীষণ রোগা। কবিদের মতে ভৃঙ্গী যে দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে— তা তার প্রভুর বাড়ির অবস্থা চিন্তা করেই। যে বাড়িতে গৃহকর্তার গৃহিণীরই ভাত জোটে না, অথচ যার দুই ছেলেই ভীষণ খায়, সে বাড়িতে কর্তা এতগুলি মুখে অন্নের যোগান দিয়ে, তারপর চাকর পুষবেন কি করে— সে কথা ভৃত্য ভৃঙ্গীকেই চিন্তা করতে হচ্ছে এবং সে রোগাও হয়ে যাচ্ছে— দেবঃ কথং পোক্ষ্যতি/ ইত্যালোক্যেব বিশুষ্ক-পঞ্জর-তনুঃ।

যে মানুষ ধনী লোকের ব্যবহার নকল করে বাড়িতে সব সময়ের কাজের লোক রাখেন, তার যদি খেতে দেওয়ারই ক্ষমতা না থাকে, সে বাড়ির চাকর-বাকরও প্রভুর কাজ-কারবার এবং চরিত্রের সমালোচনা করে। শিবের সদা-অনুগত ভৃত্য ভৃঙ্গীও তাই করছে। ভৃঙ্গী ভাবছে— আচ্ছা মালিকের পাল্লায় পড়েছি আমি! লোকটা আমারই মত গতর খাটিয়ে লোকের বাড়িতে কি রাজার বাড়িতে কাজ করলে পারে, তাও করবি না— সেবাং নো কুরুতে। আচ্ছা, লোকের বাড়িতে কাজ করতে যদি তোর লজ্জা করে, তো চাষ কর, তাও করবি না— করোতি ন কৃষিং। যদি বল— চাষ-বাস করা অধম পুরুষের কাজ, তা বেশ তো, তুই বুদ্ধি খাটিয়ে, পরিশ্রম করে ব্যবসা-বাণিজ্য কর— সে মুরোদও নেই— বাণিজ্যম্ অস্যাস্তি নো।

আপনারা ভাবছেন— শিবের পুরাতন ভৃত্য, একান্ত অনুচর, ভৃঙ্গী কি তার মালিকের সম্বন্ধে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলতে পারে ? আমরা বলি—নিশ্চয়ই পারে। চাকর-বাকরেরা, বিশেষত সে চাকর-বাকর যদি পুরনো হয় এবং তার মালিকের যদি রুজি-রোজগার না থাকে, তাহলে মালিকের পেছনে তারা এমনি করেই কথা বলে। তা ছাড়া ভৃঙ্গীর এই বক্তব্যের পেছনে পার্বতীর আশকারা ছিল। কারণ বাড়ির গৃহিণী

হিসেবে পার্বতী ভারতচন্দ্রের বয়ানে শিবের ওপর রাগ করে বলেছিলেন— 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস/ তাহার অর্ধেক চাষ' — কিন্তু চাষ-বাস, বাণিজ্য — কোনটাই শিবের পোষায় না, কারণ তাঁর বয়স হয়েছে অনেক—

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য-ব্যাপার।

এসব রুজি-রোজগার নিয়ে কথা কাটাকাটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেখানে বারবার চলেছে, সেখানে পুরাতন ভৃত্য যে তাঁদের আড়ালে দুটো কথা স্বগতোক্তি করবে— এতে আশ্চর্য কিছু নেই। তা ছাড়া ভৃঙ্গী শিব-পার্বতীর স্বভাবদোষও লুকোয়নি। শিবের রুজি-রোজগার কিচ্ছুটি নেই, অথচ মাঝে মাঝেই তিনি পার্বতীর সঙ্গে বসে বসে পাশা খেলেন, জুয়ো খেলেন। তা ছাড়া মেয়েছেলের ব্যাপারে শিব বড় স্ত্রৈণ, পার্বতীর আঁচল ছাড়েন না কখনও। ভৃঙ্গী ভাবে— এই মানুষ তাস-পাশার নেশা এবং স্ত্রীর নেশা কোনটাই ছাড়তে পারে না— দ্যূতস্ত্রীব্যসনং ন মুঞ্চতি— তবু তাঁকে লোকে দেবতা বলে ডাকে। এই বাড়িতে কি চাকরি চলে— এত সব ভেবে ভেবেই ভৃঙ্গী রোগা হয়ে যাচ্ছে। ভৃঙ্গীর ধারণা— শিব যে পার্বতীর প্রেমে ভুলে তাঁকে স্বদেহে আত্মসাৎ করেছেন এবং অর্ধনারীশ্বর হয়েছেন এ তাঁর স্ত্রৈণতারই ফল। ভৃঙ্গীর ভয় হয়— যে ভাবে এক স্ত্রী তাঁর মনিবের স্ত্রৈণতার সুযোগ নিয়ে শিবের অর্ধ অঙ্গ গ্রাস করেছে তাতে তাঁর আরেক সতীন গঙ্গা যদি রাগ করে শিবের মাথা থেকে টুপ করে নেমে এসে তাঁর আরেক অঙ্গ অধিকার করেন, তাহলে শিব গোটাটাই মেয়েছেলে হয়ে যাবেন। শিবের আর কোন আলাদা সত্তাই থাকবে না— তস্যার্ধং কুপিতা হঠাৎ যদি হরেম্মূর্ধ্নি স্থিতা জাহ্নবী— এ অবস্থায় ভৃঙ্গী কোথায় থাকবে, কোথায় চাকরি করবে— এটাই তার চিন্তা।

এ কথায় অবিশ্বাসের কোন হেতু দেখি না, কারণ পুরাণকারেরা জানিয়েছেন যে, শিব পার্বতীর সঙ্গে পয়সা বাজি রেখে পাশা খেলতেন। শিবের দ্যূতাসক্তির সুযোগ নিয়ে পার্বতী জিততেন এবং শিবকে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষায় বেরোতে হত। পাশাখেলায় সর্বস্ব হারিয়ে শিবকে তাঁর পরনের কৌপীনটি পর্যন্ত পার্বতীর কাছে বাঁধা দিয়ে দিগম্বর হয়ে ভিক্ষা করতে হত। এই যে পাশাখেলায় নেশা, এই দারিদ্র্য এবং এই গাঁজা-ভাঙের মৌতাত— এর মধ্যে গরিব ঘরের নির্লজ্জ ব্যসনগুলি লুকিয়ে আছে। হয়তো পৌরাণিকদের শিব-কল্পনায় বাড়াবাড়ি আছে, নইলে কেমন করে আমরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির নায়ককে শুধু সিদ্ধির নেশায় মাতিয়েছি, বিভু, সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরকে দিগম্বর করে ছেড়েছি, শিব-শক্তির অভেদ-কল্পনাকে স্ত্রৈণতার আকারে বদ্ধ করেছি। এমনকি তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ যোগিস্বভাবকে দারিদ্র্যের ছাঁচেও ফেলেছি। দেবতা যে কিভাবে মানুষ হয়ে যান, ঈশ্বর-স্বভাব যে কিভাবে মনুষ্যায়িত হয়ে মানুষের তালে-লয়ে বাঁধা পড়ে, তারও একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আছে শিব-পরিকর ভৃঙ্গীর জবানীতেই। তবে এ কবিতার সামান্য একটু ভূমিকা দরকার। মনে রাখবেন— আগেকার দিনের রাজা-মহারাজারা অনেকেই অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং নিত্যনতুন কবিবর্গকে উৎসাহ দিতেও তাঁরা ভুলতেন না। একদিন এক নতুন কবি এসেছেন এইরকমই এক সমঝদার রাজার কাছে। উদ্দেশ্য— রাজাকে কবিতা শুনিয়ে যদি কিছু অর্থপ্রাপ্তি

ঘটে। রাজা প্রথমেই কবিকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন— দেখ বাপু! নিত্যি নিত্যি ওই শৃঙ্গাররস আর বস্তা-পচা ভাঁড়ামি শুনে আমার কান পচে গেছে। যদি নতুন কিছু থাকে তো বল। কবি বললেন— মহারাজ? আমার কবিতার মধ্যে বেশি কিছু তো নেই, তবে মহারাজ! থাকবেই বা কি করে— আমার ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব মহাদেব যে মারা গেছেন! আমারও তাই আকাল চলছে। রাজা বললেন— বল কি? যিনি এই তিন ভুবনের সংহারকর্তা, দুষ্টজনের কৃতান্ত, তিনি মারা গেছেন? তোমার কি কাব্য করতে করতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, কবি? যাও, তুমি বরং মাথায় ভাল করে মধ্যম-নারায়ণ তেল ঠেসে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে, তারপর এস। কবি বললেন— মহারাজ সত্যিই শিব মারা গেছেন, নইলে আজকে আমি শিবের অনুচর ভৃঙ্গীর মত ভিক্ষা করতে বেরোই? রাজা কিছুই বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না যে, কবির অর্থাগমের ইচ্ছার সঙ্গে ভৃঙ্গীর ভিক্ষা করা অথবা শিবের মারা যাবারই কি সম্পর্ক। আসলে রাজা বোঝেননি যে কবি ততক্ষণে তাঁর কবিতার ভূমিকা রচনা করে ফেলেছেন, যেমনটি আমরাও করে ফেলেছি। অবশ্য এই কবিতা বুঝতে হলে পাঠকের মনে রাখতে হবে যে, ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে একাকার হয়ে হরিহর মূর্তি ধারণ করেছিলেন এবং অন্য সময় পার্বতীর সঙ্গে একতনু হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করেছিলেন। দ্বিতীয় কল্পনাটা আমরা আগে বলেছি। বিদ্বান মানুষ হিসেবে রাজার সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী জানা আছে। অতএব এবার কবি তাঁর কবিতা আরম্ভ করলেন।

কবি বললেন— মহারাজ! সত্যিই শিব মারা গেছেন। স্বয়ং শিবেরই অতিরিক্ত দৈব রসাবেশের ফলে তাঁর শরীরের অর্ধেক চলে গেছে হরি-হর মিলনে। আমরা হরি-হর আত্মার অনেক মাহাত্ম্য কীর্তন করি বটে, তবে এই ঘটনায় ভগবান শ্রীহরি আত্মভোলা শিবের অর্ধ অঙ্গ হরণ করেছেন— অর্ধং দানববৈরিণা। শিবের শরীরের আরেক অর্ধ গেছে তাঁর আপন স্ত্রী পার্বতীর প্রতি অতি-প্রেমের ফলে। পার্বতী একটু ভয় পেয়ে শিবের শরীরে মিলিত হতে চাইলেন, আর অমনি বোমভোলা শিব রাজি হয়ে গেলেন। তাহলে আর থাকল কি মহারাজ। শরীরের দুটো অর্ধই তো চলে গেল, তাই বলছি শিব মারা গেছেন। কবি এবার একটু রসিয়ে বললেন— হ্যাঁ মহারাজ! আপনি এখনও সন্দেহ করতে পারেন বটে, তবে আমার হাতে আরও প্রমাণ আছে। মহারাজ নিশ্চয় আপনি জানেন— মানুষ মারা গেলে মৃত মানুষের ধনসম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয় অন্য লোকে। তা মহারাজ এখানেও তো তাই হয়েছে। এই দেখুন না— শিবের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা চলে গেছে সাগরের হাতে। ভাবটা বুঝবেন মহারাজ! গঙ্গা শিবের অন্যতমা নায়িকা, শিবেরই সোহাগে ভুলে শিবের মাথায় উঠে বসেছিল। চিরকালের স্বামী সাগরকে ছেড়ে নতুন মানুষের সোহাগ বেশিদিন বিধাতার সয় না। তাঁকে আবার ফিরে যেতে হয়েছে পুরাতন 'তরঙ্গাধরদানদক্ষ' সাগর-নায়কের কাছে। তারপর শিবের শিরোভূষণ শশিকলার অবস্থা দেখুন। শিবের মৃত্যুর পর পরই তাকে চলে যেতে হয়েছে আকাশে— গঙ্গা সাগরম্ অম্বরং শশিকলা। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আর ছিল শিবের সাপখানি— তিনি চলে গেছেন পাতালে। মহারাজ! যদি আপনি স্থাবর সম্পত্তির কথা তোলেন— তাহলে সে হল তাঁর স্বর্গীয় ঐশ্বর্য এবং বৈরাগ্য। তা মহারাজ! ওই স্থাবর গুণ দুটি

আশ্রয় করেছে আপনাকে— রাজার ঐশ্বর্য আপনার আছে, কিন্তু তাতে আপনার আসক্তি নেই। তাই স্বাধিকারবশে ও দুটি আপনারই করতলগত। আর বাকি রইল শিবের ভিক্ষাবৃত্তি— মহারাজ। সেটি অধিকার করেছি আমি। শিবের মৃত্যু হওয়ায় চাকরি খুইয়ে শিবের অনুচর ভৃঙ্গী যে বৃত্তি গ্রহণ করেছিল আজ আমিও সেই বৃত্তি গ্রহণ করেছি। তাই বলছি মাহারাজ ! শিব মারা গেছেন, তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও সবার মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। আপনি অবহিত হোন।

এমন সুন্দর একটি শ্লোক শুনে রাজা অত্যন্ত পুলকিত হলেন বোধ করি। ভিক্ষার্থী কবি পৌরাণিক কবিকল্প কাজে লাগিয়ে যাচনা করার বেদনাকে যে এমনভাবে কাজে লাগাতে পারেন— তা ভাবা যায় না। কবি অথবা ভৃঙ্গীর দৃষ্টি থেকে শিবের দারিদ্র্য-কষ্ট আমাদের কাছে যতটা না তীব্র হয়, তার থেকে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ এবং চমৎকার লাগে যে— কবি মানুষের শিবায়ন ঘটিয়ে নিজের আদলে শিবকে গড়েছেন। শব্দশ্লেষ করে নিজের সঙ্গে শিবের অভেদ কল্পনার শেষ পর্যায়ে এসে আর এক কবি একটু বিড়ম্বনায় পড়েছেন। কবির বক্তব্য—লোকে শিবের আরাধনা করে দেহান্তে শিবত্ব লাভ করে, আমি জীয়ন্তেই শিবত্ব লাভ করেছি প্রায়। শিব শ্মশানে-মশানে শুয়ে শ্মশানের ছাই গায়ে মেখে ভস্মে ধূসর হয়েছেন, আমিও মাটিতে শুয়ে, খড়ের ওপর শুয়ে ধুলায় ধূসর হয়েছি। শিবের হাতে ত্রিশূল আছে বলে শিব যেমন শূলী-শম্ভু, তেমনি আমিও শূলী, তবে আমার হাতে শূল নয়, পেটে শূল। দিনের পর দিন সাত-বাসী পচা খাবার খেয়ে খেয়ে পেটে আমার শূল বেদনা ধরে গেছে। শিবের মাথায় একরাশ জটা আছে, দিনের পর দিন তেল না মেখে আমার ঘন চুলগুলিও এখন জটার আকার ধারণ করেছে— তৈলাভাববশাৎ অমী শিরসি মে কেশাঃ জটাত্বং গতাঃ। শিবের বাহন যেমন ষাঁড় আছে, তেমনি আমার ঘরেও একটি শিবের ষাঁড় ছেলে আছে। শিবের বুড়ো ষাঁড়ের যেমন লাঙল বইবার ক্ষমতা নেই, আমারটারও তেমনি সংসারের জোয়াল কাঁধে নেবার ক্ষমতা নেই। আর বউ যা একখানি আছে আমার ঘরে, তার সঙ্গে শিবের বউয়ের তফাত নেই কোন— দিনরাত ঝগড়া-ঝাঁটি, গৃহযুদ্ধ চলছে— ভার্যা গৃহে চণ্ডিকা।

কবির সিদ্ধান্ত— শিব হতে গেলে যা যা প্রয়োজন, সবই আমার প্রায় আছে, নেই শুধু শিবের অর্ধচন্দ্রখানি। না, না, তার জন্যে শিবের মাথা থেকে তাঁর শিরোভূষণ বাঁকা চাঁদখানি ছিনিয়ে আনার প্রয়োজন নেই। আমার সংসারে যা অবস্থা তাতে তোমরা যদি কেউ আমাকে একটি অর্ধচন্দ্র দাও, মানে গলা ধাক্কা মেরে বাড়ি থেকে বার করে দাও, তাহলেই সম্পূর্ণ শিবত্ব প্রাপ্ত হই।

শিবসংক্রান্ত শ্লোকগুলির মধ্যে আমি এটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। দারিদ্র্য, সংসার যাতনার চরম বিন্দুতে পৌঁছেও সংসারের মায়াতেই মানুষ ঘর ছাড়তে পারে না। এই সময় একটা ধাক্কা চাই —যা বাইরের মানুষ নয়, ঘরের মানুষ দিলেই সম্পূর্ণ হয়। শুধুমাত্র শব্দশ্লেষের মাধ্যমে একটি শ্লোকের মধ্যে দারিদ্র্য, যাতনা, মমতা এবং বৈরাগ্যের ইচ্ছা যে এমন নিপুণভাবে প্রকাশ করা যায়, তা রসিক মানুষমাত্রেই বুঝবেন। শব্দের ব্যঞ্জনায় দেবতার চরিত্রের মাধ্যমে আপন অবস্থার প্রকাশ আরও একটি শ্লোকে দেখেছিলাম— সেটি অবশ্য নারায়ণ-হরি সংক্রান্ত। দার্শনিক এবং শাস্ত্রমতে ভগবান শ্রীহরির আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্যও নেই অর্থাৎ তিনি অনাদি,

অনন্ত, সর্বব্যাপ্ত বিভু, পুরাণ-পুরুষ। সংসার জগতের জন্ম-মরণাদি দশাও তাঁকে স্পর্শ করে না। কিন্তু লৌকিক জগতের দরিদ্র কবি শুধুমাত্র এই কটি দার্শনিক বিশেষণ মাত্র উপজীব্য করে শব্দশ্লেষে নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন। কি অসাধারণ সেই কবিতা। কবি বলছেন— আমার পরিধানের কাপড়টির মত যে ভগবান শ্রীহরি, তাঁকে আমার নমস্কার। ভগবান শ্রীহরি যেমন পুরাণ-পুরুষ, তেমনি আমার কাপড়টিও বহু পুরাতন। তাঁর যেমন আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, শত-ব্যবহারে আমার কাপড়টিও তেমনি জীর্ণ— কোথায় সে কাপড়ের বুনুনিতে কোনদিন আরম্ভ ছিল, কি শেষ ছিল— তা টের পাওয়া যায় না— আদি-মধ্যান্ত-বিহীনং দশাহীনং পুরাতনম্। ভগবান— আদি, মধ্য, অন্তহীন, অনাদি, অনন্ত— দশাহীন। শোনা যায়— ভগবান শ্রীহরি— জন্ম-মরণশীল মানুষের মত দশ-দশায় আবদ্ধ নন। আমার কাপড়টির অবস্থাও তাই। দশাহীন। দশা— মানে আরেক অর্থে কাপড়ের পাড়; গরীবের থান কাপড় জুটেছে— এই যথেষ্ট, তার আবার পাড়! লজ্জা নিবারণের জন্য শুধু এক ফালি কাপড় পরে আছি, তা সেটা কাপড়ের মাঝখানের অংশ, না প্রথম অংশ, না শেষ — তা ভাল করে ঠাহর করতে পারি না, পাড়ের বাহার দূরে থাকুক। এমন নয় যে এমনি কাপড় আরেকখানা আছে আমার। এক্ষেত্রে ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে মিল আছে আমার শতচ্ছিন্ন কাপড়খানির। শ্রীহরি অদ্বিতীয়, এক, ব্রহ্মস্বরূপ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমার কাপড়ও তেমনি, একটি বৈ দ্বিতীয় নেই। আমার পরিধেয় বসনখানির সঙ্গে যাঁর দার্শনিকভাবেই এত মিল, সেই ভগবান হরিকেই আমার প্রণাম— অদ্বিতীয়ম্ অহং বন্দে মদ্‌বস্ত্রসদৃশং হরিম্।

॥ ৪ ॥

হরের কথা বলতে বলতে হরির কথায় চলে এলাম। শাস্ত্রযুক্তি বলেছে— হরি-হরে ভেদবুদ্ধি মোটেই ভাল নয়। আমরা তাই দীনতার পরিসরে যে দুই কবি হরি-হর আত্মা, তাঁদের কথা বললাম। তা ছাড়া সব কথা শিবকে নিয়েই হবে কেন? আরও তো দেবতা আছেন। তাঁদের কথাও তো একটু আধটু বলতে হবে। বিশেষত ধরুন, যিনি এই সম্পূর্ণ বিশ্বসংসারের ঠাকুরদাদা বলে পরিচিত, সকলের আদিভূত, সৃষ্টিকর্তা সেই ব্রহ্মার সম্পর্কে কবিরা খুব বেশি মন্তব্য করেননি। তবে ব্রহ্মা খুব মানিয়ে চলা মানুষ এবং যথেষ্ট রসিকও বটে। পুরাণে, ইতিহাসেও তাঁর বর্ণনা সেই ধারাতেই হয়েছে। ব্রহ্মার পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য হল—বিষ্ণুর নাভিপদ্মে তাঁর জন্ম, তিনি আদি পিতা, তিনি বুড়ো এবং তিনি সৃষ্টিকর্তা।

পরবর্তী কবিরা ব্রহ্মার সম্বন্ধে যত রসিকতা করেছেন, তা প্রধানত তাঁর বৃদ্ধত্ব নিয়ে এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সৃষ্টির ক্রটি নিয়ে। ব্রহ্মা আদি সৃষ্টিকর্তা বলেই পৌরাণিকেরা তাঁকে বৃদ্ধ বলেছেন, পিতামহ বলেছেন। কবিরাও তাঁকে বুড়ো ঠাকুরদাদাই বলেছেন— তবে তার কারণ অন্য। তাঁদের ধারণা— অসাধারণ যৌবনবতী সুন্দরীদের সৃষ্টি করেও যে দেবতা ভোগ না করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন, তিনি অবশ্যই বুড়ো হবেন। প্রতিনিয়ত বেদাভ্যাস করতে করতে তিনি হয়তো অত্যন্ত জড় হয়ে পড়েছেন, কালিদাস যাকে বলেছেন 'বেদাভ্যাসজড়ঃ'; নয়তো অতিরিক্ত

জরাবৈকল্যের ফলে তাঁর রমণী সম্বন্ধে কৌতূহল বলে কোন জিনিস নেই। আমাদের পুরনো কালের যুবক-যুবতীরা আবার নানা কারণেই সৃষ্টিকর্তার ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। যুবকগোষ্ঠীর নালিশ হল— শরীরের মধ্যে দু-একটি অঙ্গ সংস্থান করার ব্যাপারে বিধাতার কার্পণ্য আছে, ত্রুটিও আছে। ভাগবত পুরাণের কবি গোপীদের যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন—অভীষ্ট নাগর পুরুষের রূপ দেখতে দুটিমাত্র চোখ মোটেই পর্যাপ্ত নয়, তার ওপরে আবার সেই চোখেও খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার উপায় নেই— চোখে আবার পাতা পড়ে। গোপীরা তাই ডাক্তার-বদ্যির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মুখে ছাই দিয়ে ওই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকেই দুষে গেছেন— যৎ-প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। স্বয়ং চৈতন্যদেব রাধাভাবে পুরাণ-কবির গোপী-বিরহ সর্বথা মেনে নিয়ে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় খেদোক্তি করেছেন—

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটি
তাহে দিলে নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥

ভাব-ভালবাসার রাজ্যে বিধাতাপুরুষের ক্রিয়া-কর্ম এতই নিন্দিত যে প্রায়ই তাঁকে শত শত যুবক-যুবতীর গালমন্দ শুনতে হয়। আরও একটি ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অপবাদ হল এই যে, তিনি গুণীর সঙ্গে সমঝদারের মিলন ঘটাতে পারেন না। বিশেষত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও বড় কারসাজি আছে তাঁর। রুচিশীল কবি সেই দশম-একাদশ খ্রীষ্টাব্দে স্তুতিচ্ছলে বিধাতাকেই নিন্দা করে বলেছেন— আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! সময়কালে ঠিক উচিত সৃষ্টিটি করে ফেলা— এ বিধাতার হাতে আসে না। কিন্তু কপালগুণে একটি মাত্র ক্ষেত্রে তিনি দারুণ ঔচিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন— জাতা দৈবাদ্ উচিতরচনা সংবিধাতা বিধাতা। কবি বলেছেন—নিম গাছে হাজার হাজার বিষতেতো নিমফল যেমন দিয়েছেন বিধাতা, তেমনি সেগুলিকে আশ মিটিয়ে খাবার জন্য নিম্বরসজ্ঞ হাজার হাজার কাকও তৈরি করেছেন বিধাতা।

স্পষ্টতই এটা কবির ব্যাজস্তুতি। পৃথিবীতে বাজে কবিতা, অসহ্য কাব্য-উপন্যাসের অভাব নেই, তেমনি সেই সব কাব্য, উপন্যাস, কবিতা গোগ্রাসে পড়ার মত কাক-পণ্ডিতেরও অভাব নেই। বড় দুঃখে, বড় যাতনায় কবি বিধাতা পুরুষকে ধন্যবাদ দিয়ে এই কবিতা লিখেছেন। তাঁর দুঃখ— সুলেখক সুধীজনের সহৃদয় পাঠক পাওয়া যায় না, কিন্তু রুচিহীন অথবা কুরুচি কবির নিজের জগতের ভূরি ভূরি সহৃদয়ও আছে, যারা শুধু লোভাতুর কাকের মত নোংরা জিনিসও গিলতে ভালবাসে— কবলনকলাকোবিদঃ কাকলোকঃ, তাদের কাছে রুচির বালাই নেই। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে কবি মনে করেন— বিধাতার সৃষ্টি উপযুক্ত হয়েছে— যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যতমের যোগে।

ভারি রসিকতা হল! জীবনযন্ত্রণায় কাতর কবি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে খুব এক প্রস্থ গালাগালি দিয়ে নিজের যন্ত্রণার তথা নিজের পোড়া কপালের ঝাল মেটালেন। বেশ বুঝতে পারি— এসব রসিকতা নেহাতই রসধর্মী, ঠাকুরদাদা ব্রহ্মার গায়ে এসব পরিহাস বড় বেশি বেঁধে না। তবে ব্রহ্মার নির্মোহ এবং পক্ষপাতহীন ব্যবহার নিয়ে চরম

রসিকতাটি বোধ হয় করেছেন আর্যাসপ্তশতীর কবি আচার্য গোবর্ধন। কবির বক্তব্য— নায়ক এবং নায়িকা— দু'জনেরই ভাব বুঝে চললে চিরকালই তাদের সঙ্গে থাকা যায়, তাদের চিরদিনের বন্ধু হওয়া যায়। এর উদাহরণ হলেন বিষ্ণুর নাভি-কমলে উপবিষ্ট ব্রহ্মা। কবি মনে করেন— বিষ্ণু যখন লক্ষ্মীর সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হন এবং আবেশে চোখ বুজে থাকেন— ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই তখন অন্ধের মত চক্ষু মুদে থাকেন। আবার রমণকালে লক্ষ্মী-বিষ্ণু যখন দুজনেই লজ্জাকর নিষিদ্ধ বাক্যালাপ করেন, তখন ব্রহ্মা নিশ্চয়ই বধিরের মত থাকেন। ঠিক যখন অন্ধের মত থাকা প্রয়োজন, তখন অন্ধের মত থেকে এবং ঠিক কানে যখন কিচ্ছুটি না শোনা উচিত, তখন না শুনে, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং বিষ্ণু— দুজনেরই অন্তরঙ্গ বন্ধুটি হয়ে উঠেছেন, বিষ্ণুর নাভিকমলে নিরন্তর বাস করতেও তাঁর কোন অসুবিধে নেই— শ্রীকেশবয়োঃ প্রণয়ী প্রজাপতি নাভিবাস্তব্যঃ।

ব্রহ্মা না হয় সবার সঙ্গে খুব মানিয়ে চলতে পারেন—এটা বোঝা গেল। তার ওপরে ভগবান বিষ্ণু পুরুষ মানুষ— তাঁর লজ্জা-শরম একটু কম। রতিকেলির সাধারণ নিয়মে তিনিই কমলদলে বসা ব্রহ্মাকে দেখতে পান বটে, তবে তিনি গ্রাহ্য করেন না, যদিও চক্ষু মুদেই থাকুক আর তাকিয়েই থাকুক ব্যাপারটা মানুষ মাত্রেরই অস্বস্তিকর। তা আমরা না হয় বিষ্ণুর কথাটা বুঝলাম। একে ত্রিভুবন-পালনের ব্যস্ততা, তাতে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে—সর্বদাই তাঁর স্ত্রীসঙ্গের অভ্যাস আছে। তাই তাঁর লজ্জা-শরম কম ধরে নিলেই আমাদের সুবিধে হয়। কিন্তু সব সময় তো আর একই অবস্থা থাকে না এবং সে অবস্থাটা আচার্য গোবর্ধনের অন্তত একশ বছর আগে একাদশ খ্রীস্টাব্দেই বুঝতে পেরেছিলেন এক আলংকারিক। অবশ্য একাদশ খ্রীস্টাব্দের কথাটা এক দিক দিয়ে ভুল হল, কারণ, কাশ্মিরী আলংকারিক মম্মটাচার্য শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন বহু পুরাতন প্রাকৃত গাথা জয়বল্লভের বজ্জালগ্গ থেকে। শ্লোকটিতে লক্ষ্মীদেবীর অবস্থা বড়ই করুণ এবং পিতামহ ব্রহ্মার স্বভাবও এখানে ভাল দেখা যাচ্ছে না। শ্লোকটি উল্লেখ করার আগে বলে নিই যে, মম্মটের মত জাঁদরেল আলংকারিক যেখানে তাঁর কাব্যপ্রকাশে এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে শ্লোকটিকে একটু ধৈর্য ধরে লক্ষণা-ব্যঞ্জনা আঁচ করে বুঝতে হবে। আমি অবশ্য একই সঙ্গে সব সারব।

বহুদিন পর লক্ষ্মীদেবী ভগবান বিষ্ণুকে কাছে পেয়েছেন কাজেই তাঁর রসাবেশের মাত্রা কিঞ্চিৎ বেশি, স্বয়ং কবির প্রাকৃত ভাষায়— রসাউলা অর্থাৎ রসাকুলা। ফলে রতিকেলির সাধারণ আসন লঙ্ঘন করে লক্ষ্মী বিপরীত-রতিতে মত্ত হয়েছেন। এমত মত্ত অবস্থাতেও হঠাৎ লক্ষ্মীর নজর পড়ল কমলাসন ব্রহ্মার ওপর। দেখলেন— বুড়োর কৌতূহল মোটেই কম নয়, ব্রহ্মা ঠিক ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে আছেন মুক্তবসনা লক্ষ্মীর দিকে। এহেন অবস্থায় কোন্ লক্ষ্মীমতী শরমে বিজড়িত না হয়? এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় কালিদাসের নায়িকা হলে ফুল ছুঁড়ে তৈলপূর প্রদীপ নিবিয়ে দিত। কিন্তু লক্ষ্মীর অবস্থা আরো করুণ, তিনি তখন এতই 'রসাকুলা' যে না পারছেন নিজেকে সংযত করতে, না পারছেন ব্রহ্মাকে বাধা দিতে। নাভিকমলস্থ ব্রহ্মাকে দেখেই তিনি তখন তাই খুব তাড়াতাড়ি নিজের হাতে চেপে ধরলেন শ্রীহরির দক্ষিণ নয়নখানি—হরিণো দাহিনণঅণং রসাউলা ঝত্তি ঢক্কেই। এই আরম্ভ হল আলংকারিকের লক্ষণা-ব্যঞ্জনা। মম্মট বললেন— শ্রীহরির দক্ষিণ নয়নটি হল সূর্য-স্বরূপ, কেননা গীতায় তাঁকে বলা হয়েছে— শশিসূর্যনেত্রম্। তা হরির ডান

চোখটি চেপে ধরা মানেই সূর্যের গতি রুদ্ধ। সূর্যের গতি রুদ্ধ হলেই পদ্ম নিমীলিত হয়, অতএব পিতামহ ব্রহ্মা তাকাবেন কি, তিনি একেবারে আটকা পড়ে গেলেন পদ্মদলের মধ্যে। এই অবস্থায় মুক্তবসনা লক্ষ্মীকে আর যেমন চোখে দেখা গেল না, তেমনি নিরুপদ্রব হল বিপরীত-রতা লক্ষ্মীর রতিকেলির সুখ, যাকে মম্মটাচার্য তাঁর আলংকারিক ভাষায় লিখেছেন— অনির্যন্ত্রণং নিধুবনবিলসিতম্ ইতি। এই সঙ্গে লক্ষ করলেন নিশ্চয়ই যে, নিগূঢ় রতিকেলির অর্থে 'নিধুবন-বিলসিত' শব্দটি মম্মট প্রয়োগ করলেন গোবর্ধনেরও একশ বছর আগে।

যাই হোক, পদ্মাসনে বসে বসে শুধু এদিক ওদিক ফালুক-ফুলুক করে তাকিয়েই কিন্তু ব্রহ্মার দিন কাটে না। চতুরানন ব্রহ্মার অনেক কাজ। বিশেষত দেবকুলে প্রচুর অবুঝ লোক আছেন। তাঁরা যে-কেউ একটা গোলমাল করলেই ব্রহ্মাকে ছুটে যেতে হয় সামলাতে। অসুরদের হাতে দেবতারা ধরুন মার খাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাকে সমস্ত দেবতার হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে সেই সাগরে, যেখানে কারণসমুদ্রে শুয়ে আছেন বিষ্ণু, অথবা যেতে হবে কৈলাসে শিবের কাছে। এই পাহাড় থেকে সমুদ্র, সমুদ্র থেকে পাহাড়— বুড়ো বয়সে এইসব ধকলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সব চেয়ে দুঃখের কথা তাঁকে কাজ করতে হয় 'কনট্রাক্ট বেসিস'এ। কারণ ব্রহ্মা মানুষের মতই মারা যান। আমাদের শাস্ত্রমতে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা সবাই মরণশীল। তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মার আয়ু প্রচুর। গীতায় যে হিসেব আছে, তাতে মানবলোকে এক হাজার বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি অতিবাহিত হলে তবে ব্রহ্মার এক দিন হয়, রাত্রিও তাঁর সেই মত। এই হিসেবে ব্রহ্মার আয়ু ভাবা যায় না। কিন্তু এত আয়ু সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রীর মত। এই কোথায় যুদ্ধ লাগল, এই কোথায় প্রজাক্ষয় হচ্ছে, এই পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। আর এই পৃথিবীরও বলিহারি যাই। কয়েক কোটি বছর বয়স হয়ে গেল, তবু এখনও যেন তিনি নবীনা বধূটি। কিছু একটা হলেই তিনি নাকি কাঁপতে থাকেন। যখন ভাল আছেন তখন তিনি সাগরের মেখলা পরে, মাথায় হিমালয়ের মুকুট পরে স্বয়ংবরা হন— 'সাগরাম্বরা', 'শৈলরাজাবতংসকা'। অমন সুন্দরী মোহিনী রূপ দেখে যদি কোন বলদর্পিত অসুর, রাক্ষস কি মানুষ পৃথিবীর দিকে হাত বাড়ায়, অমনি তিনি কাঁপতে থাকেন। তার ওপরে যুদ্ধ যদি একটা লাগে— সে স্বর্গে দেবাসুরের যুদ্ধই হোক, কিংবা মর্ত্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ— বসুন্ধরা-লক্ষ্মীর কাঁপা স্বভাব, তিনি কাঁপতে থাকবেন। তাঁর কাঁপুনি সব চেয়ে বেড়ে যায়, যদি স্বর্গে কোন অসুর রাজা হন, কিংবা মর্ত্যে কেউ অত্যাচারী রাজা। ব্যাপারটা তাঁর কাছে একই। ইতিহাসে, পুরাণে বারবার এই চিত্র দেখা যাবে যে পৃথিবী-রানী অত্যাচারী রাজার বলাৎকারে ধর্ষিতা বোধ করছেন আর ব্রহ্মা দেকাণ সমভিব্যাহারে তাঁর দুরবস্থার কথা নিবেদন করছেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। এর অবধারিত ফল— বিষ্ণুর অবতার এবং সেই অত্যাচারী অসুর বা রাজার নিপাত।

আগেই বলেছি— বারবার এই অবতার গ্রহণের কষ্ট, বারবার এই অসুর-রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করা—এও যেন বিষ্ণুর কপালের ফের। তা ছাড়া এই অবতার গ্রহণের হ্যাপাও তো কম নয়। পরম ঈশ্বর যদি পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করেন, বিশেষত যদি মনুষ্যরূপে তাঁকে আসতে হয়, তবে 'প্রোটোকল' অনুযায়ী স্বর্গে অন্যান্য প্রধান দেবতাকে তাঁর আগেই পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। বিশ্বাস না হয়, রামায়ণ খুলে

দেখুন। সেখানে বিষ্ণু রামচন্দ্র হয়ে জন্মাবেন বলে প্রধান দেবতাদের অনেককেই বাঁদর হয়ে জন্মাতে হয়েছে। আবার কৃষ্ণ অবতারের আগেও দেবতা এবং দেবরমণীদের যুগপৎ জন্মাতে হয়েছে মানুষের ঘরে। তাঁদের কাজ হল লীলাপুরুষোত্তমকে নানাভাবে সাহায্য করা। মানুষরূপে অবতার হওয়ার মধ্যে খুবই ঝামেলা আছে, কিন্তু ঈশ্বর অবতারের অন্যান্য স্বরূপের মধ্যেও ঝামেলা কিছু কম নয়। দশ অবতারের মধ্যে গোটা তিনকে অবতার যাবার পরেই ঈশ্বর অনেকটা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। তাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন যে, মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি অবতারে পরম ঈশ্বরকে মাছ কিংবা কচ্ছপ হয়ে জন্ম নিয়ে কি অমানুষিক কষ্টই না করতে হয়েছে।

আমার মনে আছে— নবদ্বীপে আমি এক বৈষ্ণব গোসাঁই-বাড়িতে খোদ গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। একথা সেকথার পর প্রভু আমাকে মধ্যাহ্নের প্রসাদ নিয়ে যেতে বললেন। ভোজন প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু প্রশ্ন করলেন— আপনি কি অবতার-সেবা করেন ? আমি তো প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। সেবা করা মানে না হয় খাওয়া বুঝলাম, কিন্তু অবতার-সেবা ব্যাপারটা কি ? আমার অবস্থা বুঝে গোসাঁই বললেন— অবতার বুঝলেন না ? অবতার, ভগবান বিষ্ণুর প্রথম অবতার ? আমি এতক্ষণে বুঝলাম যে, প্রকারান্তরে গোসাঁই জিজ্ঞাসা করছেন— আমি মাছ খাই কিনা ? বৈষ্ণব মানুষ, মাছ শব্দটাই মুখে আনবেন না। এই মুহূর্তে ভগবান বিষ্ণুর জন্য আমার খুবই মায়া হল। মনে হল—চৈতন্যপন্থী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের বৈষ্ণব না বলে 'কার্ষ্ণ' বলা উচিত। কেননা বিষ্ণুর ভক্ত যদি বৈষ্ণব হন, তাহলে বিষ্ণুর প্রথম অবতার সম্বন্ধে এই জুগুপ্সা থাকবে না। আর কৃষ্ণের ভক্ত 'কার্ষ্ণ' হলে অবশ্য আলাদা কথা, যদিও ক্ষত্রিয় পুরুষ হিসেবে বন্য বরাহ থেকে আরম্ভ করে মহিষ, হরিণ ইত্যাদি সব জন্তুই কৃষ্ণের খাদ্য ছিল।

যাক সে কথা। বিষ্ণুর প্রথম অবতারে মৎস্যরূপী বিষ্ণুর কষ্ট কম ছিল না। চারিদিকে অফুরান জলরাশি পৃথিবীকে প্লাবিত করছে, আর তার মধ্যে ভগবান একটি শিঙওয়ালা মাছের রূপ ধরে বাঁচালেন মানব-জাতির আদি-পিতা মনুকে, সৃষ্ট হল মানবজাতি। ওদেশের 'নোয়া'জ আর্ক' আর এদেশের শতপতব্রাহ্মণে মনু-মাৎস্য কথার একই সুর। তবে পুরাতাত্ত্বিকেরা এই আদি-মৎস্যের মধ্যে দেখেছেন সৃষ্টি এবং প্রজননের কল্প, কারণ এই প্রাণীটি প্রজননের প্রতীক বলে সমস্ত পৌরাণিক কথায় বিধৃত। আজকের দিনে মাছের আঁশের সঙ্গে যদি ঋগ্‌বেদ সামবেদ যদি এক সঙ্গে রাখি তাহলে ধর্মধ্বজীরা আমাকে হেঁই হেঁই করে মারতে আসবেন, কিন্তু প্রলয়-পয়োধিজলে ওই বিরাট শিঙি মাছটাই আমাদের বেদকে রক্ষা করেছিল। এই মৎস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বাংলার জয়দেব কবি মালব রাগে রূপক তালে গান ধরেছিলেন— প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্...।

সৃষ্টির প্রথম কল্পে মৎস্যরূপী ঈশ্বরকে যা কষ্ট করতে হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়েছে কূর্ম অবতারে। বিষ্ণু তো স্বর্গের দেবতা এবং অসুরদের সমুদ্রমন্থনের আদেশ দিয়েই খালাস হতে পারতেন; কিন্তু যখন দেখা গেল সমুদ্র-মন্থনের মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বত স্থির হওয়ার জন্য কোন সাপোর্টই পাচ্ছে না, তখন বিষ্ণুকে স্বয়ংই কচ্ছপ সেজে পিঠ পেতে দিতে হল মন্দর পর্বতের তলায়। সমুদ্রমন্থন

হল তার পর। সাধারণে কিন্তু সমুদ্রমন্থনকালে বিষ্ণুর এই সাময়িক কষ্টটুকু তেমন আমল দেয় না। তারা বলে যে, বিষ্ণু আজও পৃথিবীকে তাঁর পিঠে ধরে রেখেছেন। কবি জয়দেব তো এই ঘটনায় এত কষ্ট পেয়েছেন যে, তিনি মনে করেন— এই পৃথিবী-ধারণের ঘষায় ঘষায় সেই বৃহৎ কচ্ছপের পিঠের খোলায় চাকার মত একটা কড়া পড়েছে— ধরণীধারণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে। পৌরাণিকেরা আবার টিপ্পনী কেটেছেন। বলেছেন— ওসব কড়া-টড়া কিছুই নয়, কচ্ছপ হল সেই স্থিরতা এবং প্রজননের প্রতীক। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতএব তাকে সুরক্ষা দিতেই বিষ্ণুর কূর্ম রূপ-কল্পনা।

বুঝলাম— সৃষ্টি, সৃষ্টির সুরক্ষা সব বুঝলাম। এমনকি সৃষ্টির ক্রমে মৎস্য থেকে কূর্মে প্রতীকী বিবর্তনের কথাও বুঝলাম। আবার আমরা ঈশ্বরের ঝামেলার কথায় আসি। অনেক মা-বাবাকে কোলের শিশু সম্বন্ধে এমন মত ব্যক্ত করতে শুনেছি যে, দুধের বাচ্চাটি বড় হলেই আর ঝামেলা থাকবে না ; কিন্তু অভিজ্ঞ পিতা-মাতারা এই মত উড়িয়ে দিয়ে বলেন— বাচ্চা যত বড় হবে, ঝামেলা ততই বাড়বে, 'টেনশন'ও ততই বাড়বে। ঈশ্বরের সৃষ্টির ব্যাপারটাও প্রায় একই রকম। মৎস্য-কূর্ম অবতারে তাঁর যে ঝামেলা ছিল, বরাহ অবতারে তাঁর ঝামেলা তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে।

তাত্ত্বিকতার খাতিরে একটা কথা এখনই বলে নেওয়া ভাল যে, পৃথিবী কিন্তু বিষ্ণুর স্ত্রীকল্পা— দার্শনিক ভাষায় ভূশক্তি, কবির ভাষায় প্রেয়সী নায়িকা। তাঁকে রক্ষা করা যত কষ্টেরই হোক, সেটা ঈশ্বরের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বরাহ অবতারের সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, কর্তব্যের সঙ্গে আরও যেন কিছু আছে। তা ছাড়া বরাহ অবতারের সময় থেকেই পুরাণে পুরাণে জটিলতাও অনেক বেড়েছে— একেক জায়গায় একেক গাথা। কিথ সাহেব তো বরাহ অবতারের প্রথম কল্পটি খুঁজবার চেষ্টা করেছেন ঋগ্‌বেদ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায়। শতপথব্রাহ্মণে আবার দেখতে পাচ্ছি— প্রজাপতি এমুষ নামে একটি শূকরের রূপ ধারণ করেছেন। বেদে-ব্রাহ্মণে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ— সকলেই প্রজাপতির রূপকল্প। সে যাই হোক— ওই এমুষ নামে শূকরটি জলের মধ্যে ডুবে যাওয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করে ঠিক জায়গায় এনে রেখেছিল। পুরাণে, ইতিহাসে প্রজাপতিই বিষ্ণু হয়ে গেছেন। কোন পুরাণে আবার দেখি— দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বড় দাদা হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে একেবারে সাগরের জলে ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল। হয়তো সেই অসাধু দৈত্যের অত্যাচারে পৃথিবী একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন। বিষ্ণু তখন বরাহের রূপ ধরে হিরণ্যাক্ষকে মেরে ফেলেন এবং পৃথিবীকে উদ্ধার করে আনেন।

পণ্ডিতেরা বলবেন— এটাও বুঝলেন না! গ্রীস দেশের পুরাকাহিনী থেকে মিশর দেশের পুরাকাহিনী— সব জায়গাতেই শূকর হল— জমির উর্বরতা, ফসল এবং প্রজননের প্রতীক। গ্রিম সাহেব আবার "ডয়েট্‌শে মিথলজি" লিখে প্রমাণ করলেন— এই প্রাণীটি নাকি তার বুনো দাঁতে মাটি চিরে মানবজাতিকে প্রথম হাল চাষের কায়দা শিখিয়েছিল। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়, কেননা এই আদিবরাহের দাঁত কিন্তু দুটি নয়, একটি। মহাভারত বলেছে— একশৃঙ্গ। শৃঙ্গ শব্দটি শুনেই তো আবার অনেকের ভাবোদয় হয়। বিশেষত পণ্ডিতেরা একশৃঙ্গের বিবরণ এবং মায়ার সাহেবের ভাবোদয় দেখে সিদ্ধান্ত নিলেন— এই শৃঙ্গ হল প্রজনন চিহ্নের প্রতীক অথবা 'penis

erectus'।

আমরা বলি—সাহেব। তোমরা পারও বটে। একটা দাঁতাল শুয়োরের দাঁত দেখে পুরুষ চিহ্নের দৃঢ়তা, হাল-চাষ— সবই তোমরা বুঝে ফেলেছ। তা তোমাদের বোঝাটা না হয় আমরাও কষ্টেসৃষ্টে বুঝে নিলাম, কিন্তু আমাদের কথাটাও তোমরা একটু বোঝ। আমরা যে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের বংশধর। আমরা বাপু শুধু ওই প্রজনন আর হালচাষের মত গদ্যজাতীয় কথকতায় ভুলি না। আমরা দেখছি— বরাহ অবতার থেকেই আমাদের পরম প্রভুর কিঞ্চিৎ চিত্তবিভ্রম ঘটেছে। অর্থাৎ কিনা পৃথিবী রক্ষার মত শুষ্ক কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর মনটা কিঞ্চিৎ রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি— পৃথিবী নায়িকা বলে কথা। আর সেই সৃষ্টির প্রথম প্রথম তিনি কি আর আজকের মত প্রৌঢ়া ছিলেন নাকি? আমরা তাই আদিবরাহকে এঁকেছি একেবারে মানুষের আদলে। বিশ্বাস না হয়— ভারতীয় যাদুঘরে চলে যান অথবা সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি মহাবল্লীপুরমের বরাহ মূর্তিটি দেখুন।

সেকালের শিল্পীরা চিত্র কিংবা ভাস্কর্যের রূপ দিতেন শাস্ত্রের মর্মকথা জেনে। এখানেও তাই শিল্পীরা আদিবরাহের হাত-পা, সব কিছুর সংস্থান ঠিক করেছেন মানুষেরই আদলে। তাঁর গলায় আবার একখানা পৈতেও আছে— আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে। শুধু এটুকু হলেও হত। বরাহটি তাঁর সামনের দুই হাতে এমন করে তুলে আনছেন পৃথিবীরানীকে, যেন মনে হবে— কতকাল পরে প্রাণের বঁধুয়াকে পেয়েছেন তিনি। ভাস্কর্যবিদেরা সন্দেহ করেন— বিষ্ণুর শূকর-মুখে কেমন যেন আধো হাসিটিও ফুটেছে তখনই, যেন বিষ্ণু তাঁর শূকর-চোখে বসুন্ধরা নায়িকার পানে আড়াআড়ি কামনার দৃষ্টি হেনে চলেছেন—এবং এই ভাবটি সম্বন্ধে নাকি কোন সন্দেহই নেই। স্বয়ং জিতেন ব্যানার্জি লিখেছেন— The Pallava artist has taken care to emphasise the aspect of loving reunion between the God and his divine consort Prithivi.

আমরা জানি— এই মিলনের একটা ফলও হয়েছিল। প্রিয়মিলনের মুহূর্তে ভগবানের শূকরমূর্তি এমনভাবেই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বসুমতীর সঙ্গে যে, তাঁদের একটি ছেলেও হয়েছিল। এই ছেলেই পরবর্তীকালের নরকাসুর, যিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা হয়েছিলেন পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বকালে। ভূমিপত্নীর ছেলে বলে তাঁকে ভৌমাসুরও বলা হত। আদিবরাহের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটি পরে এমন দুর্দান্ত হয়ে ওঠে যে, আর্যভূখণ্ডে সে নিন্দিত হতে থাকে। জন্মলগ্নেই তার মধ্যে পিতার কোন বরাহ-গুণ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল কিনা জানি না, তবে নরকাসুরের অভ্যাস ছিল দেশ-বিদেশের সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এসে আসামের মণি-পর্বতে লুকিয়ে রাখার। শেষে একদিন যখন এই নরকাসুর স্বর্গে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে দেবতাদের বুড়ো মা অদিতির সোনার কানপাশা ছিনিয়ে নিল, সেইদিনই ইন্দ্রের দূত হয়ে নারদ এসে পৌঁছলেন কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ তখন পূর্বাহ্ণেই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ। সব সংবাদ শোনার পর কৃষ্ণ ছুটলেন নরকাসুর বধ করতে। নরকাসুরের জন্মবৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গ তখনও সবাই জানত না, বোধ করি কৃষ্ণও জানতেন না। শেষে যখন নরকাসুর বধ হয়ে গেল, তখন হরিবংশে দেখছি— বড় করুণ এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। নরকমাতা বসুন্ধরা ছেলের মৃত্যু দেখে কৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—

তুমিই আমাকে এই ছেলে দিয়েছিলে, এখন তুমিই একে মেরে ফেললে— দত্তস্ত্বয়ৈব গোবিন্দ ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ— বাচ্চা ছেলেরা যেমন পুতুল নিয়ে খেলা করে, তেমনি তুমিও আমাদের নিয়ে পুতুল-খেলা করছ— বালঃ ক্রীড়নকৈরিব।

কথাটার মধ্যে দর্শনবোধের সঙ্গে জননী-হৃদয়ের আক্ষেপ মিশে গেছে। পরবর্তীকালে যাঁরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে কাব্য-নাটক লিখেছেন, তাঁরা বলেছেন—নরকের দৃষ্টান্ত নাকি পরম প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য সূচনা করে। পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় ধর্মসূরি নরকাসুরবিজয় নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন— শরণাগত আর্ত দেবতারূপী ভক্তদের জন্য ভগবান নিজের ছেলেকেও মেরে ফেলতে কুণ্ঠিত হন না— অপত্যেভ্যোপি ভক্তা মে রক্ষণীয়া বিশেষতঃ। নরকাসুরকে মারার পেছনে নাকি এই ভক্তবাৎসল্যই আসল কারণ। আমরা বলি— ঈশ্বর যখন অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন, তখন তিনি নানা বিষয়ে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা সাধারণ লোকেও অনুসরণ করে। তবে দৃষ্টান্ত বলতে শুধু ওই ভক্ত-বাৎসল্যের দৃষ্টান্তই বোঝায় না, আরও কত রকম দৃষ্টান্ত হতে পারে। এই যে ঈশ্বররূপী বড় মানুষের এমন একটা বদমাশ ছেলে হল— এটাও তো সমাজে একটা উদাহরণ, অন্তত যাদের এরকম ছেলে হয়েছে তাদের কাছে বরাহনন্দন নরকাসুর তো একটা সান্ত্বনা বটে। এ সত্ত্বেও অনেকে অবশ্য বিষ্ণুরূপী বরাহের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চান না, যদিও পুত্রের অন্যায়-অশালীনতার দায় পিতার ঘাড়ে পড়তেই পারে ; লোকে বলতেই পারে— শুয়োরের বাচ্চা তো, আর কত হবে !

নরকাসুরের খারাপ হওয়ার পেছনে তাই একটা যুৎসই কারণ খুঁজে বার করা হয়েছে— যাতে ভগবান বরাহ এবং ভগবতী বসুমতী দু'জনেই পার পেয়ে যাবেন। কথিত আছে— কৃষ্ণ যখন নরকাসুরকে মারতে যান, তখন কৃষ্ণ-প্রেয়সী আদরিণী সত্যভামা যুদ্ধ দেখার বায়না করে দারুকের রথে চেপে বসলেন। পথে যেতে যেতে অভিজ্ঞ কোচোয়ান দারুক নরকাসুরের সাংঘাতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শোনাচ্ছিলেন। সত্যভামা শোনেন আর একান্ত স্ত্রীস্বভাবে চোখ দুটি গোল গোল করে অবাক হন। শেষে কৌতূহল চাপতে না পেরে দারুকে জিজ্ঞাসা করলেন— এত প্রভাব তার হল কি করে ? দারুক বললেন— হবে না ! ও যে বিষ্ণুরূপী বরাহের ছেলে। সত্যভামা বললেন— বিষ্ণুর অংশে জন্মেও তার এই কুস্বভাব ! ভাবা যায় না যে ! দারুক বললেন— এর একটা কারণ আছে। অতকাল পরে আপন প্রেয়সীর কৃতজ্ঞ কাতর মুখখানি দেখে আদি-বরাহ আসঙ্গ-লিপ্সায় অত্যন্ত উত্তেজিত হলেন বটে, তবে তখন ছিল সন্ধ্যার সময়। দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণটা মিলনের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়, এবং সেই সান্ধ্য-রমণে জন্ম বলেই নরকের অমন অসুরের মত চেহারা, অসুরের মত স্বভাব— তৎ সন্ধ্যাসময়-সমুৎপন্নতয়া তাদৃশীম্ আসুরীং তনুমাশ্রিতম্। (ধর্মসূরি, নরকাসুরবিজয়ব্যায়োগ)।

অর্থাৎ কিনা ছেলের যে স্বভাবচরিত্র খারাপ হল— তার কারণ গ্রহদোষ, কালদোষ— বাপ-মায়ের কোন দোষ নেই। ভক্ত কবিরা ঈশ্বরকে এইভাবে বাঁচাতে চান, বাঁচান। কিন্তু তাতে ঈশ্বর বাঁচেন না। ঈশ্বরের সৃষ্ট সমাজে আরও মানুষ-জন আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব মাথায় রেখেও তাঁদের নিয়ে রসিকতা করতে ছাড়েন না। ধন্যবাদ সেই অবচীন কবিকে, যিনি মৎস্য-কূর্ম-বরাহ— এই তিন ঈশ্বর-প্রাণীকে

চিবিয়ে খাবার কৃতিত্ব দিয়েছেন মিথিলাবাসীদের। আসল কথা— মৈথিলরা অনেকেই মাছ-মাংস খান এবং কচ্ছপ-শূকর কেউই তাঁদের অন্নগ্রাস থেকে মুক্তি পায়নি। কবি তাই লিখেছেন— বিষ্ণুর প্রথম তিনটি অবতারকে মৈথিলরা খেয়ে খেয়েই শেষ করে দিয়েছিল— অবতারত্রয়ং বিষ্ণোঃ মৈথিলৈঃ কবলীকৃতম্। পরম ঈশ্বর দেখলেন— মহা বিপদ, অবতার-স্বরূপ মৎস্য-কূর্ম-শূকরকে মৈথিলরা খেয়েই মেরে দিল! এ জিনিস তো চলতে পারে না। ঈশ্বর নাকি এই ভাবনায় ব্যথিত হয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁর অপ্রতিহত নরসিংহ মূর্তি ধারণ করলেন।

দেখুন, আমরা শাস্ত্রপ্রমাণে জানি যে বিষ্ণু নরসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন হিরণ্যকশিপুর মত দুষ্টের দমন এবং প্রহ্লাদের মত শিষ্টের প্রতিপালনের জন্য। কিন্তু রসিক কবি নৃসিংহ অবতারের কারণ হিসেবে কত সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মৈথিলরা মাছ, কচ্ছপ, শুয়োর—যাই খাক না কেন, সিংহ বা মানুষ খায় না— এইটাই যা ঈশ্বরের বাঁচোয়া। এমনিতে পুরাণকার এবং কবিরা নরসিংহ অবতারের সিংহভাগে সিংহের রূপ এবং গুণাবলী সন্নিবেশ করলেও—তাকে মানুষের আদল দিতে ভোলেননি। এইটাই বিষ্ণুর প্রথম অবতার—যার মধ্যে পৃথিবীর দুঃখ মোচন করার থেকেও করুণাগুণের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যায়।

পণ্ডিতেরা বলেন, হিরণ্যকশিপু যে স্তম্ভটিকে— 'কই তোর হরি' বলে পদাঘাত করেছিলেন, প্রতীকীভাবে দেখতে গেলে সেটি আসলে পৃথিবী— অর্থাৎ সেই ভূভারহরণ— 'সেভিয়ার মোটিভ'। অন্য 'মোটিভ' হল— ভগ্ন স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বর তাঁর সর্বময়তার প্রমাণ দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু দুষ্ট হিরণ্যকশিপুকে বধ করেও, তাঁকে উরুতে ফেলে বুক চিরে রক্ত খেয়েও নরসিংহ যে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারছেন না— এইখানেই তাঁর মনুষ্যত্বের অপেক্ষা। কবিরা দেখিয়েছেন— ক্রুদ্ধ নরসিংহ সিংহমুখে গর্জন করছেন, অত্যাচারী দৈত্য নিহত হয়েছে, তবুও গর্জন করছেন। ভারমুক্তা পৃথিবী এমনটি তাঁর তিন বারের অভিজ্ঞতায় দেখেননি। নতুন বিপদ দেখে আবার তাঁর কাঁপুনি আরম্ভ হল। কবি-দার্শনিকেরা দেখলেন এবারে আর ভূশক্তিতে হবে না, তাই তাঁরা বিষ্ণুর চিরকালের প্রেয়সী শ্রীশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে নৃসিংহের কোলে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও কোন সুবিধে হল না। রাগের মাথায় যা চাইছি, তা পাচ্ছি না, মাঝখান থেকে একটি স্ত্রীলোক এসে কোলে বসল— এতে আরও রাগ হবার কথা। লক্ষ্মীদেবী নরসিংহের কাছ থেকে ভীতচকিত হয়ে চলে গেলেন— পুরাতনী গৃহবধূর মত। যেন কর্তাবাবু কি নিয়ে বাড়ি মাথায় করেছেন, জানিনে বাপু—এমনি ধারায় লক্ষ্মীদেবীর প্রস্থান হল। শেষে ভক্ত প্রহ্লাদের স্তুতি-প্রার্থনা আরম্ভ হল। অমনি সব শান্ত হল, নরসিংহ শান্ত হলেন, তাঁর গর্জনও থেমে গেল। ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে সিংহ মুখেই তাঁকে চাটতে থাকলেন নরসিংহ, তাঁর রাগে ফুলে-যাওয়া কেশরগুচ্ছ নুয়ে পড়ল সব। কবি-শিল্পীরা তখন নির্ভয়ে তাঁর বাম কোলে বসিয়ে দিলেন লক্ষ্মীদেবীকে এবং ডান কোলে বসিয়ে দিলেন প্রহ্লাদকে। একই অঙ্গে এত রূপ দেখে সুদূর ফ্রান্স থেকে বিদেশিনী বিদুষী মাদাম বিয়ার্দো 'নরসিংহ : মিথ্ এত্ কাল্ত্' লিখে মন্তব্য করলেন— এই নরসিংহের মধ্যেই অবতারবাদ প্রথম মিশে গেল ভক্তিবাদে।

অবতারের অনুক্রমে নৃসিংহ হলেন মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মানুষের সন্ধিলগ্ন,

বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আপনারাও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, বিষ্ণুর অবতারগুলি কেমন করে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে অর্ধেক প্রাণী এবং অর্ধেক মানুষের কল্পনায় এসে পৌঁছল। এর পরেই তো সেই বেঁটে বামনটি, যিনি প্রহ্লাদের নাতি বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চেয়ে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল নিজের দখলে এনেছিলেন। পণ্ডিতেরা কেউ বামনের পাদপ্রসারণের মধ্যে বিষ্ণুর সর্বময়তা দেখেছেন, কেউ বা তাঁর ছলনা দেখে মন্তব্য করেছেন— Visnu's original character emerges from the realm of witchcraft, from the world of fairy being and charms. বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ইয়ান্ খণ্ডা লিখেছেন— বেঁটে বামন নাকি সবসময়ই ছলনা, বৃদ্ধি এবং ভূসম্পত্তির প্রতীক, সেই কারণেই বলির সঙ্গে ছলনা করে দেবতাদের ভূসম্পত্তি উদ্ধারের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় বামন-অবতারের মধ্যে। এ ব্যাপারে পণ্ডিতেরা যে যাই বলুন, ভাগবত পুরাণের কবি কিন্তু বামনকে এমন একটা নান্দনিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, যাতে পরম ঈশ্বরের সর্বময়তার থেকেও মনুষ্যোচিত ছলনা এবং মমতা সাহিত্যের বিন্দু স্পর্শ করেছে।

বামনের প্রথম পায়ে সম্পূর্ণ মর্ত্যভূমি এবং অন্তরীক্ষলোক ছেয়ে গেল, দ্বিতীয় পায়ে ছেয়ে গেল স্বর্গলোক, যা বলি সদ্য সদ্য অধিকার করেছিলেন। তৃতীয় পা-টি আর রাখবার জায়গা হয় না। মনে রাখতে হবে, এই তৃতীয় পা-টিই কিন্তু সেই— তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, যা বেদে এবং ব্রাহ্মণে অমৃতত্বের প্রতীক বলে চিহ্নিত। এই পা-টিই রাখবার জায়গা হচ্ছিল না। ভূমিদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলি মহারাজ অসাধারণ নাটকীয়তার মধ্যে নিজের মাথাটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— তোমার তৃতীয় পাটি রাখ আমার মাথায়— পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্। বাস্, পরম ঈশ্বর একেবারে মমতায় গলে গেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের মুখে স্বীকার করলেন আপন ছলনার কথা। বললেন— ধর্মের কথা বললে কি হবে, আমি যা বলেছি, ছল করে বলেছি। কিন্তু বলি তাঁর সত্য প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হননি— ছলৈরুক্তো ময়া ধর্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্। ছলনার কথা নিজের মুখে এমন পরিষ্কার করে বলেছিলেন বলেই জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে সোজাসুজি পদ আরম্ভ করতে পেরেছেন—সেই ছলনার কথা তুলেই—ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন।

এই রকম ছলনা করার পর ঈশ্বরের নাকি বড় মায়া লেগেছে। তিনি নিজে বলির বাসস্থান ঠিক করে দিয়েছেন সুতলে পাতালে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে তাঁর বাড়ির রক্ষী দ্বারপাল হতে স্বীকৃত হয়েছেন। পণ্ডিতেরা এর মধ্যে পুনশ্চ আর্য-অনার্যের মিলন-মহোৎসব দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু ওসবের মধ্যে না গিয়ে আমরা কবির রসিকতায় আসি। রসিক কবি বামনের মধ্যে যতখানি ভগবত্তা, যতখানি সর্বময়তা দেখতে পেয়েছেন, তার থেকে অনেক বড় করে লক্ষ করেছেন বামনের ভিক্ষুক-বৃত্তি। অন্তত দুই থেকে তিনজন কবি বলেছেন যে, ভিক্ষাবৃত্তি অথবা লোকের কাছে যাচনা মানুষের সমস্ত মহত্ত্ব নষ্ট করে। এই দেখুন না, যেমন পরম ঈশ্বরও যখন বলির কাছে ভূমি প্রার্থনা করেছেন, তখন তাঁকেও লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বেঁটে বামনটি হতে হয়েছে— হন্ত! বামনপদং প্রতিপেদে ভিক্ষুতামুপগতো জগদীশঃ। বঙ্ক বলে আরেক কবি, যদিও তাঁর কথার সুর প্রায় একই রকম, তবু তিনি আরও সুন্দর করে বলেছেন— এই পৃথিবীতে এ জিনিসটা আমাদের না দেখা নয় যে, ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের

সদ্‌গুণগুলিকে খাটো না করে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। 'সহস্রশীর্ষা' পুরুষটি বিশ্বম্ভর হয়েও যখন বলির কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ভিক্ষা চেয়েছিলেন, তখন লজ্জায় তাঁর সমস্ত অঙ্গগুলি তাঁর নিজের অঙ্গেই সেঁধিয়ে গিয়েছিল— বিশত্তি র্বিশ্বাত্মা স্ববপুষি বলিপ্রার্থনকৃতে/ ত্রপালীনৈরঙ্গৈ র্যদয়মভবদ্ বামনতনুঃ।

প্রাণী, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক প্রাণী, তারপর ছোট বেঁটে মানুষটি থেকে অবতারতত্ত্ব পরিণতি লাভ করল পরশুরামে এসে। রক্তে-মাংসে, রাগে, ক্ষোভে, বীরত্বে এই অবতারটিকে পরিষ্কার স্পর্শ করা যায় যেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, ক্রোধে ক্ষত্রিয়ের অধিক। জমদগ্নি ঋষির পাঁচ ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি হলেন পরশুরাম। পরশুরামের প্রথম পরিচয়— ইনি নিজের মাকে মেরে ফেলেছিলেন। মাতৃকাবতে চিত্ররথ নামে ভোজবংশের এক রাজাকে দেখে পরশুরামের মার ভারি ভাল লেগেছিল। তপস্বীর ঘরে পাঁচ ছেলের মা রেণুকার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল কেন—তা নিয়ে রীতিমত সামাজিক-অর্থনৈতিক গবেষণা চলতে পারে ; কিন্তু মোদ্দা কথা হল— চিত্ররথকে দেখে রেণুকার মনে হল— আহা! এই রাজা যদি শুধু আমারই হতেন—স্পৃহয়ামাস রেণুকা। ফল খুব খারাপ হল। জমদগ্নি সবই জানতে পারলেন, কিন্তু প্রথম চার ছেলেকে তিনি মাতৃবধে রাজী করাতে পারলেন না। পরশুরাম কিন্তু বাবার আজ্ঞামাত্র মা রেণুকার মাথা কেটে ফেললেন।

পরশুরামের দ্বিতীয় কীর্তি কার্তবীর্যার্জুন-বধ এবং সেই সূত্রে একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করা। কৃতবীর্যের ছেলে কার্তবীর্য-অর্জুন হৈহয় বংশের নামী রাজা। তিনি লঙ্কার রাবণকে পর্যন্ত যুদ্ধে বেঁধে ফেলেছিলেন। সেই কার্তবীর্য-অর্জুন পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে মেরে ফেলেছিলেন। পরশুরামের খুবই ভক্তি ছিল পিতার ওপর। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কার্তবীর্য-অর্জুনকে তো মারলেনই, উপরন্তু তাঁর ক্রোধকে প্রলম্বিত করে বার বার একুশবার পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় বংশগুলি উৎসাদিত করেছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, নিঃক্ষত্রিয় মানে তো ক্ষত্রিয়হীন। পরশুরামের এই অভিযানে তো তাহলে সমস্ত ক্ষত্রিয়দেরই মারা পড়ার কথা। কিন্তু আসলে তা পড়েনি এবং পড়েনি বলেই অবতারের সমস্ত শক্তিমত্তা, সমস্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁর চেয়ে কনিষ্ঠ অবতার রামচন্দ্রের হাতে তাঁর তেজ খাটো হয়ে গেল। একেবারে নববধূর সামনে রামচন্দ্র বলে বলে তাঁর ধনুক ভেঙে দিলেন এবং অপমানের চূড়ান্ত করলেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই অবতারকে নিয়ে কবিরা নয়, রসিকতা করেছেন আমাদের মুসলমান ভায়েরাই।

গপ্পোটা একটু খুলে বলি। আপনারা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের নাম শুনেছেন কিনা জানি না, তিনি তাঁর আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, আলংকারিক এবং কবি ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল— বীণাবাদিনী সরস্বতী পর্যন্ত তাঁর কবিতা শুনলে বীণা-বাদন বন্ধ করে দিতেন এবং সযত্নে তাঁর কবিতা শুনতেন। জগন্নাথ কবি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সটা কাটিয়েছেন বাদশাহ শাহজাহানের সভাকবি হিসেবে— দিল্লী-বল্লভ-পানি-পল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ। এ ছাড়া সেই যুগে তিনি বিয়ে করেছিলেন এক মুসলমান সুন্দরীকে। দিল্লিতে আসার আগে তিনি ছিলেন জয়পুরে। মহারাজ জয়সিংহ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে কাশী থেকে নিয়ে এসেছিলেন একটি মাত্র

কারণে। রাজস্থানের রাজপুত রাজারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতেন ; কিন্তু সেখানকার মুসলমান মোল্লারা বলতেন— মহারাজ ! এটা হয় নাকি ? আপনাদের পরশুরামজি একবার নয়, দুবার নয়, একুশবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে রেখে গেছেন। পৃথিবী এতবার নিঃক্ষত্রিয় হয়ে থাকলে আপনার পূর্বপুরুষেরাই শুধু বেঁচে ছিলেন— এটা তো কোন বাস্তব কথা নয়।

প্রশ্ন শুনে পণ্ডিতরাজ বললেন— এ আর এমন কি কথা ! এর জবাব আমি এক্ষুনি দিচ্ছি। মহারাজ ! নিঃক্ষত্রিয় মানে যদি ক্ষত্রিয়হীনতাই বোঝাত, তাহলে প্রথমবার পরশুরামের কোপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হওয়ার পর আর কোন ক্ষত্রিয়ই বেঁচে থাকত না, যাতে দ্বিতীয়বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার প্রশ্ন আসে। তার মনে—একটা লোককে যখন একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করতে হয়েছে, তখন প্রতিবারেই নিশ্চয় কিছু না কিছু ক্ষত্রিয় বেঁচে ছিলেন, নইলে বারবার একুশবারের প্রয়োজন হত না। আসলে নিঃক্ষত্রিয় কথাটার মধ্যে যতই নির্মমতা এবং শূন্যতার হিসেব থাক, এখানে ওই শব্দটার মানে হল— পরশুরাম প্রচুর ক্ষত্রিয় মেরেছিলেন এবং তিনি হয়তো অনেকবার এই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা তবু অনেকেই বেঁচে ছিলেন। আপনার পূর্বপুরুষেরা সেই বেঁচে থাকা ক্ষত্রিয়দেরই অধস্তন পুরুষ। রাজা খুশী হলেন বটে কিন্তু তাতে পরশুরামের মাহাত্ম্য কিছুটা কমল, যদিও আগেই বলেছি যে, পরশুরামের গর্ব পূর্বাহ্লেই খর্ব হয়ে গেছে অন্য অবতার রামচন্দ্রের কাছে।

॥ ৫ ॥

এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে, তাতে মনে হয় অবতার হিসেবে রামচন্দ্রের ভাগ্যটা হল সবচেয়ে খারাপ। এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে, রসিক ভক্তেরা তাঁদের প্রাণের ঠাকুরকে যখন একান্ত মানুষের মতই দেখতে পান, তখনই তাঁরা সবচেয়ে আনন্দ অনুভব করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো পরিষ্কার বলেছেন—কৃষ্ণের যতেক খেলা/ সর্বোত্তম নরলীলা/ নরবপু তাঁহার স্বরূপ। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে রামচন্দ্র একেবারে সম্পূর্ণ মানুষটি। প্রশংসা, বঞ্চনা, দুঃখ-শোক এবং পরিশেষে বিজয়লাভ—এ সব কিছুই তাঁকে সম্পূর্ণ মানুষটি করে তুলেছে। যে মহাকবি রামকথা জগতে অমর করে রেখেছেন, তিনিও রামচন্দ্রকে গড়তে চেয়েছিলেন একটি আদর্শ মানুষেরই আদলে।

কিন্তু হলে হবে কি, পরম ঈশ্বরের অতিরিক্ত মানুষ-ভাব জনসমাজে তাঁর ঐশ্বরিক দূরত্ব নষ্ট করে দেয়, এবং তাঁকে খানিকটা অবহেলার বস্তু করে তোলে। এটা ঠিক—রাবণ রাজার সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ জয়লাভ রামচন্দ্রের গুরুত্ব এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছে যে, যে কোন বড় জিনিসের উল্লেখ করতে গেলেই আমরা 'রাম' শব্দটিকে প্রথমে ব্যবহার করি। যেমন ধরুন যে দা দিয়ে আমরা পাঁঠা বলি দিই, কিংবা যে দা আমরা কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করি, তাকে আমরা বলি 'রামদা'। কিংবা আকাশে বিরাট ইন্দ্রধনুর আভা দেখে আমরা বলি 'রামধনু'। একই রকমভাবে 'রামশিঙা'র মধ্যেও বৃহদর্থে ব্যবহারটি বুঝলাম। কেন না, বাল্মীকি নিজেই যেখানে রামচন্দ্রের মধ্যে আদর্শ হিসাবে বিরাট, উদাহরণ হিসেবে মহত্তম একটি মানুষের আদল

আনতে চেয়েছেন, সেখানে বিরাট অথবা মহত্তম কোন কিছুর ক্ষেত্রেই 'রাম' শব্দটি পূর্বে ব্যবহার করায় আমরা একটু আশ্চর্য হচ্ছি না। এই দৃষ্টিতে দেখলে 'রামদা', 'রামধনু' কিংবা 'রামশিঙা'ও দা, ধনুক কিংবা শিঙার শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম উদাহরণ।

কিন্তু বাল্মীকি কি কখনও ভেবেছিলেন যে, তাঁর উপযুক্ত বংশধরেরা রামের মর্ম বুঝে বৃহদর্থে 'রামছাগল' শব্দটি ব্যবহার করবে! কিংবা ব্যঙ্গ করে অতি বোকা লোকটিকে বলবে, 'রামবোকা'? এমনকি শুধু ব্যঙ্গও নয়, মহাকবির কল্পনাতেও কি কখনও এই ছবি ছিল যে, একটি লোভাতুর মানুষ শুধুমাত্র লোভের বশবর্তী হয়ে মুরগির নাম দেবে 'রামপাখি'? সে কি মুরগিটি শুধু সাধারণ পাখির থেকে বড় বলেই? জানি, বাল্মীকির পক্ষে এ ভাবনা ভাবা সম্ভব নয়। কিন্তু লোকে যে বোকা লোককে 'হাঁদারাম', 'বোকারাম' অথবা 'ক্যাবলরাম' সম্বোধন করে তার একটা পরম্পরা নিশ্চয়ই থাকা দরকার, সত্যি কথা বলতে কি—তা আছেও।

পরবর্তী কালের ধুরন্ধর কবিরা রাম এবং রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর কতগুলি ব্যবহারে বোকামি খুঁজে পেয়েছেন। কেউ কেউ তো বলেছেন—কপাল, সবই কপাল। নইলে যে বিয়েতে জামাই হলেন পুরুষোত্তম, বিয়ের কনে স্বয়ং স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা সীতা, যাঁর বিয়ের ঘটক বিশ্বামিত্র মুনি, পুরোহিত বশিষ্ঠ, যে বিয়েতে কন্যাদান করেছেন রাজর্ষি জনক, আর বিয়ের সময়ে সমস্ত গ্রহগুলি যার একাদশ স্থানে, সেই লোকও বনে যায়! কি আর বলব—কবি বলেছেন—সবই কপাল—কিং ব্রূমো ভবিতব্যতাং হতবিধে রামো'পি যাতো বনম্।

কপাল যাই হোক, কপালের ধুয়ো দিয়ে রামেরও বোকামি ঢাকা যায় না। কবিদের মতে রামচন্দ্রের সবচেয়ে বড় বোকামি সেটাই বনে যাওয়া নয়। সেখানে পিতৃসত্য পালন করার মত মহৎ ব্যাপারও ছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় বোকামি হল অজানা অচেনা বনে বসে সোনার হরিণ দেখে ভুলে যাওয়া। খোদ রামায়ণে সীতা যখন হরিণের জন্য বায়না ধরলেন, তখন লক্ষ্মণ কিন্তু পরিষ্কার বলেছিলেন যে, এই হরিণটাকে কিন্তু আমি মায়াবী মারীচ বলে সন্দেহ করছি—তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্। শুধু তাই নয়, লক্ষ্মণ তাঁর সদাজাগ্রত বাস্তব-বোধে যে কথাটা বলেছিলেন—সেটা রামচন্দ্রের কাছে চরম পথ্য হতে পারত। লক্ষ্মণ বলেছিলেন—এমনটি হতে পারে না, এ রকম মণি-রত্নের গয়না-পরা হরিণ এই পৃথিবীতে থাকতে পারে না; এটি পরিষ্কার কোন রাক্ষসের মায়া—

মৃগো হ্যেবংবিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব।
জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ ৷৷

রাম কিন্তু সব বুঝেও সীতার কথায় মোহগ্রস্ত হলেন। লক্ষ্মণকে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়ে বললেন—সীতার যখন এই হরিণ নিতে এত ইচ্ছে হয়েছে, তবে এই হরিণকে আর জ্যান্ত ফিরে যেতে হবে না। এমনকি ও যদি মারীচ রাক্ষসও হয়, তা হলেও তার মৃত্যু হওয়া উচিত, কেন না মারীচ এতদিন অনেক মুনি-ঋষি খেয়ে বহু অন্যায় করেছে। অতএব মারীচ হলেও তার মরাই উচিত।

প্রাসঙ্গিক হোক অথবা অপ্রাসঙ্গিক, আমি একটি সামান্য ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি আমার পরিবারের কাছে শোনা এবং আমাদের দুজনেরই

উচ্চারণগত ত্রুটি থাকতে পারে। ঘটনাটা হল—পুরুলিয়া অঞ্চলে দেহাতী গোছের মানুষেরা রামলীলা অভিনয় করছেন। ক্রমে ক্রমে সেই সোনার হরিণের 'সিন' এসে গেল। সুদূর গ্রামে গঞ্জে ভাল আঁকা হরিণের 'সিন' আর কোথায় পাওয়া যাবে? অতএব হরিণের প্রতিনিধি হিসেবে গয়লাদের কাছ থেকে একটি মোষের বাচ্চা এনে গ্রাম্য 'সিনে'র মাঝখানে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল। অভিনয় আরম্ভ হল। অভিনেতা নায়ক এই একটু আগে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করেছেন, কিন্তু তাতে অভিনয়ে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

নায়িকা সীতা হরিণ দেখতে পেয়েছেন। দেখা মাত্রই সীতা বায়না ধরলেন—উই হরিণটা আমি লিব। সদ্যোমদ্যগ্রস্ত নায়ক বলছেন—উটা আবার কি লিবি, লিতে লাই। সীত তবু ছাড়েন না—তিনি খালি বলে যাচ্ছেন—উই হরিণটা আমি লিব, আর নায়ক বারবার তাঁকে বোঝাচ্ছেন—নঃ, উটা লিতে লাই। ও দিকে অভিনেতৃ-দলের দুজন লোক দুটো দড়ি সেই মোষের বাচ্চার গলায় পরিয়ে দিয়ে একেবারে পরস্পরের বিপরীত দিক থেকে মোষের বাচ্চাটিকে একবার এদিকে টানছে, আরেকবার ওদিক টানছে—মানে সোনার হরিণ দৌড়চ্ছে আর কি। সীতার বায়না আরও খানিকক্ষণ চলার পরে নায়ক কিন্তু একটু খেপেই গেলেন। মদের ঘোরেই হোক অথবা বাস্তব-বুদ্ধিতেই হোক—নায়ক এবার বলে উঠলেন— উটা কি লিবি, উটা ঘোষদিগের কাড়া বঠে—মানে গয়লাদের কাছ থেকে ধরে নিয়ে আসা মোষের বাচ্চা—ওটা নিয়ে কি হবে?

আমি শুধু ভাবি—মদের ঘোরেও একজন অভিনেতৃ পুরুষের যে বাস্তববোধ কাজ করেছে, আসল রামচন্দ্রকে বারংবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ তাঁকে বারবার সাবধান করে দিলেও—রামচন্দ্রের একবারও মনে হল না যে, এটা বোকামি হচ্ছে। মনে করবেন না—আজকে এই কলিযুগে বসে আমি পরমপুরুষ নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রকে বোকা বলছি। তবে এটা আমি কিংবা আমার মত করে অন্য লোকে না বললেও অন্যান্য বড় বড় কবিরাই এই ঘটনার মধ্যে রামচন্দ্রের বোকামি দেখতে পেয়েছেন। এ যুগের রবীন্দ্রনাথ না হয় কায়দা করে—'আমি ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই'—বলে মনুষ্যজীবনের একটি অধরা-ধরা কল্প সৃষ্টি করে গেছেন, কিন্তু সংস্কৃতসেবী কবিরা রামচন্দ্রকে একেবারেই ছাড়েননি এবং ছাড়েননি বলেই আজও আপনারা 'বোকারাম', 'ক্যাবলারাম', সম্বোধন এবং একেবারে বেমক্কা বোকামির ক্ষেত্রে—'রামো', 'হায় রাম' অথবা পুরো নাম ধরে 'রামচন্দ্র' বলে ধিক্কারসহযোগে নিজে নিজেই রামচন্দ্রকে স্মরণ করেন অর্থাৎ রামচন্দ্রের বোকামি স্মরণ করেন।

এর জন্য খুব বেশি পরে ঘোর কলির সংস্কৃত কবিদের কাছে যেতে হবে না। বাল্মীকির যুগের অব্যবহিত পরেই স্বয়ং ব্যাসদেব রামচন্দ্রের বোকামির উদাহরণ দিয়েই যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলার গোয়ার্তুমি ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য ব্যাস তো আর আমাদের মত 'বোকারাম', 'ক্যাবলারাম' বলবেন না, তিনি তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে একেবারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কথাটা বসিয়ে দিয়েছেন মহাভারত-বক্তা বৈশম্পায়নের মুখে। বৈশম্পায়ন তৎকালীন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললেন—যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বার পাশা খেলতে রাজি হলেন। পাশাখেলা ক্ষতিকর হবে জেনেও—জানন্নপি

ক্ষয়করং—যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেলতে বসলেন। এখানে উদাহরণ কি? না, সোনার হরিণের অস্তিত্ব অসম্ভব জেনেও—অসম্ভবো হেমমৃগস্য জন্তোঃ—রামচন্দ্র সেই কাল্পনিক মায়াবী হরিণের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। বৈশম্পায়ন রামচন্দ্রের এই বোকামি মাথায় রেখে ভদ্রভাবে মন্তব্য করেছেন যে, বিপদ যখন এসে পড়ে, তখন অতি বুদ্ধিমান লোকেরও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে।

অবতারপ্রমাণ নরচন্দ্রমার বিষয়ে এর থেকে ভদ্রভাবে আর কিই বা বলতে পারতেন ব্যাস। কিন্তু অন্য কবিরা তো আর এইভাবে ছেড়ে দেবেন না। তাঁরা একই কথা আরও একটু কড়াভাবে বলেছেন। একজনের মতে—সোনার হরিণ বলে কোন বস্তু কোন কালে ছিল না, সোনার হরিণ কেউ দেখেওনি—কিংবা তার কথা কেউ শোনেওনি—ন ভূতপূর্বো ন চ কেন দৃষ্টো/ হেম্নঃ কুরঙ্গো ন কদাপি বার্তা। তথাপি রঘুনন্দন রামচন্দ্রের লোভ হল—সেই অবাস্তব সোনার হরিণ চাই বলে। আসলে এই হয়, মরণের সময় লোকের উলটো বুদ্ধি হয়—বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।

রামচন্দ্রে কতগুলি গুণ যদি পর্বে পর্বে ভাগ করা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি হিসেব করা যায় যে, তাঁর জীবনে কোন জিনিসটা কখন সফল হচ্ছে, তাহলেও কিন্তু মহান রামচন্দ্রকে সাময়িক বোকামিগুলি থেকে রক্ষা করা যাবে না। যেমন আমরা প্রথমে কবির মত করে বলে নিই যে, রামচন্দ্রের শিশুসুলভ খেলাধুলো শেষ হল হরধনুভঙ্গে, পিতার প্রতি নম্রতা প্রকাশের শেষ সীমা বনগমনে, তাঁর কৃপাগুণের পরাকাষ্ঠা সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তাঁর রাজোচিত আদেশ দেওয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ সমুদ্রে সেতু-বন্ধন, যশের চরম চিহ্ন রাবণ-হত্যায়, আর তাঁর লোকাপেক্ষা এতটাই যে রামচন্দ্রের জীবন কেটে গেল তপোবন-প্রবাসিত জানকীর জন্য অপেক্ষায়—শ্রীরামস্য পুনাতু লোকবশতা জানক্যপেক্ষাবধি। জীবনের মধ্যে এতগুলি পর্ব থাকলেও রামচন্দ্রের বনে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই পরবর্তী কবিদের চোখে বোকামি বলে মনে হয়েছে। হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে মহত্ত্ব থাকলেও সেটা বুদ্ধিমত্তা বলে কবিরা ভাবতে পারেননি। মুশকিল হয়েছে—ভারতবর্ষের জনমানসে রামচন্দ্র ঈশ্বরপুরুষ বলে স্বীকৃত, তাই রামচন্দ্রের বোকামির কথা বলতে গেলেও সংবেদনশীল মনে আঘাত লাগার ভয়ে কবিরা সুর নরম করে বাক্‌বৈদগ্ধ্যে সে বোকামি প্রকাশ করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণ খুললে আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে, পিতার রসমধুর দাম্পত্য-শপথের দায় বহন করে অতি বশংবদ পুত্রের মত রামচন্দ্র বনে চলে গেছেন বটে, কিন্তু অযোধ্যার জনপদের বাইরে যেদিন প্রথম রাত্রির অন্ধকার ভয়ংকর শ্বাপদ আর ঝিল্লির শব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, সেদিন রামচন্দ্র যে নিজের ভুল খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন। সাময়িকভাবে হলেও তাঁর মনে হয়েছে যে, তাঁর বনে আসার ফলে সুবিধে হল শুধু কৈকেয়ীর। এই প্রসঙ্গে তিনি পিতাকেও এক হাত নিতে ছাড়েননি। নিজের হাতে সংগ্রহ করা তৃণ-পল্লবের শয্যায় শুয়ে শুয়ে লক্ষ্মণকে তিনি প্রাণের আবেগে বলেছেন—ভরতকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ রাজ্য গ্রাস করার জন্য কৈকেয়ী পিতা দশরথকেই মেরে না বসে—অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্। একে তো আমি নেই, তাতে রাজা বুড়ো এবং কাম-পরবশ, কৈকেয়ীর কথায় তিনি ওঠেন বসেন—কি যে করবেন কে জানে—কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ।

রামচন্দ্র এইটুকু বলেই থামতে পারতেন, কিন্তু পিতৃসত্য পালন করতে এসেও

পিতার অন্যায় ব্যবহার তিনি ভুলতে পারছেন না। তিনি বললেন—রাজা দশরথের মতিভ্রম দেখে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি যে, সাধারণের চতুর্বর্গ-চিন্তায় ধর্ম, অর্থ এবং কামকে যদিও ভাগ করে নিয়ে সমান প্রাধান্যে অর্থ ও কামের সেবা করতে বলা হয়েছে, কিন্তু এখন বুঝেছি যে, ধর্ম এবং অর্থের থেকেও কামই বড়—কাম এবার্থধর্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ, নইলে আমার বাবা আমাকে যেভাবে নির্বাসন দিয়েছেন, কোন মূর্খ পুরুষ তার আজ্ঞাবহ পুত্রকে এইভাবে পরিত্যাগ করতে পারে? এর পরে রামচন্দ্র খানিকটা অসুখী পুরুষের মত লক্ষ্মণকে বলতে থাকলেন—ভরতই আজ সবচেয়ে সুখী, কেন না নিজের বউ নিয়ে সেই আজ এই বিরাট কোশল রাজ্য ভোগ করবে। আমি রইলাম বনে, আর পিতাঠাকুরের জীবনই বা কদিন—তখন ভরতই এই সুসমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করবে—এক অধিরাজের মত। এত বয়স হয়ে গেল, তবু যে পিতা দশরথ কামনায় পীড়িত হয়ে বউয়ের কথায় নাচন-কোঁদন করছেন—তার আর কি হবে, তার এইরকমই গতি হয়—ছেলে বনবাসে যায়, আর তাঁর জীবিত অবস্থাতেই অন্য জন রাজ্য শাসন করে।

শেষে রামচন্দ্র মায়ের জন্য অনেক কষ্ট পেলেন। জননী কৌশল্যাকে কোনদিন সুখে রাখতে পারলেন না বলে বহুতর বিলাপ করলেন। পরমপুরুষ রামচন্দ্র একা তাঁর বাণযুদ্ধের ক্ষমতায় এখনও যে অযোধ্যা এবং সমস্ত ভূমণ্ডল অধিকার করেননি—সে শুধু অধর্ম আর পরলোকের ভয়ে—অধর্মভীতশ্চ পরলোকস্য চানঘ। সত্যি কথা বলতে কি, এই লোকাপেক্ষাই রামচন্দ্রের কাল হয়েছে। হয় পরলোকের ভয়ে রাজ্যত্যাগ করেছেন, নয়তো ইহলোকের ভয়ে বালিবধের কলংক মাথায় নিয়েছেন, নয়তো বা শুধুই লোকের ভয়ে—পাছে লোকে কিছু বলে— এই ভয়ে নিজের প্রাণপ্রিয়া পত্নীকেও বিসর্জন দিয়েছেন। এত যাঁর লোকাপেক্ষা, তাঁকে যে পরবর্তী কালের লোকেরা একটু আধটু হাঁদারাম, ক্যাবলারাম বলবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! আদর্শ ভাল, তাই বলে এত আদর্শ কি ভাল?

আমি জানি, আপনারা বলবেন—বৃদ্ধ পিতার এক কথায় আজ্ঞাবহ পুত্র বনবাসে গেলেন—এতবড় আদর্শ থেকে আমি রামচন্দ্রকে চ্যুত হতে বলছি? মহাশয়গণ! আমার এই আস্পর্ধা নেই। এমনকি আস্পর্ধা থাকলেও আদর্শবাদী রামচন্দ্র তা শুনতেন না। আপনারা জানেন—আপন আদর্শ বিষয়ে রামচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত গোঁয়ারগোবিন্দ। (এই রে! এ যে দেখি আরেক পরম পুরুষ গোবিন্দকে লোকে গোঁয়ার বলেছে—আমাকে নিশ্চয়ই এর জন্য চিন্তা করতে হবে।) রামচন্দ্র যেটা মনে করবেন—করবেন, তা থেকে তাঁকে কেউ সরাতে পারবে না। আস্পর্ধার কথাই যদি বলেন, তাহলে তাঁর প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ কি কম আস্পর্ধা করেছিলেন? কামাসক্ত বুড়ো বাপকে তিনি মেরে ফেলার কিংবা পরিত্যাগ করার হুমকিও দিয়েছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র শোনেননি। আমি তাই আদর্শ ত্যাগের কথা কখনও বলছি না, আমি শুধু বলছি অতিরিক্ত আদর্শ সৃষ্টিরও একটা কুফল আছে। কুফলটা বেশি না—ওই কলিকালের ছেলে-ছোকরা কবিরা তাঁকে একটু মশকরা করবেন হয়তো, হয়তো বা তারও পরবর্তী কালের বাঙালিরা তাঁর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা রেখেও ভুল-করা ছেলেটিকে বলবেন হাঁদারাম, ক্যাবলারাম। আপনারা আবারও বলবেন—অতিরিক্ত আদর্শ পালনের জন্যই যে এমনটি হয়েছে, তা কি করে জানলে? আমি আবারও বলব—জানি, যদি এ উদাহরণ

বিশ্বাস না হয়, আরও আছে। যুধিষ্ঠির। সারা জীবন 'ধর্ম, ধর্ম' করে কি তিনি খারাপ কিছু করেছিলেন ? শুধু পরবর্তী কালের লোকেরা ধর্মধ্বজী ব্যক্তমাত্রকেই কি যেন একটা ইঙ্গিত করে বলে—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। এর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিশেষ অশ্রদ্ধা নেই, আছে অতিরিক্ত 'ধর্ম ধর্ম' করার ওপরে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ।

যাক সে কথা। পিতার কথায় বনবাসে এসে রাম না হয় খুবই ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ বালি বধের মত বোকামি করতে গেলেন কেন, তা পণ্ডিতেরা কেউ বোঝেননি। বস্তুত এই মুহূর্তে রামচন্দ্রের অত্যাদর্শের সূত্র ধরে না হলেও, একাদশ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্র লিখেছেন—যাঁর মধ্যে ঔচিত্যবোধ সদা জাগ্রত এবং উচিত-অনুচিত নিয়ে যিনি যথেষ্ট বিচার আচার করেন (ইঙ্গিতটা রামচন্দ্রের দিকেই), তিনি যেন নিজের মনে মনে একটা যুক্তি খাড়া করে স্বার্থসাধনের চেষ্টা না করেন—ঔচিত্যপ্রচুরাচারো যুক্ত্যা স্বার্থং ন সাধয়েৎ। যদি এই রকম আদর্শ ব্যক্তি ওই ধরনের স্বার্থ সাধন করে, তবে তাঁর চরিত্র লোকচক্ষুতে মলিন হতে বাধ্য। ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন রামচন্দ্র। ঔচিত্যের ব্যাপারে তাঁর প্রচুর এবং প্রখর বোধ থাকলেও অন্যায়ভাবে বালিবধ করে তিনি তাঁর এতকালের যশের আদর্শ নষ্ট করলেন—ব্যাজবালিবধেনৈব রামকীর্ত্তিঃ কলঙ্কিতা। আসলে রামচন্দ্র স্বার্থও যে খুব ভাল বুঝেছিলেন তা নয়। স্বার্থের কথা চিন্তা করলে সুগ্রীবের চেয়ে বালিকে দিয়েই তাঁর বেশি সুবিধে হত। প্রথমত বালি সুগ্রীবের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন—একথা রামায়ণ থেকে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, যদি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কথা বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে রাক্ষসরাজ রাবণকে দমিত করার ব্যাপারে বালি ছিলেন পরীক্ষিত শক্তি। কারণ, উত্তরকাণ্ডে দেখা যায়—রাবণ রাজা বালির সঙ্গে স্পর্ধা করলে বালি তাঁকে বগলের তলায় পুরে ত্রিসন্ধ্যা জপ করেছিলেন চার সমুদ্রের তীরে। যদি উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত কথা বলে বিশ্বাস না হয়, তা হলে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বালি নিজেই যে কথা বলেছিলেন, তা বিচার করুন। বালি বলেছিলেন—সীতা উদ্ধারের কথা তুমি যদি আমায় বলতে, তাহলে রাবণকে আমি মৃত অবস্থায় গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে আসতাম—কণ্ঠে বদ্ধ্বা প্রদদ্যাস্তে' নিহতং রাবণং রণে।

এ কথা আমাদের অবিশ্বাস হয় না, এবং বালির এই আস্ফালন উত্তরকাণ্ডের বালির ক্ষমতার সঙ্গে মিলে যায়। যাই হোক, রাম যে বালিবধ করে অনুচিত কাজ করেছিলেন তার কারণ— সুগ্রীব নিজের দোষ ঢেকে, বালির দোষের কথা রামচন্দ্রের কাছে প্রকট করেছিলেন এবং রামচন্দ্রও নিজের স্বার্থ চেতনায় সাময়িকভাবে সুগ্রীবের তেলে ভিজেছিলেন। এই তেলে ভেজার ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল ধরেছেন চৈতন্যপন্থীরা, যাঁরা রামচন্দ্রকে ত্রেতাযুগের অবতার বলেই বিশ্বাস করেন। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে পরমানন্দ পুরীর প্রসঙ্গ টেনে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে লিখেছেন—অকর্তব্যো করে প্রভু সেবক রাখিতে। তার সাক্ষী বালিবধ সুগ্রীব-নিমিত্তে। (৩/৩/২৫২)

আদর্শবান ঈশ্বরপুরুষের এই স্বার্থচেতনা এবং আদর্শচ্যুতিতে রামচন্দ্রের অতি বড় ভক্তও ব্যথিত হয়েছেন। বাঙালি কথাকার কৃত্তিবাস বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন—

> কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঘটিলা বিষাদ।
> বালিবধ করে কেন করিলা প্রমাদ ॥

অবশ্য কলঙ্ক আর বোকামি তো এক নয়। বালিবধ রামের কলঙ্কই, বোকামি নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে বালিবধের মধ্যে রামচন্দ্রের বোকামিই বেশি, কারণ রাম যদি বালির সাহায্য নিতেন, তাহলে সীতার উদ্ধার হত অনেক তাড়াতাড়ি এবং তাও অনেক সহজে। আচ্ছা ধরে নিলাম—এটা রামের বোকামি নয়, কলঙ্ক। তাতেই কি কিছু আরাম হবে? সীতা দেবীর পুনরায় নির্বাসন—সেও তো আরেক বোকামি। একবার লঙ্কাকাণ্ড করে সীতা উদ্ধার, তারপর অতগুলো বানরের সামনে তাঁর অগ্নিপরীক্ষা, পুনশ্চ লোকের মুখে ঝাল খেয়ে আবার তাঁকে বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসন দেওয়া—বোকামির এই মালোপমা রামচন্দ্রের জীবন ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে? একাদশ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্র তো একেবারে চাণক্য-শ্লোকের মত শ্লোক লিখে বলেছেন—দেখ বাপু! একান্ত অনুগামী, গভীরভাবে আসক্ত, হিতকামী, অনুরাগী এবং সবচেয়ে বড় কথা নির্দোষ ব্যক্তিকে খবরদার ত্যাগ কর না। করলে রামের মত অবস্থা হবে। সতী সীতাকে ত্যাগ করে রামচন্দ্রকে যেমন সারা জীবন কেঁদে যেতে হল, তেমনি নির্দোষ ব্যক্তিকে বিনা কারণে বিসর্জন দিলে অন্যেরও একই অবস্থা হবে—রামস্ত্যক্‌ত্বা সতীং সীতাং শোকশল্যাতুরো'ভবৎ।

অন্য সব কিছুর থেকেও সীতাকে ফের বনবাস দেওয়াটা ক্ষেমেন্দ্রের কাছে বেশি বোকামি মনে হয়েছে। ক্ষুব্ধ আলংকারিক শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রকে তুলনা করেছেন একটি হাতির সঙ্গে। সংস্কৃতে অবশ্য প্রশংসা করার জন্যই হাতির তুলনা দেওয়া হয়, ক্ষেমেন্দ্রও তাই করেছেন। কিন্তু কনকজানকী গ্রন্থের শ্লোক লিখতে গিয়ে কবি বুঝেছেন যে, শুধুমাত্র লোকের কাছে ভাল সাজতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এত কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না, এবং এই মুহূর্তে অনুশোচনা করার কোন মানে হয় না। ক্ষেমেন্দ্র লিখেছেন—সীতা পরিত্যাগের শোকে তাপে রাঘব-কুঞ্জর একেবারে শুকিয়ে গেছেন—ক্লেশোষ্মণা শুষ্যতি। কিরকম রাঘব-কুঞ্জর? না, সোজা কথায়, যাঁর দুদিকে দুই কানের কাছে দুটি চামর দোলে, শঙ্খ-ধবল রাজছত্র যাঁর রাজবিভবের চিহ্ন বহন করছে—সেই রাজ্যসুখ বিদ্বেষ করে রামচন্দ্র এখন শুধু চক্ষু মুদে ভাবেন। ভাবেন আর শুকিয়ে যান। ভাবেন—একান্ত অনুরক্ত প্রিয়তমা পত্নীকে বিজন বনে একাকিনী কি কষ্টেই না রেখেছেন। শুধু এই অনুশোচনায় এতদিন পরে যে রাজ্যভোগের গ্রাস মুখের মধ্যে এল—সেই রাজ্যভোগ চিরতরে ত্যাগ করে তিনি এখন কেবল কষ্টে কষ্টে শুকিয়ে যাচ্ছেন—সংত্যক্তাং চিরমুক্তভোগকবলঃ ক্লেশোষ্মণা শুষ্যতি।

এমনই রামের অবস্থা। প্রথম জীবনে রাজ্যত্যাগ করে এসে জননী কৌশল্যার জন্য কষ্ট পেয়েছেন। লঙ্কাকাণ্ডে সীতা উদ্ধার করে তিনি সবার সামনে বলেছেন—তোমাকে আমার জন্য উদ্ধার করিনি, করেছি অযোধ্যার রাজমর্যাদা রক্ষার জন্য। আবার সীতা উদ্ধার করে সুখে রাজ্য করতে করতে প্রজাদের মুখে ঝাল খেয়ে হঠাৎ অনুরাগিনী পত্নীকে গর্ভবতী অবস্থায় পরিত্যাগ করলেন। এই সবগুলি আদর্শই যে তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, তার কারণ কিন্তু একটাই—লোকে তাঁকে ভাল বলবে, লোকে তাঁকে আদর্শ পুরুষ বলবে। তা বলেছে, চিরকাল বলেছে, এখনও বলে। আর সেইসঙ্গে আরও একটু বলে—হাঁদারাম, ক্যাবলারাম, বোকারাম। রামচন্দ্র জীবনে অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন, অতএব বিশিষ্ট আদর্শ স্থাপনের জন্য জনগণের কাছ থেকে যদি এই বিদ্রূপটুকু তাঁকে শুনতে হয়—তা তিনি 'হস্থি চলে

বাজার' নীতিতে অবহেলা করবেন বলে আশা করি।

॥ ৬ ॥

পরশুরাম, রামচন্দ্র—দু'জনের অবস্থাই দেখলাম, বাকি থাকলেন আরেক রাম—বলরাম—কাঁধে বাড়ি বলরাম, হল কাঁধে বলরাম। সমস্ত দেবচরিত্রগুলির মধ্যে এই এক চরিত্র, যাঁর মধ্যে মনুষ্যলোকের সম্পূর্ণ ঠিকানাটি পাওয়া যাবে। সরলের সরল, অন্যায়ে ক্রোধী, ফুর্তিতে পান-পাত্রের মুখচ্ছদ ভঙ্গকারী এক বিচিত্র চরিত্র এই বলরাম। মুশকিল হল, এই বলরামের কাঁধে একটি লাঙলখণ্ড মাত্র দেখে মিথলজিস্টরা বলরামের সঙ্গে চাষবাস আর ফসলের যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছেন। কৃষি-সম্পর্কান্বেষী এই পণ্ডিতদের আমরা কোনভাবেই আহত করতে চাই না, এই প্রবন্ধ তার উপযুক্ত পরিসরও নয়। আমরা চাই বিশিষ্ট দেবচরিত্রের মনুষ্যায়ণের সূত্রগুলি খুঁজে বার করতে, যে সূত্র আজও আমাদের ভাষায়, কথায়, প্রবাদে বর্তমান। একদা এক চরিত্রহীন গুরুদেব সময় বুঝে তাঁর রূপবতী শিষ্যাকে বললেন—'তুমি রাধে আমি শ্যাম'। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যগ্রক্রমে সেই যুবতী শিষ্যার স্বামী জীবিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর আপন স্ত্রীর রতিলিপ্সু গুরুদেবের প্রণয় নিবেদন শুনেই গুরুর কাঁধে একটি মোক্ষম লাঠির ঘা কষিয়ে বললেন—'তুমি রাধে আমি শ্যাম'—তাই না? তবে এই নাও 'কাঁধে বাড়ি বলরাম'। কথাটি প্রবাদবাক্যে পরিণত, এবং কৃষ্ণ-বলরামের সাধারণ চারিত্রিক গুণগুলিও এই প্রবাদে যা এক ঝলক দেখা গেল, তাতে বোঝা যায়—আমরা এখন দেবতার মনুষ্যাণের চরম বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি। নইলে, বলরামের মত এক কঠিন চরিত্রকেও এইভাবে উপস্থিত করা প্রবাদ-প্রণেতার পক্ষে সম্ভব হত না।

বস্তুত এই হলেন বলরাম। পান থেকে একটু চুন খসলেই তিনি কাঁধের লাঙলটি নামিয়ে এনে হত্যার ভয় দেখান, এবং সামান্য সম্মানে লাগলেই তাঁর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। সাধারণ চরিত্রটিও তাঁর বড়ই খোলামেলা। আমাদের এই বঙ্গের লাগোয়া বগুড়া জেলার প্রাচীন কবি লক্ষ্মীধর, যিনি হয়তো ১২শ/ ১৩শ খ্রীষ্টাব্দের লোক হবেন, তিনি ভারি সুন্দর একটি শ্লোক লিখেছেন বলরামের সম্বন্ধে। লক্ষ্মীধরের মতে বলরামের সাময়িক অবস্থাটা এইরকম— তিনি অতিরিক্ত মদ্য পান করে ফেলেছেন এবং মদের ঘোরে নিজের স্ত্রী ভিন্ন অন্য একটি মহিলার নাম করে কিঞ্চিৎ আসক্তি দেখিয়ে ফেলেছেন। ফল যা হয়, তাই হল। বলরামের প্রিয়া মহিষী রেবতী ঠোনা মেরে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকলেন। বলরাম কিন্তু জাতে মাতাল তালে ঠিক। গৃহিণীর ওইটুকুনি অভিমানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মদের ঘোর কিঞ্চিৎ কাটল কিন্তু মত্ততা যেন আরও বেড়ে গেল। তিনি বুঝলেন, রেবতীকে তুষ্ট করতে না পারলে অনর্থ ঘটবে। অতএব প্রিয়া পত্নীকে প্রসন্ন কারার জন্য তিনি এমন করতে আরম্ভ করলেন, কি বলব! লক্ষ্মীধরের কল্পনায় তিনি যতটুকু ধরা পড়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে—তিনি একবার রেবতীকে গাঢ় চুম্বন করছেন, একবার তাঁকে জড়িয়ে ধরছেন, আবার কখনও বা রেবতীর বুকের আঁচল সরিয়ে দিচ্ছেন—বিচুম্বন্ সংশ্লিষ্যন্ স্তনবসনম্ অস্যন্নবিরতম্। মদ্যপানে তাঁর মত্ততা এসেছে, আবার স্ত্রী মানিনী হওয়ার ফলে তিনি কি বুঝেছেন কে জানে—রেবতীকে প্রসন্ন করার পদ্ধতিগুলি একবার নয় বারবার প্রয়োগ করছেন

তিনি—অবিরতং মধূন্মাদাবিষ্টঃ।

আসলে এই মুহূর্তে রেবতীর সামনেই যেহেতু বলরামের মুখ ফসকে অন্য এক রমণীর নাম বেরিয়ে গেছে, তাই তাঁর অবস্থা কিঞ্চিৎ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাস্তবে কিন্তু বলরাম রেবতীকে অসম্ভব ভালবাসেন। আপনারা তো পৌরাণিকদের কৃপায় এবং স্বয়ং রাজশেখর বসু মহাশয়ের কল্যাণে এটা নিশ্চয়ই জানেন যে, রেবতী বলরামের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন এবং লম্বায়ও বড় ছিলেন। বলরাম তাঁকে লাঙলের আঁকশি দিয়ে নিজের মত করে ছোট করে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি রেবতীকে অতিক্রম করতে পারতেন না। এই ত্রেতা যুগীয় মহিলাটির ওপর তাঁর আকর্ষণ এবং অত্যাচার দুইই ছিল চরম। যে কোন কবিই বলরামের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা রেবতীর উল্লেখ না করে পারেননি। রেবতী এবং মদ্য—এইদুটিই ছিল কৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠ পুরুষটির প্রধান নেশা। সপ্তম/ অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের কবি মাঘ শিশুপালবধের পরিকল্পনা করার জন্য তিনজন বৃষ্ণিবীরের একটি আলোচনাসভার ব্যবস্থা করেন। কি করা উচিত—সেটা ছিল কৃষ্ণের প্রশ্ন। এর উত্তরে বৃষ্ণিদের নামী মন্ত্রী উদ্ধব কথা বলতে যাবেন তার মধ্যেই প্রথমে চেঁচিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন বলরাম। তাঁর গলার স্বরে সভাভিত্তি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তিনি কথা বলছিলেন কি ভাবে ? না—ঘূর্ণয়ন্ মদিরাস্বাদ-মদপাটলিতদ্যুতী—মদের আস্বাদনে চোখ দুটি যাঁর লাল হয়ে গেছে, সেই চোখ দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলছিলেন বলরাম। কবির কল্পনায়—বলরাম যতই চোখ ঘুরিয়ে কথা বলুন না কেন, তাঁর চোখের পাতাটি ছিল রেবতীর চুম্বন-আলিঙ্গনে পবিত্র—রেবতীবদনোচ্ছিষ্টপরিপূততটে দৃশৌ।

কবি বলে মাঘ যে কথা বলেছেন, রাজা বলে ভোজদেব বলরামকে তার চেয়ে আরও আধুনিক করে ফেলেছেন। রেবতীর বদনোচ্ছিষ্ট আঁখিতারার মালিকটিকে ভোজদেব একেবারে নিয়ে এসেছেন পানশালার মাতাল যুবকদের মধ্যে। ভোজ লিখেছেন—ওই পানগোষ্ঠীতে বসেই বলরাম তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন—হলী মদক্ষীবঃ পানগোষ্ঠ্যাং পুনাতু বঃ। কথাটা যে বাস্তবসম্মত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, যত বড় দেবতাই হোন, তাঁর যদি মদোমাতালদের মত মুহুর্মুহু মদ্যপান করার অভ্যাস থাকে, তবে সে দেবতার আসন যে পানশালায় পানগোষ্ঠীতেই বিছিয়ে দেওয়া হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা তো হবেই। মনুষ্যলোকে আমরা যেমন বিশিষ্ট একটি মানুষের স্বভাব, আচরণ অনুযায়ী তার চরিত্র বিশ্লেষণ করি এবং সমাজে তার স্থান নির্দেশ করি, দেবলোকের মনুষ্যগুলিও সেইরকম! দেবতাদের মনুষ্যায়ণ পদ্ধতিতে বলরামের চরিত্র এতই সজীব, এতই পরিষ্কার যে তাকে মাতাল সাজাতে কবিদের একটুও বাধেনি। তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন—কবিরা এত আশকারা পেলেন কোত্থেকে ? আমরা বলব—শাস্ত্রকারেরাই এই আশকারা দিয়েছেন, নইলে তাঁদের এত জোর কোথায় ? এই দেখুন না, হরিবংশ পুরাণ শাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—দেবদ্বিজে বিশ্বাসী হলে হরিবংশকে আপনার 'শাস্ত্র' বলে মানতেই হবে।—সেই হরিবংশে, একবার নয় অন্তত দশ-পনেরবার দেখবেন—বলরাম কিরকম মদ খান। রেবতীর সঙ্গে বিয়ের পর নানা রসের অনুষঙ্গে এই সুরাপানের মাত্রা হয়তো বেড়েছে, নইলে এ অভ্যাস তাঁর বহুদিনের। সেই যখন মথুরার রাজা কংস সবে মারা গেছেন, এবং সেই সূত্রে জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের ঝগড়াঝাঁটি চলছে, তখন বলরামের

পাল্টা আক্রমণের চেহারাটা দেখবার মত। জরাসন্ধ এবং তাঁর সহায় রাজারা গোমন্ত পর্বতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, কেন না কৃষ্ণ-বলরাম ওই পর্বতে ছিলেন। নিজে বাঁচতে এবং জরাসন্ধের দলকে উচিত শিক্ষা দিতে বলরাম যখন গোমন্ত পর্বত থেকে লাফ দিলেন, তখন তাঁর পরনে ছিল নীল বসন আর গলায় ছিল কদম-ফুলের গন্ধ দেওয়া মদ—কাদম্বরীমদক্ষীবো নীলবাসাঃ সিতাননঃ।

বলরামের তখন বিয়েও হয়নি। জরাসন্ধের সঙ্গে সেসময় একবার সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি হয়েছে। হঠাৎ বলরামের মনে হল—কয়েক দিনের জন্য বৃন্দাবনে ঘুরে আসলে কেমন হয়! যেমন বলা তেমনি কাজ। কৃষ্ণকে একবার বলে তিনি চলে গেলেন বৃন্দাবনে। পরিচিত পুরনো ব্রজবাসীরা বলরামকে দারুণ অভ্যর্থনা করল। এ-কথা সে-কথা, কংসের গল্প, জরাসন্ধের গল্প, গোপরমণীদের বিস্ময়চকিত মুখ—এই সব কিছুর পর বলরাম ঢুকলেন বনে, বৃন্দাবনের বন থেকে বনান্তরে। ঠিক এই সময়ে বলরামের মন বুঝে গোপালকেরা সব কড়া বারুণী মদ নিয়ে এল—গোপালৈ র্দেশকালজ্ঞৈ রুপানীয়ত বারুণী। বলরাম তখন তাঁর ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে সেই টলটলে হলদে বারুণী পান করলেন। সঙ্গে ছিল ভালরকম খাবারদাবার। বলরামের নেশা হচ্ছিল, নেশা জমছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর বেশ মত্ততা এসে গেল, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁর চোখ-মুখ সব ঘুরছে—স মত্তো বলিনাং শ্রেষ্ঠো ররাজাঘূর্ণিতাননঃ।

মদ্যপানে এই বলরামের অবস্থা—এই অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে বিয়ের পরে। ধরে ফেলবার লোক থাকলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। কাজেই বিয়ের পর একটা সুবিধে হল। তখন তিনি মদে মাতাল লাল চোখে রেবতীর কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটেন—রক্তেক্ষণো রেবতীমাশ্রয়িত্বা। মদ যাঁরা খান, তাঁদের যুক্তির অভাব হয় না। দুঃখে মদ খাচ্ছেন, আবার আনন্দে বন্ধুজনের মিলনে তাঁরা বলেন—এত আনন্দ রাখব কোথায়, মদের গেলাস আন। ফলে গোমন্ত পর্বত থেকে লাফানোর সময় বলরামকে মদ খেতে হয়, ব্রজের বনে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গেও মদ খেতে হয়, আবার এখন বিলাসিনী বারবধূরা যখন অভিনয়, নৃত্যগীত আরম্ভ করেছে, তখন কাদম্বরী মদ খেয়ে ফোলা ফোলা মুখ-চোখে রেবতীর সঙ্গে তাল দিতে দিতে তিনি সমে ঠেকা দিলেন এবং চেঁচিয়ে গান ধরলেন—কাদম্বরীপানমদোৎকটস্তু/ বলঃ পৃথুশ্রীঃ স চুকূর্দ রামঃ।

হরিবংশের এই শাস্ত্র-প্রমাণ দেখেও কি আমাদের কবিরা চুপ করে থাকবেন ? দ্বাদশ শতাব্দীরও খানিকটা আগের এক বৌদ্ধ কবি এবং ভাষাবিদ্ পুরুষোত্তমদেব, যাঁর এই বুদ্ধ এবং বলরাম—দু'জনের ওপরেই একটু আকর্ষণ বেশি ছিল, তিনি তো বলরামকে এমনভাবে এঁকেছেন যে, তাতে বলরামকে দেবতা বলে চেনাটা খুবই কঠিন হবে। আপনারা জানেন যে, মদে মাতাল হলে মানুষের কথাবার্তা স্খলিত হয় এবং কথার এক একটি শব্দ কেমন যেন প্রলম্বিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ রেখেও যে এই মাতলামি করে কথা বলা যায় সেটা পুরুষোত্তমদেবের কল্যাণে বলরাম দেখাতে পেরেছেন। বলরাম বলছিলেন—পৃথিবীটা যেন কেমন ঘু-ঘু-ঘুরছে—সংস্কৃতে—ভ্রভ্রভ্রমতি মেদিনী, চাঁদটা কিরকম ঝুলে পড়েছে মনে হচ্ছে, কৃষ্ণ! আমাদের স্বজাতি বৃষ্ণিরা সব হাহাহা হাসছে কেন—হহহসন্তি কিং বৃষ্ণয়ঃ। দেখ, আমার মদটা আমার মমমদের গ্রাসে আটকে গেছে, ওটাকে একটু খুখুলে দাও তো, কৃষ্ণ—শিশীধু মুমুমুঞ্চ মে

পপপপানপাত্রস্থিতম্।

পুরুষোত্তম কবি লিখেছেন—এইভাবে যিনি মদস্খলিত স্বরে আলাপ করে যাচ্ছেন, সেই হলধার বলরাম আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন। দেখুন, দেবতার কাজ মঙ্গল বিধান করা, তা তিনি অবশ্যই করবেন, বহুবার করেওছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার তিনি বৃষ্ণিবীরদের রক্ষা করেছেন, কৃষ্ণকে বহুবার আগলে রেখেছেন এবং মদ খান বলে তাঁর যুক্তি-তর্কও সব সময় লুপ্ত হয়নি। অত বড় ভারত যুদ্ধে অংশ না নিয়ে তিনি তাঁর নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, এবং সময়ে সময়ে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গিয়েও তিনি আপন স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর যৌক্তিকতারও অভাব নেই। কিন্তু এত বড় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কবিরা তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র নিয়ে বক্রোক্তি করতে ছাড়েননি, কিংবা বলতে ভোলেননি যে, ধরণী তাঁর কাছে চিরকালই ঘূর্ণায়মান রয়ে গেছে, সেই সঙ্গে তাঁর মাথাটাও।

একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে থাকা যাচ্ছে না। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশদের মাথা-ঘোরানো পণ্ডিত ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে আপনাদের মনে আছে, আশা করি। তিনি একবার রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গেছেন। রথযাত্রা আরম্ভ হবে। দেবদেব জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে তাঁদের পৃথক পৃথক রথে তোলা হচ্ছে। রথযাত্রার পূর্বাহ্নে জগন্নাথ-বলরামকে রথে কি ভাবে তোলা হয়—সেটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন—ওই পর্বে ওড়িশাবাসীদের ভক্তির থেকেও অন্য ভাব বেশি প্রকাশ পায়। ওঁরা অবশ্য বলেন—ওটা হল, জগন্নাথের প্রতি তাঁদের সহজ ভালবাসা, যাতে করে রথে ওঠবার সময় গোঁয়ার্তুমির জন্য তাঁদের কাছে গালাগালিও খেতে হয় জগন্নাথ-বলরামকে। যাই হোক, রথযাত্রার আগে নানা কসরত করে জগন্নাথ-বলরামকে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে নিয়ে এসে রথে ওঠানো হচ্ছে—ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সেখানে দাঁড়িয়ে। ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় পণ্ডিত তিনি, সবকিছুই তিনি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন।

অন্যান্য পণ্ডিত এবং গ্রহবিদ্ ব্রাহ্মণেরাও সেখানে আছেন। আর আছেন তদানীন্তন পুরীর রাজা মহারাজা চলদ্বিষ্ণু—তিনি সোনার ঝাঁটা হাতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। কারণ রথযাত্রার আরম্ভেই রাজার অভিমান-মঞ্চ থেকে নেমে এসে সাধারণ ঝাড়ুদারের মত তাঁকে রাজরাজ জগন্নাথের যাবার রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে হবে—এটাই পুরীর রাজবংশের চিরকালের প্রথা।

কিন্তু এ দিকে একটা ঘটনা ঘটে গেল। রথে ওঠানোর সময় বলরামের মূর্তি পাণ্ডা-ঠাকুরদের হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। উপস্থিত জনতা হৈহৈ করে উঠল। সংস্কারের বশে অনেকেই এ ঘটনাকে দুর্লক্ষণ বলে মনে করতে লাগল। স্বয়ং পুরীর রাজা চলদ্বিষ্ণুও একইভাবে বলরামের দারুমূর্তি পতনের ঘটনা দেখে বিচলিত হলেন এবং এতে করে যে নানা উৎপাতের সম্ভাবনা হতে পারে—সেটা ভেবেও চিন্তিত হলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দেখলেন—এই 'ঔৎপাতিক' ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমবেত জনসাধারণের আনন্দ মাটি হবার যোগাড়, স্বয়ং রাজাই চিন্তাহত হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় তিনি একটা কিছু বললে সবারই মনে একটু বল আসে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহারাজ চলদ্বিষ্ণুকে বললেন— মহারাজ! আপনি বললেন—'ঔৎপাতিক, ঔৎপাতিক'। কিন্তু এটা উৎপাতের ঘটনা তখনই হত, যদি

নারায়ণস্বরূপ জগন্নাথ পড়ে যেতেন, কিংবা যদি পড়ে যেতেন শক্তিরূপিণী সুভদ্রা। তা তো হয়নি। পড়েছেন বলরাম। যে বলরাম সব সময়ই মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছেন, কাদম্বরী পান করে যাঁর চোখ সব সময়ই ঘুরছে, সেই বলরামের মাটিতে পড়ে যাওয়াটা আশ্চর্যও নয়, ঔৎপাতিকও নয় ; বরঞ্চ যুক্তিযুক্ত—যুক্তং হি লাঙ্গলভৃতঃ পতনং পৃথিব্যাম্।

হায় ! ভগবৎস্বরূপ অবতার প্রমাণ বলভদ্রের যে এই অবস্থা হল, তাতে সাধারণের কোন অভক্তি হয়নি। পণ্ডিত-প্রবর জিতেন ব্যানার্জির গ্রন্থগুলি খুললেই দেখবেন—বলরামের উপাসনা, বলরামের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়ে গেছে সেই কোন খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। আজও তাঁর উপাসনা চলছে।

স্বীকার করি, সুযোগ দেখে মানুষ বুঝে বলরামকে নিয়ে না হয় কবিরা একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন, কিন্তু এ দুঃখ তাঁর থাকবে না—যখন তিনি দেখবেন আমরা কাউকেই ছাড়িনি। এই যে ভগবান বুদ্ধ, যার শান্ত প্রসন্ন মুখখানি দেখলে যে কোন কবিশিল্পীর হৃদয় বিগলিত হবে—সেই বুদ্ধ তো আর প্রথমে মূল ব্রাহ্মণ্য ধারার দেবতা ছিলেন না। আমাদের পণ্ডিত দার্শনিকেরা তো বুদ্ধ এবং বৌদ্ধপন্থীদের যা নয় তাই গালাগাল দিয়েছেন। ধরে নিলাম—তিনি মূল দার্শনিক প্রস্থানগুলির অন্যতম নন বলেই বুদ্ধকে গালাগাল খেতে হয়েছে। কিন্তু যখন তিনি আমাদের হলেন ? অর্থাৎ কি না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যখন দেখলেন বুদ্ধকে আপন করে না নিলে এ দেশের অনেকেই বৌদ্ধ হয়ে যাবে—সেই তখন তাঁরা বুদ্ধকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আত্মসাৎ করে নিলেন। জয়দেব কবি তাঁর আপন ব্রাহ্মণ্য-পরিমণ্ডলের মধ্যে বসেই গান ধরলেন—কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর। বুদ্ধ যাগযজ্ঞ বৈদিক বিধির নিন্দা করেছেন জেনেও জয়দেব দশাবতারস্তোত্রে বুদ্ধের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। এটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কূট কৌশলই হোক, কি উদারতাই হোক, কি সাময়িক সহাবস্থানই হোক—বুদ্ধ যেই আমাদের হলেন, অমনি তাঁকে নিয়ে মানুষের গালাগলি আরম্ভ হল। আজও পর্যন্ত যে হতভম্ব, বোকা-বোকা মানুষটিকে দেখে আমরা বুদ্ধু বলি—সে দোষ ভগবান তথাগতের মুখখানির। শিল্পরসিকেরা বলেন—বুদ্ধের মুখে যে নির্লিপ্ত হাসিটুকু, তাঁর চোখে যে নির্বাণের নির্মোহ ভাবটুকু—তার নাকি কোন তুলনা হয় না। অথচ দেখুন, ওই রকম একখানি মুখ সাধারণ্যে দেখলেই—তদুপরি সে যদি কথা না কয়, তার চোখ দুটি যদি প্রভাহীনতার দরুন অর্ধনিমীলিত হয়, তবে অবশ্যই সেই জড়বৎ মানুষটিকে আমরা বুদ্ধু বলে ডাকব। বুদ্ধের মুখে যে নির্লিপ্ত ভাবখানি আছে, যা এমনই নিস্তরঙ্গ, এমনই বুদ্ধমুক্ত যে, সাগরপারের লোকেরা পর্যন্ত তাঁর ভাব নিয়ে কল্পনা করেছেন। প্রখ্যাত ডি. এইচ. লরেন্স প্রায় একটি রতিবেগমুক্ত মানুষকে বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আমাদের কবিরা কিন্তু অন্তত বুদ্ধের ওপর আমাদের মত নির্দয় নন। তাঁরা বরঞ্চ বুদ্ধের দার্শনিক মতের ওপর তীব্র কটূক্তি করেছেন, যদিও তা এতই কায়দা করে যে, সাধারণের চোখে প্রায় ধরাই পড়বে না। আমরা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে দেখব—ফুলে ফুলে মধু-খাওয়া বহুবল্লভ নায়কের ক্ষণচঞ্চল প্রেমকে বৌদ্ধদের ক্ষণিক বস্তুর মত অস্থির বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন মতে প্রত্যেকটি ভাবই ক্ষণিক বা অস্থির। এই মুহূর্তে যার অস্তিত্ব আছে; পরমুহূর্তে সেটি নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে অন্য একটি নূতনতর ভাব অবশ্যই আছে, তারও পরের মুহূর্তে

সেটি কিন্তু বিলীন, যদিও আরও এক পৃথক ভাব তার স্থান নিয়েছে। এমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত ক্ষণভঙ্গের মধ্যেও বৌদ্ধেরা কিন্তু এটা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেকটি ভাব স্বতন্ত্র বা ক্ষণস্থায়ী হলেও তাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আছে। এবারে দুটি তত্ত্বই কবি কিরকম মিলিয়ে দিয়েছেন দেখুন।

নায়িকার খবর নিয়ে এসে নায়িকার দূতী নায়ককে বলছে—বহু রমণীকে প্রেম নিবেদন করে আপনি বহু-বল্লভ। ক্ষণভঙ্গবাদীদের বস্তুর মত আপনার প্রেম ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গুর অর্থাৎ এই আছে, এই নেই, আবার এই অন্যত্র আছে, আবার সেখানেও নেই। কিন্তু আমার সখীর প্রেম! সে প্রেম বহুভঙ্গে ভঙ্গুর ভ্রূভঙ্গের মত নিরবচ্ছিন্ন। বস্তুত নায়িকার প্রেমে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদের দ্বিতীয় অংশের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত। বারবার ভগ্ন হলেও ওই রমণীর ভ্রূভঙ্গে যেমন একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্তচমৎকারিতা আছে, বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদেও তেমনি ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গুর ভাবগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বর্তমান। এখানে বুদ্ধ কিংবা বৌদ্ধ দর্শনের ওপর যত কটাক্ষই থাক, নায়িকার প্রেমের অবিচ্ছিন্নতা এবং নায়কের প্রেমের অস্থিরতা বোঝানোর জন্য কবি গোবর্ধনের এই যে দার্শনিক কূটকাচালি—এ আর আমাদের ভাল লাগছে না। আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসি এবং সে প্রসঙ্গ এতই সজীব, এতই মনুষ্যজনোচিত যে, দেবতা বলে আর কোন ভয়ই থাকবে না।

॥ ৭ ॥

দেবতা যে একান্তভাবে মানুষই এবং মানুষ যে পরমেশ্বরকে মানুষ ভাবতেই ভালবাসে—তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলেন কৃষ্ণ। এই কারণেই কৃষ্ণ কোন অবতার নন, জয়দেবের দশ অবতারের মধ্যেও তাঁর স্থান হয়নি, তিনি একেবারে অবতারী অর্থাৎ সমস্ত অবতারের মূল নিদান। এত অবতারবাদ, এত ভগবান-ভগবান করে শেষে কি না একটা মনুষ্যাকৃতি যুবককে পরম ঈশ্বরের মর্যাদা দেওয়া হল! আমাদের ধারণা—ব্যাপারটা সবার চাইতে ভাল ধরেছেন চৈতন্যপন্থীরা। মানুষের চেহারাটাকেই তাঁরা পরম ঈশ্বরের আসল স্বরূপ বলে বুঝেছেন—কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা/ নরবপু তাঁহার স্বরূপ। শুধু তাই নয়, মানুষের হাব ভাব, মানুষের হৃদয় রসবৈচিত্র্য, ভালবাসা, শৃঙ্গার, ছেলেমানুষী, বড়মানুষী—সব কিছুই কৃষ্ণের মধ্যে চাপিয়ে আমরা এত খুশি হয়েছি যে, কৃষ্ণের ভগবত্তাই গেছে হারিয়ে। চৈতন্যপন্থীরা তো আবার সেই ভক্ত-বৈষ্ণবদের তেমন আমলই দেন না, যাঁরা কৃষ্ণের মধ্যে ভগবত্তা বা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যবোধ বড় করে দেখেন। তাঁদের কাছে—কৃষ্ণের কৈশোরগন্ধী বয়সের লীলখেলাগুলিই আরাধ্যতম ; এমন কি ভগবানের বাসস্থান হিসেবে অন্তরীক্ষলোকের কোন গোপন স্থানও তাঁরা নির্দেশ করতে পারেননি, বৃন্দাবনই তাঁদের কাছে সব—ধ্যেয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং বনং বৃন্দাবনং বনম্।

এই যে সাধারণ মনুষ্যলোকের অতি সাধারণ একটি স্থানের বিশিষ্ট একটি মানুষকে নিয়ে মানবায়িত কল্পনা—এর সুফল এবং কুফল দুইই আছে। সুফল এই যে, দার্শনিক তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে আমরা একটি মানুষের পরম দেবত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। কঠিন হলেও জীব গোস্বামীর মত দার্শনিক বলেছেন—আমরা কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা

করতে বসেছি, ভগবানের কৃষ্ণত্ব প্রতিষ্ঠা বসিনি—কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বম্। একটি মানুষের পরম ভগবত্তা অন্তরে সদা জাগ্রত রেখেও, তাকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও, তাঁকে ঘরের মানুষ করার সাধনা অতি কঠিন, তবু সে সাধনায় আমরা দার্শনিক ভাবেও সফল, ধর্মীয় ভাবেও সফল। কিন্তু এই অমিতমানবায়নের কুফলও আছে। কুফল এই যে, এতে আমাদের পূর্বতন জ্ঞান-সাধনা কিংবা ব্রহ্মচর্চার ওপরে এক অনর্থক ঘৃণা এসেছে। অতি মূর্খ একাধিক কৃষ্ণভক্তকে আমি নিজের কানে বলতে শুনেছি যে, অনির্বচনীয় ব্রহ্ম যেন একটি আবর্জনা-বিশেষ এবং জ্ঞানমার্গ যেন একটি বিষ্ঠাক্লিন্ন পথ। মজা হল, চৈতন্যদেবের বহু পূর্বে রসিক বিল্বমঙ্গল আগম-নিগমের কঠিন পথ ঘুরে ঘুরে শেষে মন্তব্য করেছেন যে, বৃন্দাবনের গোপিনীদের উলূখলের মধ্যে সমস্ত উপনিষদের অর্থ নিবদ্ধ আছে—উপনিষদর্থমুলূখলে নিবদ্ধম্। কিন্তু পরবর্তীকালের অনেক বৈষ্ণবই কোন কিছু ভাবনামাত্র না করে প্রথমেই মন্তব্য করেন—ব্রহ্মচর্চা ঘৃণ্য, এবং জ্ঞানমার্গ ততোধিক।

আমরা আবার দার্শনিকদের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হচ্ছি। কিন্তু এ আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল না। আমরা বলেছিলাম—পরম ঈশ্বরকে আমরা কতটা মানুষ করে ফেলেছি এবং কবিরা তাঁকে কতদূর মানবায়িত করেছেন—সেইটা আমরা দেখাব। বলেছিলাম—আমরা এটাও দেখাব যে, কবিদের পরম্পরায় আমরা পরম ঈশ্বরকে সাধারণ ভাষায় কতটা লঘু করেছি। বস্তুত এ বিষয়ে কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ, কারণ তাঁর ক্ষেত্রে বেশিটাই মানুষের দেবায়ন হয়েছে, দেবতার মনুষ্যায়ণ হয়নি। ফলে কৃষ্ণের নাম নিয়ে, বাসস্থান নিয়ে, তাঁর বিচিত্র ক্রিয়কলাপ নিয়ে আমরা জগৎসংসারে কিই না করেছি। পাঁচ-দশটি ছেলে যদি পাঁচ-দশটি মেয়ে নিয়ে এখানে ওখানে বসে থাকে, কি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে তাহলেই আমরা বলব—বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলেছে, রাসলীলা চলছে—আরও কত কি ? অথচ দেখুন, বৃন্দাবন কিংবা রাসলীলা বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে কি পরম পবিত্র ব্যাপার। ভাগবত বক্তা শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন—রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত্তক রাসলীলা যে মানুষ শুনবে তার হৃদয়ে আগে ভক্তি আসবে, তারপর তার মন থেকে কাম কিংবা মৈথুন চিন্তার মত যত রোগ আছে সব চলে যাবে। অবশ্য তার জন্য আপনার প্রথম কাজ হল শ্রদ্ধালু হওয়া। পুরাণকারেরা তো এইসব বৃন্দাবনের রাসলীলা ভক্ত ছাড়া অন্য কাউকে বলতেই না করেছেন—নাভক্তায় কদাচন।

কিন্তু কি আর করা যাবে। অভক্ত লোকেরা সব সময় ভক্তদের থেকে বেশি চালু হন। ফলে ভক্তদের গুপ্ত কথা তাঁরা জেনে নিয়ে অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করেন। কিন্তু শুধু এও হলে কথা ছিল। বুঝতাম যে অভক্তেরা ভক্তের শত্রু, তাই অমন করে ভক্তদের ধর্ম-তত্ত্বের কুপ্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তা তো নয়, ভক্তদেরও আমি এই সব কথা নিজের কানে বলতে শুনেছি, যুবক-যুবতী একত্রে হলেই এই উপমা তাঁদেরও মুখ থেকে বেরিয়েছে। ব্যাপারটা কি ? ব্যাপারটা সেই অতিরিক্ত মানবায়ন। আপনারা ভাববেন না যে, শুধু আমরাই প্রেমাবিষ্ট যুবক-যুবতীদের—বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলেছে, রাসলীলা চলছে—বলে গালাগালি দিয়েছি, এ বিষয়ে আমাদের গুরু হলেন কবিরা, অথচ তাঁদের কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা কম ছিল না। আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি, একেবারে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের কলিকালের উদাহরণ। আপনরা নিশ্চয়ই 'নিধুবন' শব্দটি

শুনেছেন। রাধাকৃষ্ণ পদাবলী সম্বন্ধে যাঁদের অ-আ জ্ঞান আছে তাঁরা 'নিধুবন' শব্দটি অবশ্যই শুনেছেন। কোথাও না শুনে থাকেন, সিনেমার গানে শুনেছেন—আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমারই সনে/ একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।

বোঝা যাচ্ছে—নিধুবন জায়গাটা লোকালয়ের একটু বাইরে, যেখানে হঠকারী প্রেমাস্পদকে একা পেলে প্রেমিকারা ছাড়ে না। আসল নিধুবনের তাৎপর্য কিন্তু আরও গভীরে। হ্যাঁ, শাস্ত্রমতে নিধুবন বৃন্দাবনের অন্তর্গত একটি কুঞ্জবন মাত্র, যেখানে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার লীলা চলত। কিন্তু আসলে এই নিধুবন শব্দটির অর্থই হল রতি-কেলি। বিশ্বাস না করেন রাজকবি গোবর্ধন আচার্যের শ্লোক খুঁজে দেখুন। তিনি অন্তত তিনবার 'নিধুবন' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন সাধারণের রতিকেলি বোঝাতে, ঠিক যেমন আমরা 'বৃন্দাবন' কি 'রাসলীলা' শব্দটির প্রয়োগ করি সাধারণ যুবক-যুবতীর নির্জন-রোমাঞ্চে। আচার্যকবির এক নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলন-আরম্ভেই ঘামতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু রতিক্রীড়ার এই ব্যাপারটা বোঝাতে কবি অন্য কোন শব্দ খুঁজে পাননি। তিনি নায়কের মুখ দিয়ে নায়িকাকে বলেছেন—নিধুবনী খেলা আরম্ভ না হতেই ঘামতে আরম্ভ করলে—প্রারব্ধ-নিধুবনৈব স্বেদজলম্ ? গোবর্ধনের লেখাতেই আবার আরেক জায়গায় দেখছি—এক চতুরা নায়িকার সঙ্গে এক বোকা নায়কের বিয়ে হয়েছে। পৃথিবীতে এমন গোবেচরা স্বভাব এবং চেহারার অনেক পুরুষ মানুষ আছে, যাদের দেখলে মনে হয়—সে বুঝি রমণীর প্রত্যঙ্গসংস্থান ভাল করে জানে না, বা বোঝে না। এমনই একটি মানুষের সঙ্গে এক চটকদার মহিলার বিয়ে হওয়ায় নায়িকার বন্ধুটি বলছে—সত্যি বটে ওর স্বামীটা একটা আস্ত বোকা—সত্যং পতিরবিদগ্ধঃ। কিন্তু আমার বন্ধুটি ওই সব নিধুবনের ব্যাপারে নিজেই দারুণ পোক্ত—সা তু স্বধিয়ৈব নিধুবনে নিপুণা। সংস্কৃত শব্দটা খেয়াল করলেন ? 'কামকলায় দারুণ, নিপুণ'—এই কথাটা বোঝাতে কবি বললেন—'নিধুবনে নিপুণা', ঠিক যেমন আমরা বলি—অমুকে রাসলীলা করছে। প্রসঙ্গেত বলে রাখি, এই নায়িকাটি নিজে নিজেই স্বশিক্ষায় কামকলা অধিগত করেছে, ঠিক যেমন দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি সামনে বসিয়ে একলব্য ধনুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা বুঝি সেই ধৃষ্ট নায়কের প্রতি, যার সঙ্গে এই চতুরার বিয়ে হয়নি।

যাই হোক, বৃন্দাবন কিংবা রাসলীলা বলতে আজকে আমরা যেমন বুঝি, দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধ্যায় বসন্তের বাতাস দিলে ঠিক তেমনিই বুঝতেন কবিরা এবং তারা নিঃসংকোচে কৃষ্ণের 'নিধুবন-পাণ্ডিত্য' স্মরণ করতেন যুবক-যুবতীর প্রেমবেশ বোঝাতে। এ তো গেল বৃন্দাবন কিংবা রাসলীলার তাৎপর্যের কথা, কৃষ্ণের নামের তাৎপর্যই কি কম ? একাধিক বহু রমণীর সঙ্গে আমরা যদি একটি যুবককে প্রেম করতে দেখি, কিংবা এটা-ওটা করতে দেখি তাহলে আমরা ওই ছেলেটির উপাধি দিই 'কলির কেষ্ট'। এর জন্য দায়ী কিন্তু সেই কৃষ্ণচরিত্র, সেই বৃন্দাবন, সেই শত শত গোপিনীরা এবং অবশ্যই মধুর মুরলীর পঞ্চম-চুরি-করা যমুনা-পুলিন। কৃষ্ণ ভগবান কিন্তু নিজেও কলি যুগেরই লোক—একথা বেশ প্রমাণ দিয়েই বলা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের অবতার-পুরুষ যাঁরা, তাঁরা জনগণের প্রতীতিতে অত্যন্ত সৎ এবং চরিত্রবান। পূর্বতন রামচন্দ্রের কথা তো আপনার জানেনই, তাঁর ভাই লক্ষ্মণের কথা উল্লেখ করে ঘরের বউরা পর্যন্ত দুরভিসন্ধানী দেওরদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন—এ খবর আমরা

হালের গাথাসপ্তশতীতে পেয়েছি। সেখানে কলি যুগ পড়া মাত্রই কৃষ্ণ ভগবান শতেক গোপীর সঙ্গে যে কীর্তিকলাপ করে গেছেন, তাতে তাঁর আপন কালের লোকেরাই তাঁকে 'কলির কেষ্ট' বলত কিনা আমাদের সন্দেহ। দেখুন, কৃষ্ণ যা করে গেছেন, তাতে উচ্চমার্গের দর্শন, মানে—পুরুষ-প্রকৃতি, আত্মা-পরমাত্মা, ব্যূহ-কায়ব্যূহ—এইসব সাংখ্য-বেদান্তের কূটকচালি ছাড়া—তাঁর সঙ্গে রাধা কিংবা অন্য গোপীদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা কঠিন। এ কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, পুরুষ মানুষ হিসেবে কৃষ্ণের আকর্ষণ ছিল সাংঘাতিক। দ্বিতীয়/ তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে লেখা সেই গাথাসপ্তশতীতেই আমরা খবর পেয়েছি যে, কৃষ্ণের যখন তরুণ বয়স ঘনিয়ে এল এবং তাঁর বিয়ের কথাবার্তা উঠল, তখন নাকি বৃন্দাবনের রমণীরা সব জননী যশোদার সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তার সূত্র চেপে যেতে লাগল। নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকলে যেহেতু বর-কনের বিয়ে হয় না, তাই কনেরা সব নিজেরাই যশোদার সঙ্গে আত্মীয়তা লুকোতে লাগল—সম্বন্ধাঃ নিহ্নূয়ন্তে/ সমং যশোদয়া তরুণগোপীভিঃ। আশঙ্কা এই—আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলে পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে না হয়। স্ত্রীলোকের কাছে এই যাঁর আকর্ষণ, সে মানুষটির পক্ষে বস্ত্রহরণ অত্যন্ত সাবলীল, রাসলীলা অত্যন্ত স্বাভাবিক। রাসলীলার বক্তা শুকদেব কিন্তু ভাগবত পুরাণে বারবার সাধারণ মানুষে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—বাপু হে! কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে যা করেছেন করেছেন, তোমরা যেন বাপু ভুলেও এমন কাজ কর না, মনে মনেও না, কারণ তুমি ঈশ্বর নও—নৈতৎ সমাচরেজ্ জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। আর যদি আমার কথা না শুনে এমনটি কর, তাহলে মরবে, শিব ছাড়া অন্য লোকে বিষ খেলে যেমনটি হওয়ার কথা, তোমারও তেমনই হবে।

হয়তো হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক যুবক পুরুষ এই কৃষ্ণায়ণ করতে গিয়ে মরেছেন। কিন্তু তাই বলে তো আর উদাহরণ লুপ্ত হয়ে যায় না। বিপদ আছে আরও। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতার দার্শনিক ভাষণে বড় গলা করে অর্জুনকে বলেছিলেন—বড় মানুষেরা যে আচরণ করেন, সাধারণ লোকেরাও তাই করে—যদ্ যদ্ আচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্ তদেবেতরে জনাঃ। বড় মানুষ যদি একটা উদাহরণ রেখে যায়, লোকে সেটা অনুসরণ করবেই—লোকস্তদ্ অনুবর্ত্তবর্তে। মহামতি শুকদেব পরীক্ষিৎকে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা বোঝাচ্ছেন, তখন কিন্তু এই গীতাবাক্য তাঁর স্মরণে ছিল। পরীক্ষিৎকে তাই তিনি বললেন—দেখ বাপু! ঈশ্বরের কথা হল আসল, তাঁর আচরণটা নয়। হ্যাঁ, আচরণটাও মাঝে মাঝে অনুসরণীয় বটে (যেমন ধর রামচন্দ্রের আচরণ), কিন্তু তাঁর কথাটাই ধরতে হবে ভাল করে এবং বুদ্ধিমান লোক তাঁর কথা অনুসারেই চলবে, আচরণ অনুসারে নয়—তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচারেৎ। কিন্তু শুকদেবের এত সাবধান-বাণী সত্ত্বেও অনেক লোকেই সে কথা শোনেনি। তাঁরা বলেন, মানে, আমরা বলি আর কি, যে, তুমি ভগবান হয়ে এক কথা বলবে, আর মানুষ হয়ে আরেক খেলা খেলবে তা তো হবে না। এই দ্বৈত আচরণের ফলে মানুষ বিমূঢ় হয়ে পড়েছে এবং তোমার উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমার আচরণও কিছু কিছু করে ফেলেছে। ফলত তার স্বাভাবিক উপাধি জুটেছে 'কলির কেষ্ট'। বলা যেতে পারে—সে না হয় আজকের দিনের চুল উড়ু-উড়ু বহুবিলাসী নায়কটিকে 'কলির কেষ্ট' বলে ডাকা গেল, কিন্তু তাই বলে তো আর সংস্কৃত ভাষায় কেউ বৃন্দাবনের

বহুগোপীরমণ কৃষ্ণকে 'কলেঃ কৃষ্ণঃ' বলে ডাকেনি। হ্যাঁ, মানলাম তা ডাকেনি। কিন্তু ওই যেমন আজকের 'বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলেছ' কি 'রাসলীলা চলছে'—এই কথাগুলো সেকালে 'নিধুবন' শব্দে প্রকাশ করা হএয়ছে, তেমনি চোর, লম্পট, বিট-বিটলে—এসব শব্দ তো কৃষ্ণের গা-সওয়া হয়ে গেছে। হতে পারে, এসব কথা আদর করে ভালবেসেই বলা হয়েছে এবং সে ভালবাসা এতটাই যে, প্রাণপ্রিয় পুরুষটির কোন দোষ দেখতে পায় না, অথচ স্ত্রীলোক সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর অতি-আবেশের জন্য তাঁকে গালাগালি না দিয়েও পারে না। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভুকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসতে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্য হল—কোন এক অতি শঠ যুবক তাঁর আপন মাধুর্যে হঠাৎ করে আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে, আর আমরাও যেন কেমন বাধ্য হলাম তাঁর ভালবাসার ভিখারি সাজতে—আসলে লোকটা কিন্তু কামুক, গোপরমণীদের সঙ্গে প্রচুর বিটলেমি করেছে—দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।

দেখুন বিটলে, বিটলেমি এমনকি বিটকেল শব্দটিও ওই সংস্কৃত 'বিট' শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় নিষ্পন্ন বলে মনে করি, যদিও বাংলা শব্দগুলির মধ্যে বিটের আসল চেহারাটা নেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিটের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, তাতে তবুও বিটকে মোটামুটি ভদ্রলোক বলা যায়। কিন্তু সেই ভদ্র পরিচয়ের মধ্যেও একটু বলা আছে যে, গণিকালয়ের আচার-ব্যবহারে সে একেবারে পাকা লোক, এবং সবচেয়ে বড় কথা—সে বুদ্ধিমান এবং চতুর। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, সাহিত্যদর্পণ, ধ্বন্যালোক—ইত্যাদি গ্রন্থে বিটের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ একত্রে সারসংক্ষেপ করলে দেখা যাবে—বিটের সবচেয় বড় পরিচয় হল—সে কামকলাকোবিদ এবং রমণীলম্পট, যদিও সে শিক্ষিতও বটে, রসিকও বটে। এখন শিক্ষিত লোক যদি কামকলায় অভিজ্ঞ হয়, তথা রসিক লোক যদি রমণীলম্পট হন, তাহলে তাঁর মাধুকরী ভালবাসায় যতটা আকর্ষণ থাকা উচিত, কৃষ্ণের তাই ছিল। ফলে ভাগবতপুরাণের সংস্কৃত পয়ারে রাধাকে একবার তীব্রভাবে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলতে হয়—তোমরা সব মৌমাছির দল, অন্য রমণীর স্তনকুম্‌কুম্‌-রাঙানো ঠোঁটে আমার পা-দুটিও ছুঁয়ো না, ছিঃ ; আবার পরমুহূর্তেই নম্র হয়ে বলতে হয়—তিনি কি এখনও তার অগুরুগন্ধী হাতখানি গালে দিয়ে, কোনদিন কোন কর্মহীন অবকাশে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করেন ? জিজ্ঞাসা করেন এই দাসীদের কথা ?

আমি তবু এই অবলা সরলা গোপরমণীদের কথা বুঝি, যাঁরা ওই চতুর রাখালের বাঁশি শুনে মজেছেন, কিন্তু আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু! তিনি কেন রাধার অবস্থা জেনেশুনেও অমন বিষময় রাধাভাব ধারণ করলেন ? তাঁর অবস্থাও রাধার মতই হয়েছে। অন্তরে তাঁকে ভালবাসেন, আর মুখে বলেন লম্পট। আবার মহাপ্রভুর কথা কেমন—সে লম্পট আমার যাই করুক, তবু তাকেই আমি ভালবাসি, শুধু তাকেই—যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

নীতিশাস্ত্র পড়ে পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে, জন্মান্ধ লোকেরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী, তাদের চেয়ে—যাদের চোখ ছিল এবং চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। ঠিক যেমন যাদের জীবনে প্রেম এসেছিল এবং প্রেম ভেঙে গেছে, তাদের চেয়ে সেই সব লোকেরা অনেক বেশি সুখী যাদের জীবনে প্রেম আসেইনি

কোনদিন। কিন্তু প্রেমেও পড়ব আবার প্রেমিককে লম্পট, বিটলে বলে গালাগালিও দেব— এ আবার কেমন ধারা, বিশেষত প্রেমিক যখন সত্যিই লম্পট। হয়তো প্রেমের গহন রাজ্যে এও এক ধরনের বিলাস, যা আমরা ভাল বুঝি না। অন্যদিকে কৃষ্ণের অবস্থাটা আন্দাজ করুন। এতগুলি মেয়ে তাঁকে ভালবাসে যে, তাঁর প্রথম যৌবনটা কেবলই এই দ্বন্দ্বে কেটেছে—শ্রীরাধিকে চন্দ্রবলী ! কারে রাখি কারেই ফেলি। শুধু এই দুজনই মাত্র নয়, আর যাঁরা আছেন তাঁরা শুধু কৃষ্ণপ্রেমের ওই প্রধান দুই দাবিদারকে তুষ্ট করতে গিয়ে আপন প্রেম বিসর্জন দিয়েছেন।

যাক এসব কথা, আমি তো কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য ব্যাখ্যা করতে বসিনি। আমার কথা হল—কৃষ্ণের ওই নিতি নিতি নৌতন প্রেমের সুযোগ নিয়ে কবিরা কিংবা সাধারণ লোকেরা কৃষ্ণকে কিংবা রাধাকে কতটা টেনে নামিয়েছেন, কতটা মর্ত্যলোকের ছাঁচ দিয়েছেন তাঁদের দেবত্ব উল্লঙ্ঘন করে। এমনকি কবিরা যে এই দেবতার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন কিংবা প্রনাম করেছেন কৃষ্ণকে, সেখানেও কৃষ্ণের রূপ হয়ে গেছে এমন, যার সঙ্গে দেবত্বের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই ; উল্টোদিকে বরঞ্চ লাম্পট্য আছে এতখানি যে এখনকার রাস্তার সবচেয়ে বেহায়া যুবকটিকেও আমরা কৃষ্ণের থেকে ভদ্রলোক মনে করতে পারি। একটি শ্লোকে দেখতে পাই—যশোদা চোখ পাকিয়ে কৃষ্ণকে জিগ্যেস করছেন,—তুমি কতটা মাখন চুরি করেছ কৃষ্ণ ? উত্তরে কৃষ্ণ সুমুখে দাঁড়ানো রাধার পয়োধরে আপন দুটি হস্ত সংস্থাপন করে নবনীতহরণের একটি পরিমাপ দেখিয়ে দিলেন এবং মুখে বললেন—এই এতটুকু নিয়েছি—ইয়দিতি গুরুজনসংসদি করধৃত-রাধাপয়োধরঃ পাতু বঃ। কবি লিখেছেন—এই যে নবনীতহরণের পরিমাণ দেখানোর জন্য রাধার উত্তমাঙ্গে এইমাত্র হস্ত সংস্থাপন করলেন কৃষ্ণ—এই হস্তই তোমাদের রক্ষা করুক।

আমাদের রক্ষা করার জন্য দেবতার আর কোন অভয়মুদ্রা খুঁজে পেলেন না কবি ! গুরুজনের সামনে আপন পুত্রের শৃঙ্গারমুখর ব্যবহার অতিরসিক ভক্তকে যত আনন্দই দিক, আমাদের মত সাধারণ কৃষ্ণভক্তকে তা বড়ই লজ্জা দেয়। ওপরের শ্লোকটি থেকে কৃষ্ণকে বাঁচানোর একটি সূত্র বেরিয়ে আসতে পারে যে, কৃষ্ণ রাধার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন এবং 'খোকা তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা খোকা তোমার ভারি ছেলেমানুষ'—এই নিয়মে কৃষ্ণ সাময়িকভাবে একটা গোলমেলে ব্যবহার করেছেন, আর এরকম হবে না। পৌরাণিকেরাও গর্গসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ইত্যাদির প্রমাণ দিয়ে এই কবিকে খানিকটা বাঁচাতে পারেন, কারণ, এটা সত্যি কথাই যে, গর্গসংহিতা এবং ব্রহ্মবৈবর্তের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কোন এক ঝড়ের রাতে পিতা নন্দ যখন তাঁর শিশু পুত্রটি নিয়ে এক বটগাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন, তখন কেমন কেমন করে রাধা এসে উপস্থিত হন সেখানে। নন্দগোপ রাধাকে দেখেই তাঁর কোলে কৃষ্ণকে দিয়ে বললেন— তুমি একে বাড়ি পৌঁছে দাও। রাধা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে ঘরের পানে এগিয়ে চললেন, বটে তবে বাংলার জয়দেব কবি এই ঘটনার মধ্যে অভিসন্ধি দেখেছেন, তাতে আর ব্যাপারটা অত সহজ রইল না। জয়দেব যা দেখেছেন, তাতে সেই মেঘ-মেদুর রাত্রে দুই পুরুষ-রমণী নাকি রাস্তার প্রত্যেকটি ছায়া-ঘন কুঞ্জের নির্জনতায় এমন কেলি করেছিলেন, যে কেলির অকুণ্ঠ জয়গান না করে পারা যায় না—প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং/ রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ। শিশু কৃষ্ণের এ

কি খেলা ! ব্রহ্মবৈবর্ত, গর্গসংহিতা কি নিদেনপক্ষে এই শ্যাম বঙ্গ দেশের জয়দেবের ভাব ভনিতা আমরা ভুলিনি। এই সেদিনও সুশীল দে মশাই তাঁর নবীন বয়সের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে বলেছেন— "যাত্রার সময় অল্প বয়স্ক কৃষ্ণকে যখন অধিক বয়স্কা রাধা কোলে তুলিয়া আদর করিত, যখন গান হইত—

চম্পকবরণী রাধা শ্যাম কচি খোকা।

রাধ্যাশ্যামে শোভে যেন আরশুলা-কাঁচপোকা ॥

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে এই যে যাত্রা দলের গান আমরা শুনলাম, এতে যে রাধাকৃষ্ণের প্রতি গায়েনদের কোন অশ্রদ্ধা আছে—তা আমরা মনে করি না ; ঠিক যেমন আমাদের পূর্বতন সংস্কৃত কবি এইমাত্র যে রাধার নবনীত-পয়োধর কৃষ্ণের হাতে দিয়ে, সেই হাতেই আমাদের রক্ষার ভার দিলেন—তাতেও আমরা মনে করি না যে, বর্তমান কবির কোন অশ্রদ্ধা ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রতি। এবং এই রকম কবি শুধু একজন নয়, শত শত আছেন, যামরা রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গমাত্রেই কিঞ্চিৎ আদিরসাপ্লুত হয়ে পড়েন। এমনকি গুরুজনের সামনেও এই আপ্লুতি তাঁরা চাপতে পারেন না এবং কৃষ্ণের শৈশবকালেও তাঁর মধ্যে যৌবনোচিত আবেগ সংক্রমিত করে এমন এক রসের সৃষ্টি করেন, যাকে রস না বলে রসাভাস বলাই ভাল। অথচ দেখুন—এ রসেরও পরম্পরা আছে। আমরা যাত্রাদলে যেমন গান শুনেছি, তার পূর্বসূত্র আছে সংস্কৃত কবির লেখায়, আবার তারও পূর্বসূত্র আছে পুরাণে—ব্রহ্মবৈবর্তে, গর্গসংহিতায় অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্রে।

জানি, কৃষ্ণের থেকে রাধার বয়স বেশি বললে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা আমায় মারতে আসবেন, এবং উপরিউক্ত সংস্কৃত শ্লোকে শৃঙ্গাররসের গৌণতা সম্পাদন করে বাৎসল্য রসের মহিমা খুঁজে বার করবেন। এ অভ্যেস তাঁদের আছেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তা হলে তা যশোমতীর বাৎসল্যের দোষ, যে দোষে বা গুণে কিশোর বয়সের কৃষ্ণকেও যশোদা গোপালটি করে রেখেছেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবরা বললেন—ওই শ্লোকটিতে কৃষ্ণের বয়স মোটেই রাধার চেয়ে কম নয়, নেহাত জননীর সামনে কৃষ্ণ শৈশব-চাপল্য প্রকাশ করছেন মাত্র। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা রূপ গোস্বামীর লেখা উল্লেখ করতে পারেন। অন্যেরা যশোদাকে বললেন—কৃষ্ণের আয়ু বাড়বে বলে রাধা তোমার বাড়িতে প্রতিদিন রান্না করে দিতে আসে, ওদিকে এসব দেখে রাধার শাশুড়ি জটিলা বড় সন্দেহ করে। যশোদা বললেন—দুধের বাছা কৃষ্ণের ওপর এই সব সন্দেহ কিন্তু বড়ই বাড়াবাড়ি। এ কথায় কুন্দলতা ফুট কাটলেন—হ্যাঁ, দুধের বাছাই বটে, গোবর্ধন পর্বত হাতে তুলছে যে ছেলে, সে তো দুধের বাছাই বটে! কুন্দলতা সম্পর্কে কৃষ্ণের বউদিদি, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন ঘটাতে তিনি কৃষ্ণের বড় সহায়। এরই মধ্যে কৃষ্ণ বাড়ি ফিরলেন। বড়মা রোহিণী বললেন— সেই কখন থেকে তোমার মা তোমার ফেরার পথ চেয়ে বসে আছেন, সেই বিকেল হওয়ার দুই প্রহর বাকি থাকতে। এখন তুমি মায়ের কোল জুড়ে বস দেখি বাছা। কৃষ্ণ পুরো বসলেন না, কেননা তিনি নিজে জানেন তাঁর শরীর ভারী হয়েছে। মায়ের কোলে বুক থেকে মাথা পর্যন্ত শুইয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন—মা! আমাকে একটা পাথর-বসানো গয়না গড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু। রূপ গোস্বামী মন্তব্য করেছেন—কৃষ্ণ এইভাবে বালক-সুলভ চপলতা করতে লাগলেন—ইতি বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চয়তি। কুন্দলতা বউদির বোধ হয়

মনে মনে কিঞ্চিৎ রাগ হচ্ছিল। কারণ তিনি সনর্মস্মিতহাস্যে বললেন—কৃষ্ণ! কুঞ্জে কুঞ্জে নানা খেলা করে তুমি বোধহয় একটু ক্লান্ত। তুমি বরং মায়ের কোলে শুয়ে মায়ের দুধ খাও। যশোদা একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। বললেন—বাছা! অত হাসির কিছু নেই। দেখ এখনও তোমার কৌমার-বয়স পেরোয়নি, তবে দুধ খেতে বাধা কি? কুন্দলতা বললেন—তা তো বটেই, তা তো বটেই, অজকেই তোমার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রাসের নাচ নাচ্ছিল কিনা। যশোদা বললেন—রাস আবার কি? এই সময়ে নাকি কৃষ্ণ লজ্জায় মরে গিয়ে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন কুন্দলতার দিকে—সাপত্রপং ভ্রূভঙ্গেন কুন্দলতামবলোকতে।

আমরা এই বৈষ্ণব নাটকের প্রসঙ্গ আর বেশি দূর নিয়ে যেতে চাই না। তবে এটুকু বুঝেছি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যেখানে বাৎসল্যের মহিমায় শৃঙ্গারকে আবরণ করবেন, অন্য সাধারণ কবিরা সেখানে বাৎসল্যের মোড়কে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররোচ্ছল মুহূর্তটিকেই রসসিক্ত করবেন। এই যেমন আরও একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখা যাচ্ছে—কৃষ্ণ বলছেন—মা! আমি যমুনার তীরভূমিতে কিছুতেই আর বাছুর চরাতে যাব না। যশোমতী চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করেন—কেন বাছা! কেন কেন? কি হয়েছে? কৃষ্ণ বললেন—গোপীরা সব আমাকে তাদের পীন স্তনযুগলে পিষ্ট করে ছেড়ে দেয়—কস্মাদ্ বৎস! পিনষ্টি পীবরকুচদ্বন্দ্বেন গোপীজনঃ। কৃষ্ণ যখন এসব কথা নিবেদন করছেন, তখন অনেক গোপীকুলবধূ যশোদার কাছে কাছেই ছিলেন। তাঁরা যশোদারও পরিচিত জন—সেই সুবাদে কৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে বাড়ি ফেরার আগে-পরেই যশোদার ঘরে ঢুকেছেন তাঁরা। উদ্দেশ্য—কৃষ্ণকে আরও খানিকক্ষণ দেখা যাবে। কিন্তু কৃষ্ণ যে এইভাবে তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেবেন তা কে জানত! কাজেই কৃষ্ণ যখন গোপীকুলের তথাকথিত নিষ্ঠুরতার কথা জানাচ্ছিলেন যশোদাকে, তখন গোপীরা প্রথমে ঠারেঠোরে আড়চোখে বহুতর ইঙ্গিত করলেন কৃষ্ণকে থামাবার জন্য। কিন্তু ধৃষ্ট নায়ককে যদি দুষ্টুমি একবার পেয়ে বসে সে কি আর থামতে চায়! অতএব 'ভ্রূসংজ্ঞাবিনিবারিতোপি' কৃষ্ণ বলতেই থাকলেন। বিপদ বুঝে গোপীরা তখন দু হাত দিয়ে কৃষ্ণের মুখ চেপে ধরলেন, আর আমাদের কবি বললেন—গোপরমণীর হাত-চাপা-দেওয়া—গোপীপাণিসরোজমুদ্রিতমুখো —ওই কৃষ্ণের মুখই তোমাদের রক্ষা করুন।

কবির আশীবার্দটি ভাল। এই আশীর্বাদের মধ্যে একটা মিষ্টি ছবিও আছে, যা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা—এও কি সেই শিশু কৃষ্ণ! নাকি এ সব-বোঝা পক্ব কৃষ্ণটি, যিনি শুধুই গোস্বামীমতে 'বাল্যবিলাস' বিস্তার করছেন। যদি বলেন ইনি শিশু কৃষ্ণ, তাহলে আমরা বলব—শিশু বয়স থেকেই তাঁর ওপরে কবিদের যৌবনোচিত ব্যবহার আরোপের ফলে অনেকের মত আমরা যেমন বিপদে পড়েছি, তেমনি যারা দেবতাদের লীলা-খেলা বোঝে না, তারা কিছু কদর্থও করেছেন। আপনারা জে. এল. ম্যাসন সাহেবকে চেনেন কিনা জানি না, তবে আমরা তাঁকে চিনি। তিনি ভারতবর্ষীয় রসতত্ত্বের ওপর বিলক্ষণ ভাল কাজ করেছেন, তবে আমাদের ধারণা তাঁর ওপরে মাঝে মাঝে ফ্রয়েডের ভূত চেপে বসে। বড় মানুষ। কিছু বলতেও পারি না, আবার গিলতেও পারি না। বিশেষত, কৃষ্ণলীলার তিনি যে বাখানি শুনিয়েছেন, তাতে আমারই বিব্রত অবস্থা, সেখানে খোদ কৃষ্ণভক্তেরা তো অভিনব

সাত্ত্বিক বিকারে মুচ্ছো যাবেন। ম্যাসন সাহেব আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির মত এক নামী পত্রিকায় বাংলার লক্ষ্মণসেনের আমলে সংকলিত একটি শ্লোককে উপজীব্য করে পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির একটি জীবন্ত উদাহরণ বানিয়ে ফেলেছেন।

শ্লোকটি আগে বলি। প্রথমেই স্মরণ করানো ভাল যে, কবি আবারও বলেছেন—কৃষ্ণ তোমাদের রক্ষা করুন। কি রকম কৃষ্ণ ? এই জিজ্ঞাসায় কিন্তু সেই শিশু কৃষ্ণের কথা আসবে। ব্যাপারটা হল—গোপীযুবতীরা সব শিশু কৃষ্ণের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুমো খাচ্ছিলেন, কোলে নিয়ে নিজেদের কাঁধে কৃষ্ণের কাঁধ মেলাচ্ছিলেন—অধরম্ অধরে কণ্ঠং কণ্ঠে। ঠিক একইভাবে কৃষ্ণের চোখে চোখ, কপালে কপাল। আবার যদি-বা কখনও কুলবধূদের অতি-আদরে কেঁদে উঠেছেন কৃষ্ণ তখন তাঁরা শিশু বলে কৃষ্ণকে বুকেও চেপে ধরেছেন। ফল হয়েছে খুব খারাপ, কবির পক্ষেও, আমাদের পক্ষেও। সুবিধে হয়েছে দু'জনের—স্বয়ং কৃষ্ণের এবং ফ্রয়েড-মানা ম্যাসনের। কবি লিখেছেন—গোপযুবতীদের এই অতি-আদরের ফলে কৃষ্ণের সুখ-শিথিল শরীরের কোন গহনে যেন পুলক দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটা রহস্যময় হাসিও দেখা দিল তাঁর মুখে—নিভৃতপুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ।

কবি বলেছেন—ওই হাসিই তোমাদের রক্ষা করুক। কিন্তু মজা হল, কৃষ্ণের এই মুহূর্তের মোহন হাসিটি আমাদের রক্ষা করতে পারেনি। বিশেষত ম্যাসন সাহেবের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাইনি বলেই কবি স্বয়ং এবং আমরাও খুব একটা সুরক্ষিত বোধ করছি না। ম্যাসন লিখেছেন—বৃন্দাবন হল এক কল্পলোক, মানুষের মনোরাজ্য। বৃন্দাবনের চৌহদ্দিতে সব কিছুই ভারি মনোরম, ভারি সুন্দর আর সুন্দরশেখর শিশু কৃষ্ণ সেখানে রাজা। এটা কিছুই আশ্চর্য নয় যে, এমন একটি শিশুকে স্তন্যদান করার জন্য মাতৃকল্প সমস্ত রমণীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। ম্যাসন মনে করেন— অধুনা উদ্ধৃত দিবাকরদত্তের কবিতার মধ্যে যেখানে কৃষ্ণের মাতৃকল্পারা কেউ কৃষ্ণকে চুম্বন করেছেন, কোলে নিচ্ছেন, কিংবা বুকে চেপে ধরেছেন—এই পরিবেশ কদিন পরেই কৃষ্ণ ফিরে পাবেন তাঁর যৌবনের ক্রীড়াভূমিতে সহস্র গোপীজনের সান্নিধ্যে। কারণ মাতৃকল্পাদের সান্নিধ্যে তাঁর যে আঙ্গিক বিকার হচ্ছে—'নিভৃতপুলকঃ' 'স্মরালসবিগ্রহঃ'—এগুলি কৃষ্ণের 'প্রি-অ্যাডোলেসেন্ট' কোন পর্যায়। ফ্রয়েড এবং কোহুতের শিশু-মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার পথ ধরে ম্যাসন শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কৃষ্ণ হলেন একজন 'নার্সিসিস্টিক পারসোনালিটি', যিনি একটি মাত্র রমণ-পাত্রে সন্তুষ্ট হন না, তাঁর যৌন-তৃষ্ণা অশেষ। হরিবংশ পুরাণের রাসনৃত্যে শতশত গোপরমণীরা যে কৃষ্ণকে যৌন আনন্দ দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন, তা নাকি এই 'নার্সিসিজম'-এর কারণে।

এই রকম একটা বিশ্লেষণ যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে এটাও ধরে নিতে হবে কৃষ্ণের পরবর্তী জীবনে কিছু বিকার ঘটেছিল। ম্যাসন যেটা বুঝলেন না সেটা হল—কবিদের বিদগ্ধ ভণিতাকে কখনই ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলামুহূর্তগুলি অবলম্বন করে কবিরা যা লিখছেন, তা নিতান্তই ব্যক্তি-কবির হৃদয়ের প্রতিফলন। যেহেতু রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের শৃঙ্গারোজ্জ্বল লীলাগুলি আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত, তাই কোন কোন কবি নিজের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রকাশ

করার জন্য রাধা-কৃষ্ণকে তাঁর আপন হৃদয়ের প্রতিরূপে বর্ণনা করেছেন। এতে যেমন কখনও আমরা অতি মধুর 'রোম্যান্টিক' শ্লোকগুলি পেয়েছি, আবার কখনও ব্যক্তিকবির মনের বিকারও চেপে গেছে রাধা-কৃষ্ণের ওপর, অবশ্য যদি ওগুলোকে বিকার বলা যায়। কৃষ্ণের প্রতি আমার আত্যন্তিক ভক্তি সত্ত্বেও, তথাচ ওই কবিতাগুলির মধ্যে শৃঙ্গার রসের গভীর বৈচিত্র্য থাকলেও, আমি এগুলিকে বিকার বলেই মনে করি। নইলে দেখুন আরও একটি অবচীন শ্লোকে দেখবেন 'লীলাপুরুষোত্তম' অথবা 'অবতারলীলাবীজ' কৃষ্ণকে একেবারে এখনকার রাস্তার 'লোফার' ছেলেটির মত লাগবে। সৌভাগ্যের বিষয়, বিকারের বলি এখানে রাধা নন। বলি—অন্য কোন ভাগ্যপীড়িতা গোপী, অন্তত আমাদের মতে তিনিই ভাগ্যহতই, কেননা ভর দুপুরবেলায় কাজে বেরিয়ে এরকম বিড়ম্বনা সবার কপালে জোটে না। তবে কবির মতে তিনি ধন্য হয়েছেন কেননা এটা কৃষ্ণের মজা, মশকরা এবং এই মজা করে তিনি ক্রমান্বয়ে গোপীটিকে, আমাদের কবিকে এবং আমাদেরও ধন্য করেছেন। কৃষ্ণ একটি গোপীকে চোর অপবাদ দিয়ে রাস্তা আটকে দিয়েছেন। বলছেন—কে বটে তুই চোর, নাম-ধাম-পরিচয় দে, কোত্থেকে আসা হচ্ছে ? গোপিনী বললে— তুমি কে হে বাবা, তোমার কাছে এসব বলব কেন ? কৃষ্ণ বললেন—আমি নগরপাল, প্রহরী। গোপিনী বললে— বটে, তা হয়েছেটো কি ? কৃষ্ণ বললেন— আমাদের রাজার দুটি সোনার ঘট চুরি গেছে, তাই চোর চাই ? গোপীনী বললে—চুরি করেছে কে ? আমি ? তা হলে তো আমার কাছেই সে দুটি থাকত ? কৃষ্ণ বললেন— তোমার আঁচলের তলায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তুমি লুকিয়ে রেখেছ। গোপিনী সন্ত্রস্ত লজ্জায়—কোথায় কোথায়— বলে গা-ঝাড়া দিয়ে বুঝি দেখাতে চাইলে— তার কাছে কিছুই নেই ! কিন্তু ততক্ষণে রসিকশেখর কৃষ্ণ— তাহলে 'আমিই দেখি বলে' যা করলেন— কবি, তাতে একটুও অপ্রস্তুত নন। কিন্তু সেই 'ধৃতবল্লবীকুচযুগ' পীতাম্বরকে দেখে আমরা স্বস্তি বোধ করি না, বিশেষত যে বাহানায় তিনি যে কাজ করলেন, তাতে তো নয়ই।

অথচ রাধাকৃষ্ণের তথা গোপী-কৃষ্ণের শৃঙ্গারলগ্ন মূর্তি আমাদের মোটেই অপরিচিত নয়। চিত্রকল্প কিংবা ভাস্কর্যে তো নয়ই, সংস্কৃত কবিতাতেও নয়। বাংলার দানলীলা, নৌকাবিলাস কি রাসলীলা সংক্রান্ত পদাবলীতেও শৃঙ্গারের কোন অভাব নেই। কিন্তু শৃঙ্গার যদি এতটা আভিধানিক হয় তাহলে বক্তা এবং শ্রোতা—দুয়ের পক্ষেই সেটা অস্বস্তিকর। কিন্তু এই অস্বস্তিকর পরিবেশের জন্য কৃষ্ণ নিজেই দায়ী আর দায়ী তাঁর নিজের জগতের কবিরা, যাঁরা তাঁকে মনুষ্যজগতের চরম আস্বাদন করানোর জন্য 'লোফার' সাজাতেও দ্বিধা করেননি। মূল কৃষ্ণচরিত্রে পারদারিকতা দার্শনিক এবং লৌকিকভাবে স্বীকৃত, কিন্তু এই স্বীকারের ফলেই এমন কবিরাও জুটে গেলেন, যাঁদের মানসিতার বিকৃতি এতটাই যে, অন্তরের দেবতাকে রাস্তায় নামাতেও তাঁদের দ্বিধা হয়নি। আমার বক্তব্য এই টুকুই, এবং কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ কবিদের আরও বহুতর উক্তি আমি সংকলিত করব না। যা করেছি, তাতে আমারই মানসিকতা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার—আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি, তাতে প্রণম্য দেবতা মানুষের দ্বারা লীলায়িত হতে হতে কতটা ব্যঞ্জনাহীনভাবে লোকায়ত হতে পারেন, তার পরম্পরাটি আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।

যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয় যে, কেন আরাধ্য দেবতার নাম ধরে এক জন বাতুলকে আমরা 'কলির কেষ্ট' বলতে দ্বিধা করি না। অস্বীকার করতে বাধা নেই যে, কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে কবিরা যতটা 'ক্রুড' হতে পেরেছেন অন্য কোন দেবতা সম্বন্ধে ততটা নয়। তার কারণ, এই নয় যে, শিব কিংবা অন্য কোন দেবতা রতিসর্বস্বতার ব্যাপারে অকুলীন ছিলেন, তার কারণ কৃষ্ণ একান্তভাবে লোকায়ত এবং পারদারিকতার দরুন তাঁর লোকায়ন অনেক ক্ষেত্রে বিকারে পর্যবসিত হয়েছে। একটি অবচীন শ্লোকের কথা মনে পড়ছে, যেখানে কবির উদ্দেশ্য ছিল সাধু, কিন্তু তাঁর শব্দচয়ন তাঁকে আমাদের কাছে বিকারযুক্ত করে তুলেছে।

কে না জানে—মধুযামিনীতে প্রেমিক-প্রেমিকা—দু'জনের দেখা হলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। রাধা-কৃষ্ণের মিলন-মুহূর্তগুলি তো এই বিস্মরণের মাধুর্যে এতটাই নান্দনিক যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কতগুলি কবিতার জন্ম হয়েছে এই সূত্র ধরেই। অথচ দেখুন এই হতভাগা কবি লিখেছেন—কৃষ্ণকে সমস্ত মন-প্রাণ নিবেদন করে রাধার অবস্থা হয়েছিল এমনই যে, তিনি এমন একটি পাত্রে মন্থন-দণ্ড ঘেঁটে যাচ্ছেন যাতে দই বা দুধ কিছুই নেই—মন্থানমাকলয়তী দধিরিক্তপাত্রে। আর কৃষ্ণর অবস্থাটা কি? রাধার উত্তুঙ্গ স্তন-চুচুকের দিকে লোল দৃষ্টি পড়ায় তিনি এতই উন্মনা যে, দুধ দুইছেন মনে করে তিনি একটি ষাঁড়ের অণ্ড দোহন করেছিলেন—দেবো'পি দোহনধিয়া বৃষভং দুদোহ।

এতসব দেখেশুনে আমার স্থির সিদ্ধান্ত যে কবিরা কৃষ্ণের ব্যাপারে যতটা নিষ্করুণভাবে লেখনী ধর্ষিত করতে পারেন, আর কোন দেবতার ক্ষেত্রে তা নয়। এর কারণ অবশ্যই সেই বিশিষ্ট দেবচরিত্র, যা কবিদের ইন্ধন যোগায়। কই শিবের ব্যাপারে তো আমরা কোন নাসিকাকুঞ্চন করি না। আমরা এমন শ্লোক দেখেছি— যেখানে ব্রহ্মার কাছে কার্ত্তিকের জন্ম-সংবাদ পেয়ে পুত্রজন্মের আনন্দে শিব নাকি ব্রহ্মাকে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরনের বাঘছালটি খুলে দিয়েছিলেন। সঙ্গে অবশ্য তাঁর কণ্ঠাভরণ সাপটিও দিতে ভোলেননি। কিন্তু এতে কি হয়েছে? শিবের এই কাণ্ড-কারখানার কথা শুনে তাঁর আপন গৃহিণী পর্যন্ত ঈষৎ হেসেছেন— ভাবটা এই— 'আমার পাগলা ভোলার কাণ্ড দেখ।' আর আমরা মানুষেরাও শিবের এই নির্মল ব্যবহারে এমন মোহিত হই যে, সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার নমস্কার জানাই—দিগম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়/ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

॥ ৮ ॥

আসলে এইটাই কথা। যে-দেবতা যে রকম, তাঁর স্বভাব-চরিত্রের পথ ধরে আমরাও ততটাই গিয়েছি। যৌন ক্রিয়াকলাপে শিব যে কিছু কম, তা আমরা মনে করি না। কালিদাসের কুমারসম্ভবের সপ্তম অধ্যায়ের পর যে বর্ণনা আছে, তা কিছু কম নয়। তবে শিবের সুবিধে তিনি পারদারিক নন, কাজেই সংসার সীমার মধ্যে আপন স্ত্রীর সঙ্গে তিনি যাই করুন না কেন, তাতে বড় জোর কবিরা তাঁকে পার্বতীর পেছন ধরা স্ত্রৈণ পুরুষটি বলতে পারেন, তাতে পতিব্রতা পার্বতীর মাহাত্ম্য আরও বাড়ে।

কবিরা তো পার্বতীকে 'হরনিতম্বিনী' উপাধি দিয়েছেন, মানে বোধ হয় শিব সব সময় পার্বতীর পেছনে এমনভাবে সেঁটে আছেন যে, তাঁকেই পার্বতীর নিতম্ব বলা যায়। কিন্তু এতে কুলবধূ হিসেবে পার্বতীর মাহাত্ম্য আরও বাড়ে। হ্যাঁ, এদিক ওদিক থেকে শিবের ওপর হঠাৎ হামলা করা গঙ্গাকে আমরা কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে শিবের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে দেখেছি কিন্তু চণ্ডিকার রক্তচক্ষু সব সময় আড়াল থেকে তাঁর দিকে নজর রাখছে— গিরিসুতাসাকেকরালোকিনী।

পুরুষ দেবতার অনুক্রমে স্ত্রী-দেবতার কথা এসে গেল, কিন্তু জগজ্জননী চণ্ডিকার কথা আমরা আগেই বলেছি। মনুষ্যায়নের পরিসরে একটি অভাবময় গৃহস্থের গৃহিণীর গৌরবে তিনি বরঞ্চ মহিমান্বিত। বলা বাহুল্য, এত সৌভাগ্য অন্য কোন স্ত্রী দেবতার হয়নি। এঁদের মধ্যে আবার সবচেয়ে ভাগ্যহত বোধ হয় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, যাঁকে আমরা ধনদায়িনী বলে প্রতি লক্ষ্মীবারে বন্দনা করে থাকি। আর সত্যি কথা বলতে কি—তাঁর মানসিক অবস্থা আর কতদিন ভাল থাকতে পারে! সেই কবে দেবাসুরের হুড়োহুড়ির মধ্যে সম্পূর্ণ মথিত হয়ে সমুদ্র থেকে উঠতে হয়েছিল, তার পর থেকেই তাঁর ধকল চলছে, জনগণকে টাকা-পয়সা দিতে দিতে তাঁর অফুরান ঘটেও বুঝি এখন টান ধরেছে। তার ওপরে মানসিক ধকলই কি কম? প্রথমে তো সমুদ্র থেকে উঠেই টান-টান হয়ে স্বয়ংবরা হয়ে দাঁড়ানো। তবু তার মধ্যে কিছু রোমাঞ্চ ছিল। সমুদ্র থেকে ওঠবার সময় আধেক দেখা দিতেই সমস্ত দেবতাদের চোখ এক সঙ্গে পড়েছিল তাঁর মুখে, বুকে, সর্ব অঙ্গে। সম্মিলিত দেবতাদের আনন্দ, অসুরদের বিস্ময়, রম্ভা-মেনকাদের অসূয়ার মধ্যে আমরা দেখেছি স্বয়ং নারায়ণের হাত থেকে মন্থনরজ্জুটিই কখন অজান্তে খসে পড়ে গেছে— অজ্ঞাত- স্বকরদ্বয়ী-বিগলিত। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ঠাকুরদাদা কেশবসেনের মতে অবশ্য ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়নি—ভগবান হরির চোখ নাকি পড়েছিল লক্ষ্মীর আপাণ্ডুর স্তনসীমার প্রান্তভাগে, তাঁর চোখ নাচ্ছিল। এ জিনিস লক্ষ্মীরও চোখ এড়ায়নি। বরমাল্য হাতে শ্রীহরি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী কি করেন? সমবেত দেবমণ্ডলীর সবার চোখ যে তাঁর দিকেই। একাদশ শতাব্দীর কবি ক্ষেমেশ্বর কিন্তু জানেন—লক্ষ্মী বিদগ্ধা মহিলা বটে। তিনি তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যেই বুঝিয়ে দিলেন—কে তাঁর কাম্য কে তাঁর কাম্য নয়। দেবকুলপতি ব্রহ্মাকে দেখেই তিনি হেলায় হেসে বললেন—পেন্নাম হই ঠাকুরদাদা—আখ্যাতে হসিতং পিতামহ ইতি। অর্থাৎ তোমার সঙ্গে সে সম্বন্ধ সম্ভবই নয়। শিব দেখে লক্ষ্মী যেন প্রমাদ গণলেন—বাবা এঁর হাতে যে নরকপালের ভিক্ষাপাত্র। দেবগুরু বৃহস্পতিকে দেখে লক্ষ্মী বললেন—নমস্কার গুরুদেব। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অগ্নিদেবতা। তাঁর তাপে তপ্ত হয়েই যেন ভীরু যুবতীটি দু'পা সরে আসলেন। এবারে দেবরাজ ইন্দ্রের পালা। পুলোমদুহিতা পৌলোমী শচীর নাম ধরে ডেকে তাঁর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করার জন্যই যেন ইন্দ্রকে উপহাস করলেন লক্ষ্মী। ভাবটা এই—পৌলোমী শচীকে বিয়ে করেও যে মানুষ আমার প্রতি এরকম লোলদৃষ্টি দিতে পারে সে আমাকেও ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন মহিলার ওপর একই চোখে তাকাতে পারে, তোমাকে বিশ্বাস নেই বাপু! এতগুলি দেবতাকে শুধু কথার জালে ফেলে লক্ষ্মী শেষে শ্রীহরিকে সম্বোধন করলেন পুরুষোত্তম বলে, স্বয়ংবরের পুষ্পাঞ্জলিটিও ন্যস্ত করলেন তাঁরই পায়ে।

লক্ষ্মীস্বয়ংবরের এত বড় খবর, তা আর অল্প করে রটবে কেন ? আরও এক রসিক কবির কল্পনাতে উড়ে গিয়ে কে যেন এই খবর দিয়েছিল শিবদয়িতা পার্বতীকে। সে কিভাবে, কি গল্প বানিয়ে পার্বতীকে খুশী করার চেষ্টা করেছিল জানি না, তবে কোন এক সন্ধ্যার আতাম্র আলোকে শিব যখন পার্বতীর মুখের পানে তাকিয়ে অদ্ভুত এক আবেশ অনুভব করছেন, সেই সময় আমাদের সপ্তম শতাব্দীর প্রথম রাজা হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের মনে হল— পার্বতীকে পুরো ন্যাকা সাজিয়ে দিই। সবাই জানেন শিব কালকূট বিষ খেয়েছিলেন লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উঠবার অনেক আগে। কিন্তু হর্ষদেব শিবকে পার্বতীর কাছে হেনস্থা করার জন্য সেই বিষপাত্র শিবের হাতে ধরিয়ে রেখেছিলেন লক্ষ্মীর আবির্ভাব পর্যন্ত। নইলে পার্বতী কি করে বলেন—হ্যাঁগা শম্ভু ! সবাই যে বলে—সমুদ্রমন্থনের সময় লক্ষ্মী উঠে যখন কেশবকে বরমাল্য পরিয়ে দিলে, তখনই নাকি তুমি দুঃখে আনমনা হয়ে বিষ খেলে ? হ্যাঁগো ! কথাটা কি সত্যি—শম্ভো সত্যমিদম্ ? শিব আর কি করেন, একে ভোলা, তায় এমন একটা অভিযোগ, তার ওপর সত্যিই তো ওই সময়, ওই অবস্থায় তিনি বিষ খাননি, বিষ খেয়েছিলেন দেবতাদের প্রয়োজনে, সৃষ্টিরক্ষার প্রয়োজনে। কিন্তু কপাল খারাপ, বিষ খাওয়ার ব্যাখ্যা পার্বতীর কাছে এইরকম।

তবে সুখের বিষয় মাতা চণ্ডিকা সেদিন খুব একটা রেগে ছিলেন না। আর সত্যিই তো, পার্বতী কি সব সময়ই রেগে চণ্ডী হয়ে থাকবেন ! আমাদের ভাষার দোষে আমরা চণ্ডী শব্দটাকে দজ্জাল মহিলাদের ওপর বারবার চাপিয়ে দিয়েছি, অর্থ না বুঝে। কিন্তু আমার কাব্যগুরু শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মশাই কর্কশ গাম্ভীর্যে আমাকে এক বকা দিয়ে বলেছিলেন—ওরে ! অমর সিংহ থেকে আরম্ভ করে মল্লিনাথ—সবাই তো 'চণ্ড' মানে বুঝলেন অত্যন্ত কোপন স্বভাবের লোক—চণ্ডস্তু অত্যন্ত কোপনে। আর শব্দটাকে স্ত্রীলিঙ্গে ফেলেই চণ্ডী মানে করে দিলেন অত্যন্ত রাগী মহিলা। জগজ্জননীর রূপ আর নিজের গৃহিণীর রূপ একই ছাঁচে ঢালা হল। কিন্তু চণ্ডী শব্দের সত্যিকারের মানেটা কখনও ভেবে দেখেছিস ? আমি সলজ্জে বলেছিলাম— সত্যিই ভাবিনি। অন্তত আপনার মত করে ভাবতে পারব এমন দুরাশা করি না। স্মিত হেসে কালিদাসবাবু বলেছিলেন— তবে শোন হতভাগা ! মূলে চণ্ডী মানে যদি কোন রাগী মহিলাকে বোঝাত, তাহলে মায়ের নাম চণ্ডী হত না। আর মেঘদূতের উত্তরকল্পে যক্ষ যখন প্রিয়ঙ্গুলতায় আপন প্রিয়ার শরীর অনুভব করছেন, হরিণের চকিত চাহনিতে প্রিয়ার কটাক্ষ দেখছেন কিংবা চাঁদের মধ্যে প্রিয়ামুখের ছায়া দেখছেন, তখন যক্ষ সেই প্রিয়াকে সম্বোধন করলেন 'চণ্ডী' বলে। বললেন— চণ্ডী আমার ! সব জায়গায় একটু একটু করে তোমাকে অনুভব করছি বটে, কিন্তু এক জায়গায় তোমায় পুরোটা পাচ্ছি না কোথাও—হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি। তা এইখানে যে বিরহাতুর প্রেমে যক্ষ 'চণ্ডী' বলে সম্বোধন করলেন ঈপ্সিতা প্রিয়াকে—এর মানে কি কখনও দজ্জাল রাগী মহিলা হতে পারে ? শিল্পী অধ্যাপক এখনও আমার কাছে রহস্য রেখে যাচ্ছেন, পুরোটা বলছেন না। আমি বললাম—তা এই চণ্ডীরহস্যের সমাধান কি স্যার ? কালিদাসবাবু বললেন—তাও বুঝলি না ! এ হল সংস্কৃত ভাষার ওপর প্রাকৃত ভাষার প্রভাব। প্রভাব এতটাই যে, মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে একটা শব্দ প্রাকৃতে গিয়ে, আবার সংস্কৃতে ফিরে এসেছে। মূলে শব্দটি ছিল 'চন্দ্রী'। আমি আঁতকে উঠলাম।

কালিদাসবাবু সস্মিতে বললেন—চাঁদের জ্যোৎস্না বলতে যে চন্দ্রিকা শব্দটা, সেটা যদি প্রাকৃতে—'চণ্ডিমা' বা 'চণ্ডিআ' হয়, তাহলে চন্দ্রী শব্দটাও প্রাকৃতে হবে চণ্ডী এবং সেক্ষেত্রে মানেটা দাঁড়াবে চাঁদের জ্যোৎস্না ধোয়া মোহিনী সুন্দরী, যার মধ্যে চাঁদের আহ্লাদকত্ব, সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা—সব আছে। শুধু এই অর্থ হলে, তবেই না জগজ্জননী দুর্গার অভিধা হিসেবে চণ্ডী শব্দটা সার্থক হবে, মেঘদূতের প্রিয়া সম্বোধনের অর্থও খুঁজে পাওয়া যাবে। আর ভাষাতত্ত্বের সূত্রে চন্দ্রী থেকে চণ্ডী হল প্রাকৃতে, আবার সেই চণ্ডী চলে এল সংস্কৃতে। এ রকম উদাহরণ আরও কত আছে।

বলা বাহুল্য—এই অভিনব ব্যাখ্যায় আমি চমকিত হয়েছিলাম। দেবী চণ্ডীর অসুরমারণ স্বভাব আমরা বাংলার দজ্জাল ঘরনীদের ওপর আরোপ করে তাদের রণচণ্ডী, ক্ষ্যাপা চণ্ডী বলে কতই না দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু হর্ষবর্ধনের লেখা শ্লোকটিতে দেখলাম—পার্বতীর অভিযোগ শুনে শিব বললেন— আমাদের সৌভাগ্য বলে কি কিছুই নেই পার্বতী, শেষে কিনা লক্ষ্মীর মুখ দেখে বিফল হয়ে আমি বিষ খাব! তা ছাড়া সবার ওপরে সাক্ষী আছেন ভালবাসার দেবতা অনঙ্গ—যাঁর প্রথম প্রয়াসে তোমাকে দেখেই আমি প্রথম আনমনা হয়েছিলাম। পার্বতীর সব স্মরণ হল। সেই হিমালয়ের কোলে অকাল বসন্তের হাওয়ায় নিজের অবস্থা এবং শিবের অবস্থা। পূর্বকথার স্মরণে, শিবের আকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে পার্বতী শুধু হাসলেন, হাসি দিয়ে ভুলিয়ে দিলেন নিজের অভিযোগ।

লক্ষ্মীর সঙ্গে শিবের কোন সম্পর্ক নেই ; তবু কবিরা তাঁকে জড়িয়ে শিবের সঙ্গে তামাশা করতে ছাড়েননি। আমরা যেমন বলি—আজকাল জামা-কাপড়ই সব, বিদ্যা, শিক্ষা, রুচির কোন মূল্য নেই। গরিব হলে তো আরও। দেবতাদের সমাজেও স্বাভাবিকভাবেই একই রকম রীতি হবে, যদি-বা নাও হয় কবিরা মিলিয়ে দেবেন। উদ্ভটসাগরের লেখক পূর্ণচন্দ্র একটি শ্লোক সংকলন করেছেন— যাতে লেখা আছে—মানুষ কিংবা দেবতা সর্বত্রই ওই একই কথা—ভাল জামা-কাপড়ই যত যোগ্যতার জন্ম দেয়। জামা-কাপড়ের চেকনাই না থাকলে লক্ষ্মীও সেখানে থাকেন না। এই দেখুন— সাগর-শ্বশুর যে বিষ্ণু-কৃষ্ণকে সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীকে দান করলেন, সে শুধু তাঁর চকমকে হলুদ রঙের কাপড়খানির বাহার দেখে। বাবাদের পাটোয়ারি বুদ্ধিটা চিন্তা করুন ; তিনি পীতাম্বর দেখে মেয়েটিকে দিলেন তাঁর হাতে, আর দিগম্বর দেখে শিবকে দিলেন বিষ— পীতাম্বরং বীক্ষ্য দদৌ তনূজাং/ দিগম্বরং বীক্ষ্য বিষং সমুদ্রঃ।

কবিরা দেবতাদের ব্যবহারে মানুষের কল্পনার রঙ লাগাতে বিষ্ণু কিংবা নারায়ণকে যে কৃষ্ণ বানিয়ে ছেড়ে দেন—সেটা আমার ভাল লাগে না। ভাল লাগে না এই জন্য যে, প্রথমত, লক্ষ্মীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হয়নি মোটেই, দ্বিতীয়ত, নারায়ণ কিংবা বিষ্ণু—কেউ পীতাম্বর ছিলেন না, তৃতীয়ত, সৃষ্টির প্রথম কল্পে যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের রাজত্ব চলছে, তখন কৃষ্ণ কোথায় আর তাঁর পীতাম্বরই বা কোথায় ? কিন্তু তাই বলে ভগবান বিষ্ণু যত গম্ভীরই হোন, তাঁকে যে আমরা মানুষ বানাতে পারিনি—তা মোটেই নয়। বরঞ্চ একান্নবর্তী পরিবারে নববিবাহিত বরটিকে যেমন রাত হলেই উসখুশ করতে দেখা যায়, আমরা লক্ষ্মীর সঙ্গে বিয়ের পর বিষ্ণুর অবস্থাও তাই দেখেছি। পুরুষ মানুষের আর কি ! ইচ্ছা প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্ণু লক্ষ্মীর

নীবিবন্ধে হস্তস্থাপন করেছেন। তখন রাত কি, ভাল করে সন্ধেই হয়নি। লক্ষ্মী গুণবতী বধূটির মত বিষ্ণুকে বলেছেন—লক্ষ্মীসোনা! এখন নয়, এই দেখ না তোমার শেষ নাগ যার ওপর পালঙ্ক রচনা করে শুয়ে আছি আমরা, সেই পালঙ্কই এখনও স্থির হয়নি, শেষ নাগ যে এখনও নড়াচড়া করছে! সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত এতটুকু গাঢ় হয়নি যাতে তোমার কৌস্তুভমণির ছটাটুকু ঢাকা পড়ে। আর ব্রহ্মাটাকে দেখছ, একটু আগে সামগান গেয়েছে আর এখন চক্ষু দুটি মুদে দেখাচ্ছে যেন ধ্যান করছে—মুকুলিতনয়নো নিদ্রয়া ধ্যায়তীব।

এই সব গূঢ় কথা লক্ষ্মী খুব চুপিসারে বিষ্ণুর কানে কানে বললেন এবং নীবীবন্ধ-বিঘটনার জন্য উদ্যত হরির হস্তটিকে সরিয়ে দিলেন মৃদু হেসে। এইভাবে তবু ভালই চলছিল লক্ষ্মীদেবীর। শেষ নাগের পালঙ্কে ক্ষীর সাগরের হাওয়ায় লজ্জিত বাসর শয্যায় ভালই দিন কাটছিল লক্ষ্মীর। কিন্তু লক্ষ্মীর কপাল ভাল না। একে তো তাঁর স্বামী বড় ব্যস্ত লোক। দশ অবতারের কাজকর্মে তাঁকে মাঝে মাঝেই পৃথিবীতে নামতে হয় আর স্বামীর সদা ব্যস্ততার ফলে লক্ষ্মীর চরিত্রও গেল খারাপ হয়ে। তবু যেন কেন শ্বশুর শাশুড়িরা গৃহবধূটিকে লক্ষ্মী বলতে ভালবাসেন তার কারণ বুঝি না। দশ অবতারের মধ্যে অন্তত দু-তিনটিতে লক্ষ্মী স্বামীকে সঙ্গ দেবার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে কখনও সীতা সেজেছেন, কখনও-বা লক্ষ্মী সেজেই এসেছেন কিন্তু তাঁর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল যখন বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে জন্মালেন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এমনই যে ভগবান বিষ্ণুকেও কবিরা হলুদ কাপড় পরিয়ে ছেড়েছেন। কাজেই কৃষ্ণ অবতারের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এই দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে যেখানে হালের কবিতায় লক্ষ্মীকে নারায়ণের দেহারূঢ় হয়ে পুরুষায়িত অভ্যাস করতে দেখেছি, দেখেছি সেই অবস্থায়ও কৌস্তুভ মণির আয়নায় লক্ষ্মীর নিষ্কলঙ্ক মুখের প্রতিবিম্ব—যস্য বক্ষসি লক্ষ্মীমুখং কৌস্তুভে সংক্রান্তম্—সেই নারায়ণই যখন কৃষ্ণ হলেন, তখন লক্ষ্মীর সমস্ত আদর গেল ফুরিয়ে। তখন গোপীদের চিকন গালে কৃষ্ণের ছায়া পড়তে থাকল। আর মাত্র দশম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাক্‌পতি মুঞ্জের পাথরে লেখা হয়ে গেল যে, লক্ষ্মীর মুখ আর ভগবান শ্রীহরির মনে ধরছে না—যল্লক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং—ক্রমেই তিনি রাধার বিরহে কাতর হয়ে পড়ছেন, শরীরে মনে কেবলই তখন রাধা-রাধা—রাধাবিরহাতুরং মুররিপো র্বেল্লদ্‌বপুঃ পাতু বঃ। এরই মধ্যে নষ্টদৃষ্টি কলিতে ভাগবত পুরাণ সূর্যের মত উদয় হয়ে লক্ষ্মীর মর্যাদা একেবারে ঢিলে করে দিল। মহামহিমময়ী লক্ষ্মীকে সে একেবারে বৃন্দাবনের গোপীদের পায়ের ধুলোর সমান করে দিল। সগর্বে ঘোষণা করল—ওই লক্ষ্মীর ওপর পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আর কোন অনুগ্রহ নেই—নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্ত রতেঃ প্রসাদঃ।

এ অবস্থায় কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। ভাগবত পুরাণের নতুন সূত্রে অভিভূত হয়ে পঞ্চদশ শতকের চৈতন্য মহাপ্রভু ঐশ্বর্যময়ী লক্ষ্মীকে একেবারে অচ্ছুৎ করে করে দিলেন। কিন্তু লক্ষ্মীর কি সর্বনাশ হল ভাবুন। আমরা তাঁকে দোষই বা দেব কি, ভাগবত পুরাণ কি চৈতন্যদেব, যত ক্ষতি করেছেন লক্ষ্মীর, তার থেকে অনেক বেশি করেছেন জন-সাধারণ। এবং তা কেমন করে জানেন? যারই ভাঁড়ারে টান পড়েছে, যে মানুষই টাকা-পয়সা খুইয়ে দরিদ্র হয়েছে, কিংবা যে কোনদিন টাকা-পয়সা

পায়নি—তারা প্রত্যেকে লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে গালাগালি দিয়েছে। দুঃখ লাগে—যে মানুষ প্রচুর অর্থলাভ করেছে, সেও যখন নেমকহারামি করে লক্ষ্মীকে গালাগাল দেয়। মহাকবি বাণভট্টের কথা স্মরণ করুন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহারাজ হর্ষদেব কি বাণভট্টকে কম ধন-সম্পত্তি দিয়েছিলেন! কিন্তু এত পেয়েও বাণভট্ট লক্ষ্মীকে কিই না বলেছেন! গণিকা, খলজনের প্রিয়া, দুষ্টপিশাচী, হিড়িম্বা রাক্ষসী—কোন গালাগালিই তাঁর লেখনীতে বাদ পড়েনি, ক্যরণ গালাগালিই হোক, কি ভাল কথা—বাণভট্টের লেখায় কিছু বাদ পড়ে না।

কিন্তু বাণের কথা থাক। বাণ ছাড়া অন্য কবি যাঁরা আছেন তাঁরাও বাণের উচ্ছিষ্ট উগরে দিয়েছেন কবিতায়। সোলুক আর শালূক বলে দুই কবি ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে। তাঁদের দুজনের ধারণা— মানুষের গুণ বলে যদি কিছু থাকে, লক্ষ্মী তার কদর জানে না। আসলে অনেক গুণ থাকার ফলে যেসব মানুষের অনেক টাকা-পয়সা থাকা উচিত ছিল বলে আমরা মনে করি, অথচ দুর্ভাগ্যবশত টাকা-পয়সা তাদের হয়নি, সেই হতাশা থেকেই লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছে। এককালে বাণভট্ট যা লিখেছিলেন, ঠিক তাঁর ছয় শতক পরে সোলুক তার পদ্যানুবাদ করে লিখেছেন— লক্ষ্মীর খুরে খুরে নমস্কার। তিনি বিদ্বান লোকের ধার মাড়ান না এই ভেবে যে পুঁথি পড়তে পড়তে যেন তার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে— বিদ্বান্‌ অক্ষরনষ্টধীরিতি। শুদ্ধশুচি লোকটিকে লক্ষ্মী ভাবেন যেন তার ধর্মের বাই আছে। ধীর স্থির লোককে তিনি ভাবেন বুঝি নিষ্কর্মা। রাগী লোককে ভাবেন বুঝি গ্রহের প্রকোপে ভুগছে। ক্ষমাশালী মানুষটিকে নির্বীর্য বলে, নীতিবাগীশ মানুষকে মায়াবী বলেই যেন লক্ষ্মী এড়িয়ে যায়। সোলুক-কবির ধারণা— গুণ থাকতেও যাঁদের গুণকে এইভাবে দোষ দিয়ে তাঁদের ধনসম্পত্তি দেন না লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীর খুরে খুরে দণ্ডবৎ। শালূক কবি কিন্তু সোলুকের এক কাঠি ওপরে। তিনি তাঁর স্বরচিত কবিতায় সোলুকের উল্টো পথে লক্ষ্মীলাভের মনস্তত্ত্বে পৌঁছেছেন। শালূক মনে করেন— টাকা-পয়সা এমন জিনিস যে ওটা থাকলে টাকা-ওয়ালাদের দোষও গুণের পর্যায়ভুক্ত হয়। ধনদায়িনী লক্ষ্মীর দোষ এইখানেই। শালূক বলেন— লক্ষ্মীর কৃপায় ধনী মানুষের রাগটাকে মনে হয় তেজ, বদমায়েশিকে মনে হয় লীলাখেলা, ব্যবহারের কৌশলকে মনে হয় ইন্দ্রজাল, বোকামিকে মনে হয় সরলতা। আর বড় মানুষ যদি অসভ্যতা করেন তখন মনে হয় লোকটা ভারি স্পষ্টবাদী। এমন লক্ষ্মীকে কি নমস্কার না করে পারা যায়?

বিশ-পঁচিশটা লক্ষ্মীবাদী কবিতা পড়ে আমরা বেশ বুঝেছি যে, অন্যান্য দেবতার গালাগালি খাওয়ার কারণ যদি সেই সেই দেবতার স্বভাব-চরিত্র হয়, লক্ষ্মীর ব্যাপারটা সেখানে পুরো আলাদা। তিনি গালাগালি খেয়েছেন মূলত টাকা-পয়সার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত আছে বলে। বিশেষত মূর্খ কিংবা অযোগ্য লোকের যদি টাকা-পয়সা থাকে, তবে তো, বিদ্বান কবিরা সঙ্গে সঙ্গে কবিতার জন্ম দিয়েছেন, একজন তো ব্যঙ্গ করে এমন লিখেছেন যে— লক্ষ্মী ঠাকুরানী বড় পতিব্রতা। তাঁর স্বামী বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ গরু চরাতেন বলে লক্ষ্মী এখনও গরুর মত মানুষের সঙ্গেই ওঠাবসা করেন— অহো দেবী পতিব্রতা। এই কবিতার পরেই যে কবিতাটিতে আমার মজা লাগে, সেটি এক বামুন কবির বানানো। কে না জানে বামুনরা অনেকেই বড় গরিব ছিলেন। রাজার ঘরে, কি জমিদার বাড়িতে ডাক-পাওয়া বামুনদের কথা ছেড়ে দিন, সাধারণ বামুনেরা

চিরকালই বড় গরিব। তা বামুনের ঘরে লক্ষ্মী কেন থাকেন না, তার কতগুলি সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বার করেছেন বামুন কবিরা। কবিতাটি লেখা হয়েছে বেশ পৌরাণিক কায়দায়। যেন ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করছেন— প্রিয়ে বামুনবাড়ির দিকে তোমার গতাগতি কম কেন—ভাবটা এই যে, অন্যের তুলনায় তাদের এত টাকা-পয়সা কম কেন ? এইবার কবিতাটি : নাথ ! এর কারণ শুনুন।

কারণ হিসেবে অবশ্য লক্ষ্মীর জবানীতে যা ধরা পড়েছে, তা অনেকটা ওই বাঘ-ছাগলের গপ্পোর মত—সেই যে সেই—জল তুই ঘোলা করিসনি, করেছে তোর বাবা। যাই হোক লক্ষ্মী বললেন— বামুনবাড়িতে আমি বেশি থাকি-না কেন জানেন ? দেখুন—বামুন অগস্ত্য আমার পিতা কালনিধি সাগরকে শুষে নিয়েছিলেন, এ কি কম অপমান! (অগস্ত্য অঞ্জলিপুটে সমুদ্র পান করেছিলেন এটা পৌরাণিক প্রসিদ্ধি।) আবার আস্পর্দ্ধা দেখুন—ভৃগু শুধু বামুন বলে ক্ষণিকের দেরি সইতে না পেরে আমার স্বামীর বুকে লাথি মেরেছিল। (ভাগ্যিস লক্ষ্মী কবি নজরুলকে চিনতেন না, কারণ এই কলিযুগে তিনি আবার বিদ্রোহী হয়ে 'ভগবান-বুকে' পদচিহ্ন আঁকতে চেয়েছিলেন।) আর এই আবাগী বামুনগুলোর ব্যবহার দেখুন ! ছোটবেলা থেকে আমার সতীন কাঁটা সরস্বতীকে যেন সব সময় মুখে করেই রয়েছে—স্ববদনবিবরে ধারিতা বৈরিণী মে। সব সময় পুঁথি পড়ছে আর পুজোর সময় আমার সাধের আসন, পদ্মগুলিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে শিবপুজো করছে। প্রভু বামুনদের ওপর আমার যে রাগ এবং আমি যে তাদের ঘরে পা রাখি না, তার এতগুলো কারণ— তস্মাৎ খিন্না সদাহং দ্বিজকুলসদনং নাথ নিত্যং ত্যজামি।

আমরা বেশ জানি— বামুনবাড়ির ওপর লক্ষ্মীর নির্দয়তার কারণ হিসেবে যা দেখানো হল—তা নেহাতই কবিদের বাক্‌চাতুরী। বস্তুত বামুনেরা সে যুগে পড়াশুনো নিয়ে থাকতেন— তাঁদের মধ্যে গুটি কয়েকেরই নামডাক হত এবং তাঁরাই রাজবাড়ি, জমিদারবাড়ির পরিপোষণা লাভ করতেন। সবার কপাল একরকম হয় না, তার ওপরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্মে লিপ্ত হলে তাঁদের জাত যেত, সম্মান নষ্ট হত। ফলে সাধারণ ব্রাহ্মণেরা এদিকেও যেতে পারতেন না, ওদিকেও যেতে পারতেন না। স্বাভাবিক কারণেই ব্রাহ্মণের টাকা-পয়সা হোত না, অতএব অভিমানে কবিতা লিখে লক্ষ্মীর চরিত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কবিরা সব বোঝেন। স্থান কাল পাত্র—সব তাঁদের জানা বলেই লক্ষ্মীর ব্যাপারে যেমন তাঁরা অভিমান ব্যক্ত করেছেন, তেমনি বাস্তব বুঝে এ কথাও তাঁরা পরিষ্কার লিখেছেন যে, লক্ষ্মী চপলাও না, অধম কিংবা মূর্খ-প্রিয়াও নয়। বীর, মানী, শঠ, বদমাস—যে-কেউ যে লক্ষ্মীলাভ করছেন—সে তাদের প্রাক্তন কর্মফল অথবা ইহজন্মের কাজের পুরস্কার। কিন্তু লোকের স্বভাব এমনই যে কারও টাকা-পয়সা দেখলেই অসহ্য হয়ে ওঠে এবং তার কলঙ্ক বার করে নিন্দা করে—লোকানাং কিমসহ্যতা সখি পুন দৃষ্ট্বা পরাং সম্পদম্। লক্ষ্মীর কথা বলতে বলতে কবি আর শেষে দেবতা বোঝেননি, বুঝেছেন টাকা-পয়সাই লক্ষ্মী। দেবতার আরাধনা, ফুল বেলপাতা আর নৈবেদ্যে যে লক্ষ্মী মেলে না, সে বিষয়ে কবিরা শেষ পর্যন্ত রায় দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—টাকা পয়সা যার আছে, তার আছে, যার নেই, তার নেই। অর্থাৎ যার আছে, তার লক্ষ্মী আছে, যার নেই, তার লক্ষ্মীও নেই। কবি মনে করেন— টাকা-পয়সারই আরেক নাম লক্ষ্মী, লক্ষ্মী কোন দেবতা নয় এবং সে

লক্ষ্মী যার আছে, সে কি কি করতে পারে ? সে বাঁকা মনে ধার্মিক লোকদের ঠকাক, মা-বাবাকে পেটাক, মাল খাক আর ঘরের সতী লক্ষ্মীকে ঝাঁটা মারুক—তাতে তার কিছুই আসে যায় না—হন্তু স্বাং জননীং পিবত্বপি সুরাং শুদ্ধাং বধূম্ উজ্ঝতু। সে চার বেদের মুখে ঝামা ঘষে দিক, কি কাউকে খুনই করুক—বেদান্ নিন্দতু বা হিনস্তু জনতাং—এসব চিন্তায় তার কিছুই আসে যায় না। টাকা-পয়সা যার আছে, সেই জগতের সবচেয়ে প্রশংসনীয় লোক, কোন কিছুতেই তার কিচ্ছু যায়-আসে না—লক্ষ্মীর্যস্য গৃহে স এব ভজতি প্রায়ো জগদ্বন্দ্যতাম্।

এই সার কথাটা অনেক কবিই বুঝেছেন, আর এটা বোঝার ফলে ধনহীন দরিদ্র কবি শেষ পর্যন্ত দেবতা লক্ষ্মীকে অভিশাপ দিয়ে বলেছেন— লক্ষ্মী ! তুমি কোন দেবী নও, নীচ মানুষের অনুরাগিণী বেশ্যা তুমি। তুমি আরও একবার সেই সমুদ্দুরে ঢোক দেখি, যেখানে তুমি প্রথম ছিলে। দেখব— আবার সমুদ্রমন্থনকালে মন্দর পর্বত মন্থনদণ্ড হতে এগিয়ে আসে কিনা, দেখব আসেন কিনা সেই দেবতারা, যাঁরা সমুদ্রমন্থন করেছিলেন। একবার সেই অগাধ সমুদ্রে ঢুকলে আর কেউ তোমাকে তোলে কিনা— সেটাই আমার দেখার—কস্ত্বাম্ উত্তোলয়িষ্যতি ?

এ কোন ঠাট্টা-ইয়ার্কি বা গালাগালি নয়, দেবতার ওপর স্পষ্ট অবিশ্বাস— অভিমানে, হতাশায়। সৌভাগ্যের বিষয়— এক লক্ষ্মী ছাড়া আর কোন দেবতার ওপর মানুষের এই অবিশ্বাস নেই। আমার ধারণা —অন্য কোন দেবতার সঙ্গে যদি মানুষের ঐহিক লাভের বিষয়টি এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকত, যেমন লক্ষ্মীর ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা— তা হলে তাঁর অবস্থাও লক্ষ্মীর মতই হোত। লক্ষ করে দেখবেন লক্ষ্মীর সতীন কাঁটা সরস্বতীও এ ব্যাপারে অনেক বেশি ভাগ্যবতী। তাঁর জন্মলগ্নে পিতৃগামিতার মত পৌরাণিক কলংক থাকলেও, প্রায় কোন কবিই কিন্তু সরস্বতীকে বেশি কলংকিত করেননি, বিদ্যা না হলেও না। বরঞ্চ কারও হাতে যদি-বা সরস্বতীর অবমাননা ঘটেছে, কবিরা সেখানে এমন সুন্দরভাবে শব্দার্থ গ্রন্থনা করেছেন, যাতে অন্যায়টা কোনভাবেই সরস্বতীর ওপর না পড়ে। যেমন আনুমানিক ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী একটি শ্লোকে এক কবি লিখেছেন— এই পোড়া পেটের জন্য পণ্ডিতেরা কিই না করতে পারে ! এমন কি সরস্বতীকেও তাঁরা বানরীর মত লোকের বাড়ি বাড়িতে নাচায়— বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্ত্তয়ন্তি গৃহে গৃহে। এই শ্লোকটির মর্মকথা আরও ভাল করে বোঝা যাবে একাদশ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কাশ্মীরী ক্ষেমেন্দ্রের একটি শ্লোকে। বস্তুত যাঁরা বিদ্বান, যাঁরা কবি, পণ্ডিত— তাঁরাই তো সরবতীর আশ্রয়, কিন্তু তাঁরা যদি আপন স্বার্থে কিংবা কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভয়ে নিজের কথা কিংবা লেখার ভাষা বিকৃত করেন, তা হলে অনেকের কাছেই সেটা মর্মচ্ছেদী হয়ে পড়ে। ক্ষেমেন্দ্র লিখেছেন— রাজাদের তেল দেবার জন্য লুব্ধ কবিরা সরস্বতীকে দামী দামী শাড়ি-গয়না পরিয়ে বেশ্যার মত পরের কাজে লাগিয়েছেন—বাণী বেশ্যেব লোভেন পরোপকরণীকৃতা। আজ রাজা নেই বটে, তবে রাজনীতি আছে ; রাজনীতির প্রয়োজনে, নিজের উন্নতির প্রয়োজনে কিছুই না থাকলে উত্তম পুরুষকে তৈলসিক্ত করার জন্য আজও আমরা সরস্বতীর অপব্যবহার করে চলেছি। কিন্তু এরই মধ্যে সুখের কথা এইটুকুই যে, বাগদেবীর এই অবমাননায় কবিদের মনে তবু এক শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ আছে, যাতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কতগুলি বিদ্বান মানুষই ; স্বয়ং দেবতা এখানে নির্দোষ,

মানুষ নিজের দোষেই তাঁকে যেন ক্লিন্ন করেছে।

সবখানেই তাই। দেবতার সঙ্গে রসিকতাই হোক, তাঁর উদ্দেশ্য গালাগালিই হোক কিংবা দেবতার অপব্যবহার— সব কিছুর জন্য মানুষই দায়ী। দেবতার কোন ক্ষমতাই নেই ভাল কিংবা খারাপ হবার। মানুষ-কবির কল্পনাতেই দেবতার স্নিগ্ধ-মধুর, তিক্ত-ক্লিন্ন আকারকল্প। আমার স্বর্গীয় অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য কোন একটি আলোচনা-সভায় একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছিলেন— যাঁর যে রকম বোধ, সেইভাবেই তাঁর ভাবগ্রহ। কবি-পুরুষদের বচন এবং পুরাণ-পুরুষ দেবতাদের ব্যাপারেও যাঁর যেরকম কল্পনা সেই পথেই হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পায়—উন্মীলতি কবি-পুঙ্গববচনে চ পুরাণপুরুষে চ। ব্যক্তিমনের স্পর্শে যে শালগ্রাম শিলা নারায়ণ, সেই শিলাই আবার ব্যক্তিকবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কল্পনারসে

তুমি শালগ্রামশিলা
শোয়া বসা যার সকলি সমান
তারে নিয়ে রাসলীলা!

বাংলা প্রবাদে যেমন 'শালগ্রাম বাঁধা দিয়ে মদ খওয়া'র ঘটনায় ভগবন্নারায়ণের সমস্ত দেবত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে, তেমনি বেদ-ব্রাহ্মণ্য— এগুলিও কবির বাক্-পারুষ্য থেকে মুক্তি পায়নি। আরও আশ্চর্য লাগে যখন দেখি— এই পরুষবাক্য কোন বিরোধী লোকের মুখ থেকে বেরোয়নি, বেরিয়েছে স্বয়ং সেই মানুষটির লেখা থেকে যিনি বেদ এবং ব্রাহ্মণ্যের একান্ত নিষ্ঠ ভক্ত। ভাবতে পারেন— লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্রের মত লোক, যার বাড়িতে হোম-যজ্ঞ-বেদবিধির অন্ত ছিল না —তিনি বেদ-শ্রুতিকে তুলনা করেছেন বেশ্যার সঙ্গে। কেন? না, যেহেতু অনেক ব্রাহ্মণ্যহীন ব্যক্তিও বেদ পড়েন—কণ্ঠে কেন ধৃতা ন কুতুকাৎ পণ্যাঙ্গদেব শ্রুতিঃ। কবির কল্পনার রঙে তাই বেদ, ব্রাহ্মণ, দেবতা— সবাই রাজার কাছে দণ্ড্যজনের মত কখনও স্বর্গে উঠছেন, কখনও নরকে ডুবছেন।

॥ ৯ ॥

আসলে মুশকিলটা করেছেন স্বয়ং ব্যাসদেবই। তাঁরই নামে আরোপিত একটি অসাধারণ শ্লোকে তিনি তাঁর দোষমুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন। নিজ মুখে যা বলেছেন তাতে দেখাযাচ্ছে— তাঁর অপরাধ প্রধানত তিনটি। তাঁর প্রথম দোষ— তিনি নিরূপ, নিরাকার, সর্বময় ঈশ্বরের রূপকল্পনা করেছেন ধ্যানযোগে। এই যেমন রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ ইত্যাদি। দ্বিতীয় দোষ— যে ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, তার সর্বব্যাপিত্ব সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন কতগুলি তীর্থের মধ্যে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ তীর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অধিক মাহাত্ম্য খ্যাপন করে তাঁর সর্বময়তার হানি ঘটিয়েছেন। তৃতীয় দোষ— ভগবানের স্তুতি-প্রশংসা এবং নাম-লীলাদি কীর্তনের দ্বারা পরমেশ্বরের অনির্বচনীয়তার ক্ষতিসাধন করেছেন ব্যাস।

এই শ্লোকের অন্তিম পঙ্ক্তিতে ব্যাস মন্তব্য করেছেন— এই তিন রকমের অপরাধ যা আমি করেছি, তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও প্রভু— ক্ষন্তব্যং জগদীশ তৎ

দোষত্রয়ং মতকৃতম্। হাজার, দু হাজার বছর আগে ব্যাস যে দোষগুলি করে গেছেন, তার জন্য বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে খেসারত দিচ্ছি আমরা। মুশকিলটা এইখানেই। আরও মুশকিল এই জন্য যে, ব্যাস যে দোষগুলি করেছেন তার সঙ্গে আরও গোটা তিনেক দোষ জুড়ে গেছে। ব্যাসের দোষ শুধুমাত্র ঈশ্বর-ঘটিত, অর্থাৎ অরূপের মধ্যে রূপের খোঁজ পাওয়া, অসীমের মধ্যে সীমা নিরূপণ এবং অনির্বণীয়কে বচনে আবদ্ধ করা— এই তিনটি। বস্তুত এর সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ আছে কিনা সন্দেহ। যোগ থাকলে সে কোন ধর্ম ? শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদিক— কোনটা ? ধর্ম বলতে তো কোন কালে ভারতবর্ষে একক কোন কিছুকে বোঝায় না। আর শৈব শাক্ত বৈষ্ণব— এগুলি তো ধর্মের বিশেষণমাত্র। যদি বলি সনাতন হিন্দু ধর্ম— তারই বা কি মানে হয় ? বৈদিক ধর্মের সঙ্গে, উপনিষদের ধর্মের বিলক্ষণ ভেদ আছে, বিলক্ষণ ভেদ আছে ঔপন্যাসিক ব্রহ্মের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতা-মণ্ডলীর। পুরাণগুলির মধ্যে যদি-বা বেদ-উপনিষদের মিশ্রক্রিয়ায় নতুন দেবতার জন্ম হল—তাতে লাভ বা ক্ষতি হল এই যে, ধর্ম আর কোন একাত্মতার জন্ম দিল না, উল্টে ধর্মের কতগুলি বিশেষণ জুটে গেল—শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব— ইত্যাদি।

একটা কথা এই শেষ মুহূর্তেও বলে নেওয়া ভাল যে, ভারতবর্ষে কোনদিন কোন দেবতার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে একই দেবতাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষে একই ধর্মের কল্পনা বৃথা। বৈদিক যুগে ইন্দ্র যে পদ পেয়েছেন, অগ্নি যে মর্যাদা ভোগ করেছেন, পরবর্তী যুগে তাঁরা তা সম্পূর্ণ হারিয়েছেন। হারিয়েছেন এতটাই যে, বহু দেবতার কল্পনায় বৈদিক ঋষিদের মনে পর্যন্ত সন্দেহ এসেছে—কোন দেবতাকে আর তেল-ঘি পুড়িয়ে আহুতি দেব— কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ? ঐতিহাসিকতার নিরিখে বৈদিক দেবকল্পনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তা— নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন। কিন্তু এও টেঁকেনি, ভারতবর্ষের মানুষ ব্রহ্মের সাকার বিগ্রহ চেয়েছে। ফলে রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব পাদপ্রদীপের আলোয় এসে পড়েছেন। মজা হল, এঁরাও কিন্তু কেউ একচ্ছত্র নন। বিশেষ বিশেষ এলাকায় যদি একচ্ছত্রী হনও, তবু এঁদের সঙ্গে আছেন শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী, সন্তোষী মা-ও। আমরা এঁদের সবাইকে গড় করি আর কবির ভাষায় বলি—

> থাকো হৃদয়-পদ্মটিতে
> এক দেবতা আমার চিতে—
> চাই নে তোমায় খবর দিতে
> আরো আছেন তিরিশ কোটি।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক গতি-প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে এখন যাঁরা বুঝেছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্মও একটা ভারী ব্যাপার, তাঁদের চৈতন্য দেরীতে হলেও সুখের। বোধ করি একই সঙ্গে তাঁরা এটাও স্বীকার করে নেবেন যে, বহু দেবতার বিভিন্নমুখী এবং ততোধিক ভিন্নপন্থী ভক্তদের দিয়ে কখনও ধর্মযুদ্ধ সম্ভব হয় না। বিশেষত যে দেশে ধর্মের সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। স্বীকার করতেই হবে যে, যে জাতির ব্যক্তিগত দেবতার সংখ্যা তিরিশ কোটি, সে জাতির দেবতারাও গণতন্ত্র

মেনে চলেন। না চললে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই কারণেই ভাগবত পুরাণে শিব, দুর্গা— সবাই কৃষ্ণের ভক্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু শিবপুরাণে সেই কৃষ্ণেরই শিব-অনুগতি না থাকার ফলে তেজোহানি ঘটে। আবার দেবীভাগবত পুরাণে শিব-কৃষ্ণ— সবাই পরমা প্রকৃতির কলা-বিকলা মাত্র। কাজেই ব্যাপারটা এই রকমই। প্রত্যেক দেবতারই নিজস্ব অনুগামী দল আছে—সময়বিশেষে যে দেবতার আধিপত্য ঘটে, তাঁর ভক্তদলেরও তখন প্রাধান্য ঘটে, ঠিক যেমন গণতন্ত্রে প্রধান রাজনৈতিক দল মন্ত্রী-সভা গঠন করে সেই রকম। কিন্তু তাই বলে গণতন্ত্রে অন্য দলগুলি যেমন মিথ্যে নয়, তেমনি দেবতার রাজ্যেও এক দেবতার প্রাধান্য ঘটলে, অন্য দেবতার মাহাত্ম্য লুপ্ত হয় না, কিংবা তাঁর ভক্তদলও নিষ্ক্রিয় হয়ে যান না। তাঁরা সবাই থাকেন এবং সময়ে আসন ফিরে পান আপন দেবতার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু বিশেষ দেবতার এই অভ্যুত্থান কিংবা পতনের সঙ্গে বিশদ অর্থে ধর্মের কোন যোগ নেই। রামায়ণ-মহাভারতে রামচন্দ্র কিংবা কৃষ্ণ যে যুদ্ধপর্বের সঙ্গে জড়িত আছেন, তা ধর্মের জন্য হলেও, সে ধর্ম মূলত ন্যায়-নীতির প্রতিশব্দ মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি, এতটা বিশদ অর্থেই চিরকাল ধর্ম শব্দটির ব্যবহার হয়েছে ভারতবর্ষে। উপনিষদ যখন বলেছে—সত্যং বদ, ধর্মং চর— সত্য কথা বল, ধর্মাচরণ কর— তখন ন্যায়-নীতি এবং চিরন্তন সত্যগুলিরই ধর্মের আওতায় এসে পড়েছে; রাম কিংবা কৃষ্ণপন্থী বৈষ্ণব ধর্মও সেখানে আচরণের বিষয় নয়, শৈব কিংবা শাক্তধর্মও সেখানে অনুসরণের বিষয় নয়। একই কারণে পরম ঈশ্বরকে যেখানে সমস্ত ধর্মের মর্যাদারক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করা হয়, সেখানে সেই ঈশ্বর, জীবনের সত্য এবং ন্যায়-নীতির রক্ষক বলে পরিচিত। গীতায় সেই জন্যই অর্জুন বিশ্বরূপ দেখতে দেখতে বলেছেন— প্রভু! তুমি ক্ষয়হীন, তুমি চিরন্তন ধর্মের রক্ষাকর্তা— ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা। এই শাশ্বত ধর্ম কি কখনও কৃষ্ণভক্ত, রামভক্ত কিংবা শিবভক্তদের মধ্যে পৃথক কোন অর্থ বহন করতে পারে? বিশেষত যেখানে রাম, কৃষ্ণ কিংবা শিবকে আমরা আপন আপন দোষ, ত্রুটি, আপন আপন মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্যে কল্পনা করেছি। শিব আমাদের গৃহস্থ সংসারের প্রতিরূপ, রাম আমাদের ন্যায়-নীতির প্রতিশব্দ, কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়বৃত্তির উদগ্র দ্বন্দ্ব। আমরা এঁদের অনুসরণ করিনি আমরাই এঁদের ভেঙেছি আর গড়েছি— ঠিক মাটির ঢেলাটির মতই। কখনও এক গড়তে অন্য গড়েছি, কখনও শিব গড়তে বাঁদরও।

সূত্র

এই অধ্যায়ের সূত্রগুলি প্রধানত সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার, মহাসুভাষিত সংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্র-লঘুকাব্যসংগ্রহ, গাথাসপ্তশতী এবং আর্যাসপ্তশতী থেকে সংগৃহীত।

গ্রন্থপঞ্জী

'অভিধর্মকোশ', বসুবন্ধুবিরচিত, দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত। বারাণসী : বৌদ্ধভারতী, ১৯৭১।

'উদ্ভটসাগর', পূর্ণচন্দ্র কবিভূষণ বিরচিত। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯১৭।

'ঋগ্বেদসংহিতা', কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬। দুই খণ্ড।

'ঋগ্বেদসংহিতা', হোসিয়ারপুর : বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক শোধ সংস্থানম্, ২০০২ বিক্রম সংবৎ।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', বাসুদেবশর্মা সম্পাদিত। বম্বে : নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯২৫।

'কাব্যপ্রকাশ', মম্মটাচার্য বিরচিত, ভট্টভীমাচার্য ঝালকিকর কৃত বালবোধিনী টীকাসহ, রঘুনাথ দামোদর কারমারকর সম্পাদিত। পুণা, ১৯৬৫।

'কূর্মপুরাণ', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৫ সন।

'ক্ষেমেন্দ্র-লঘুকাব্যসংগ্রহ', ভি.ভি. রাঘবাচার্য ও ডি.জি. পাধ্যে সম্পাদিত। হায়দ্রাবাদ : ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

'গাথাসপ্তশতী', হালবিরচিত, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১।

'গীতগোবিন্দ', জয়দেব রচিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর টীকাসহ হরিদাস দাস সম্পাদিত। নবদ্বীপ : গৌরাব্দ ৪৭০।

'চৈতন্যচরিতামৃত', কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত, তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত। মায়াপুর : চৈতন্যমঠ, গৌরাব্দ ৪৭০।

'চৈতন্যচরিতামৃত', কৃষ্ণদাস করিরাজ বিরচিত, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত। কলিকাতা : সাধনা প্রকাশনী, ১৩৭০ সন।

'চৈতন্য ভাগবত', বৃন্দাবন দাস রচিত, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত। কলিকাতা : সাধনা প্রকাশনী, ১৯৬৭।

'দেবী-ভাগবত', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা : বঙ্গবাসী।

'ধ্বন্যালোক', আনন্দবর্ধন রচিত, জগন্নাথ পাঠক সম্পাদিত। ধারণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৫।

'নিরুক্ত', যাস্কবিরচিত, মুকুন্দ ঝা বক্শী সম্পাদিত। বম্বে : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩০।

'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি', উদয়ন রচিত, মহাপ্রভুলাল গোস্বামী সম্পাদিত। দারভাঙ্গা : মিথিলা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭২।

'পদ্মপুরাণ', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা, নবভারত, ১৩৯৭ সন।

'পদ্যাবলী', রূপগোস্বামী রচিত, সুশীল কুমার দে সম্পাদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪।

'পুরাণপ্রবেশ', গিরীন্দ্রশেখর বসু রচিত। কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮ সন।

'বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা', দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮ সন।

'বৃহদারণ্যক উপনিষদ', দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। কলিকাতা : ১৩৪০ সন।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। কলিকাতা : ১৯৮৫। চতুর্থ খণ্ড।

'বায়ু পুরাণ', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা : নবভারত, ১৩৯৭ সন।

'বিদগ্ধমাধব', রূপ গোস্বামী রচিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত। বহরমপুর : ১২৮৮ সন।

'বেদান্ত দর্শন', দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। কলিকাতা : ১৩৭৬ সন।

'বেদের পরিচয়', যোগিরাজ বসু রচিত। কলিকাতা : ফার্মা কে. এল্, এম্, ১৯৮০।

'ভক্তিগীতি', ভক্তিকুমুদ গোস্বামী সম্পাদিত। খড়গপুর : গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৩৯৪ সন।

'ভগবদ্গীতা', বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সম্পাদিত। দিল্লী : ইণ্ডোলজিক্যাল বুক হাউস, ১৯৮৪।

'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৯ সন।

'ভাষা পরিচ্ছেদ', বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন রচিত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা : ১৩৭৭ সন।

'ভাস-নাটকচক্র', সি. আর. দেওধর সম্পাদিত। দিল্লী : মোতিলাল বনারসী দাস, ১৯৮৭।

'মৎস্যপুরাণ', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা : নব ভারত, ১৩৯৫।

'মনুসংহিতা', কলিকাতা : আর্যশাস্ত্র, ১৩৬৯ সন।

'মহাভারত', হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অনূদিত। কলিকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৩—১৪০১ সন।

'মহাসুভাষিত-সংগ্রহ', এল্ স্টার্নবাক্ সম্পাদিত। দিল্লী : মোতিলাল বনারসী দাস, ১৯৭৪।

'মাধুর্য কাদম্বিনী', বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রচিত, ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর সম্পাদিত। মেদিনীপুর : ১৩৬৩ সন।

'মীমাংসা দর্শন', শবরভাষ্য সহ। বম্বে : আনন্দাশ্রম, ১৩৮৪।

'মীমাংসাদর্শন', ভূতনাথ সপ্ততীর্থ সম্পাদিত। কলিকাতা : বসুমতী, ১৩৪৫ সন।

'যুক্তিদীপিকা', পুলিনবিহারী চক্রবর্তী সম্পাদিত। কলিকাতা : ১৯৩৮।

'রামায়ণ', বাল্মীকি রচিত। বম্বে : নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯০৫।

'রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র', বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা : গ্রন্থমালা, ১৩৮৩ সন।

'শতপথব্রাহ্মণ', দিল্লী : নাগ প্রকাশক, ১৯৯০।

'শ্রীমদ্ভাগবত', পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা : বঙ্গবাসী, ১৩০৯ সন।

'সাহিত্যদর্পণ', বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত, হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত। নবদ্বীপুর : হরিপুর হরিচরণ চতুষ্পাঠী, ১৩৩৫ সন।

'সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার', কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সংকলিত। বম্বে : ১৯৩৫।
'হরিবংশ', পি. এল্. বৈদ্য সম্পাদিত। পুণে : ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৬৯।
'হরিবংশ', শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, আর্যশাস্ত্র
'হিন্দুদের দেবীদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য রচিত। কলিকাতা : ফার্মা, কে. এল্. এম্., ১৯৮২। ,
Aspects du mythe de Krsnagopala dans L'Inde Anicenne, by Charlotte Vaudeville. In Melanges d' Indianisme a la memoire de Lous Renou. Paris: 1968.
Aspects of early Visnuism, by J. Gonda. Delhi: Motilal Banarsidass, 1966.
Brahman, by P. Thieme. In ZDMG. Vol II Wiesbaden: 1952.
A History of Philosophy, Vol. I pt. I, by Frederick Copleston. New york: Image Books, 1960.
Indian Theogony, Sukumari Bhattacharji, Firma K.L.M. Calcutta, 1978.
Mysteries, ERANOs, Princeton, 1971.
The Pre-Socratic Philosophers, by G. S. Kirk and J.E. Raven. Cambridge University Press, 1957.